দিনের পারাবার

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

তারপর বিষ্টির শব্দে যখন রাতটা আস্তে আস্তে ডুবে গেল, কোথাও কোন সাড়াশব্দ রইলনা, রাস্তায় পথিক নেই, বাস চলাচল কম, ওপাশের দোকানে গ্রামোফোন রেকর্ড আর বাজল না। এমন কি বাসডিপো থেকে 'পরবর্তী······নম্বর এগারোশ' আশী, অমুক বাসের কণ্ডাক্টর জবকার্ড নিয়ে যান'-ও আর শোনা যায় না তখন, ঠিক সেই সময়ে কে যেন অমলের দরজায় ধাক্কা দিল।

কেউ কোথাও নেই।

নির্জন বাড়ী অমল একলা। ঘরের পর ঘর এমনি পড়ে থাকে, শেকলে মরচে, বড় ও ভারী লোহার তালা দোলে।

অমল কান পাতল।

হ্যাঁ শব্দ হচ্ছে। ঠক ঠক ঠকাস, টিকটিক, ঠক ঠক। তালা দুলছে দরজার ওপর বাজছে। তার দরজায় ভারী হুড়কো, তবু দরজাটা নড়েই চলেছে।

বাতাসে নড়ছে না ত?

এ বাড়ীর ঘরে ঘরে, দরদালানে মাঝেমাঝে অবিশ্যি বাতাসের কান্না শোনা যায়। মাঝেমাঝে ঢুকে পড়ে বাতাস, আর, বেরুবার রাস্তা না পেয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়ায়। পুরনো কড়ি বরগায়, কব্জা ভাঙা দরজায় ক্যাঁ কঁ্যা শব্দে কাঁদে, মা-বাবার ঘরে জোড়াপালঙ্কের তলায় আড়ঙে টাঙানো চট, পুরনো লেপ, ছেঁড়া তোষকের গাদায় নাড়া দিয়ে দিয়ে কাঁদে।

ঘরে বাতাস কাঁদে, বাইরে শকুন।

বটগাছের মাথায় সেই আদ্যিকাল থেকে রাজ্যের শকুনের বাস। পালকহীন নেড়া মাথা, নিষ্ঠুর ও ক্রূর চাহনি শকুনদের অমল মাঝে মাঝে খুব কাছ থেকে দেখেছে।

শিবরাত্তিরের বিকেলে মা-র পুজো মন্দিরে দিয়ে আসবার সময়ে অথবা চৈত্রের দুপুরে আম সংগ্রহ করবার জন্যে গাঙ্গুলীদের মাঠে।

বিশাল ও বলিষ্ঠ শরীর নিয়ে শকুনরা জোড়াপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তাকে তাড়া করেছে, রেগে গিয়ে রীতিমত চক্কর দিয়ে উড়েছে মাথার ওপর। শেষে আমড়া গাছের ডাল ভেঙে মাথার ওপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অমল ওদের তাড়ায়।

শকুনের কান্না অবিশ্যি দিনরাত শোনা যায়।

ছোটবেলা, যখন নেহাৎই বালক ছিল তখন গল্পের বই-এ পড়ে শকুনশাবকের কান্না ঠিক মানুষের শিশুর কান্নার মত। কি ভয়ই পেয়েছিল। এমন যদি কখনো হয় যে সে একেবারে একলা, অথচ শকুনশাবক কাঁদছে? এই ত বাড়ীর কাছেই বটগাছ। রাতে যদি সকলে ঘুমোয় বাবা এবং মা কিছুতে না জাগে অথচ গাছে একসঙ্গে অনেক শকুনশাবক কাঁদতে থাকে? এদিকে একলা অমল জেগে?

না, সে-রকম কিছু ঘটেনি। তখন ত নয়ই। এখন অবশ্য অমল ওদের কান্না ঘনঘনই শোনে। এদিকে ঝড় বাতাস বিষ্টির-ও বিরাম নেই, আর গাছের ডাল মড়মড় করলে ওদের আর্তনাদও থামে না।

এখন যেমন শোনা যাচ্ছে: চেরা ও তীব্র কর্কশ কান্নার মত শব্দ, কেশো রুগীর গলা ও নাক দিয়ে একসঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলবার শব্দ।

ও কান্নাকে ভয় পায় না অমল। ঐ কান্না, বাতাসের কান্না।

কোনটাতেই আর ভয় হয় না।

দরজাটা দেখ নড়েই চলেছে।

বাতাস নিশ্চয় নয়।

বাতাস ঢুকবে কোথা দিয়ে ? দরদালান এবং ছাতের চাপা দরজা ফেলা। পশ্চিমের জানলাটা ত' আজকাল খোলাই হয় না।

তাছাড়া আজ ত বাতাসের তেমন দাপট নেই। বিষ্টি পড়ছে। ঘন এবং ঝুপঝুপে বিষ্টি। কোমল একটা ঝিলমিলে পর্দার মত ঝুলছে। পুকুরের বুকে বিষ্টির শব্দটা একটা সম্মোহনকারী মন্ত্রের মত। মাঝেমাঝে শুধু বিদ্যুতের আলো ঝলসে ওঠে। তখন দেখা যায়, না, বাইরে সবটুকুই শান্ত ও মন্দ্রছন্দ নয়। পুকুরের জলের বুকে বিষ্টি রীতিমত দাপাদাপি করছে। পুকুরের জল অশান্ত উদ্দাম। কারা যেন নিচ থেকে আঙুল দিয়ে জলটা নাড়াচ্ছে, নখ দিয়ে চিরছে।

এটা অমল অনেক সময়েই লক্ষ্য করেছে বহিপ্রর্কৃতি ও জীবপ্রকৃতির মধ্যে একটা হিংস্রতা লুকিয়ে থাকে। অথবা হিংস্রতাটাই স্বাভাবিক, বাইরে থেকে দেখলে খুব শান্ত বা সুন্দর মনে হয়।

অবশ্য শান্ত, সুন্দর, স্বর্গীয়, এসব মানুষের আরোপিত বিশেষণ। ভাবতে ভাল লাগে তাই ওদের দেখে দেখে মানুষ দার্শনিকের মত কবির মত ভাবে।

ক'দিন আগেই অমল তার ভাবনার সমর্থক একটি ঘটনা লক্ষ্য করেছে। আজকাল ওর সময় অগাধ, শুধু নিজের সঙ্গে বাস করে, অন্য দ্বিতীয় সঙ্গী নেই। ইন্দ্রিয় বোধ হয় বড় বেশী তীক্ষ্ণ হয়েছে। সব দিকে যেন বড় বেশী চোখ পড়ে।

সে দিন যেমন উঠোনে পিঁপড়েদের দেখেছে।

মাঝে মাঝে উঠোনে বসে থাকে অমল। নিমগাছের ছায়ায় মোড়া নিয়ে বসে চেয়ে চেয়ে দেখে। ক'দিন ধরেই সকালের দিকে দেখতে পায় নিমগাছের গুঁড়ির কাছে বড় বড় কালো কালো ডেয়ে পিঁপড়ে। বর্ষা সমাগমে বেশ পুষ্ট দেহ, কামড়ে ধরলে অণুবীক্ষণিক সাঁড়াশীর মত দাঁড়া দুটি ছাড়ানো মুস্কিল হবে। অথচ কামড়াবার লক্ষণ নেই।

অমল দেখেছে ওরা জোড়ায় জোড়ায়, মুখোমুখি, পরস্পরের সঙ্গে গোপন আলাপে মগ্ন। দেখে দেখে ছোটবেলায় পড়া প্রবন্ধের কথাই

মনে হয়েছে। পিঁপড়ে নাকি ভারী বুদ্ধিমান জীব। ওদের জীবনে শৃঙ্খলা আছে, আলাপের ভাষা আছে।

আলাপের ভাষা! কি গভীর ও ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকছিল তারা তা বুঝতে অমলের এতটুকু দেরী হয়নি যখন চড়াই পাখীর ছানাটার মৃতদেহ আবিষ্কার করা গেল। হয় ত' মরত ওটা, ওর সঙ্গের অন্য বাচ্চাগুলোও বাঁচেনি। তবু একেবারে দুম ক'রে মরবার মত অবস্থায় ও পৌঁছয়নি অমল তা হলফ ক'রে বলতে পারে। গতকাল নড়ছিল রীতিমত আর রাত পোহাতে দেখা গেল ওর অতি ক্ষুদ্র মৃতদেহে চোখ দুটো নিখোঁজ। পেট দিয়ে বড় বড় পিঁপড়েরা কণাকণা মাংস সংগ্রহের অভিযানে সামরিক শৃঙ্খলায় ছড়িয়ে পড়েছে। নিঃশব্দ এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটতে দেখে অমল রীতিমত চিন্তিত হয়। তারপরেও দেখাগেছে পিঁপড়েরা এখানে ওখানে মুখোমুখি অতীব গোপন আলাপনে ব্যস্ত। দেখে অমল উদ্বিগ্ন হয়েছে।

আজকাল বিলাসিনী রমণীর মত গর্বিত মাছরাঙা, শান্ত কোমল ঘুঘু অথবা সোণালী মথ এদের আত্মগত চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতে দেখলেই তার উদ্বেগ হয়ে।

হিংসে। সর্বদা ওরা হিংসেয় অস্থির। নিষ্ঠুরতায় মেতে আছে।

বাইরের চেহারাটা যেন এখন বেশ ক্রুর দেখাচ্ছে। যেন ঝড়বাদলের রাতে পুকুরের নিচ থেকে অশান্ত আত্মারা উঠে আসতে চাইছে।

আবার দরজায় ধাক্কা।

কে? কে হ'তে পারে? অমলের রক্ত চঞ্চল। অমলের শরীরে শিরার মধ্যে রক্ত ছুটতে সুরু হয়েছে। বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড জোরে জোরে দুলছে। দুলতে দুলতে ছিঁড়ে না যায়। বুকের ভেতরে পাগলাঘন্টি বাজাবার দরকার কি? ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই যে শরীরের ভেতর দাপাদাপি সুরু হয়ে গেল।

'কে'?

সাড়ানেই।

'কে ?'

আবার ধাক্কা।

আসতে পারত, সে আসতে পারত। তবে কি সে এল ? যখন তখন আসতে পারত সে অমলের কাছে আসবার কোন বিধি নিষেধ ছিল না। সময় নেই অসময় নেই, এলেই হ'ল। এমন কি রাত দুটোর সময়ে অবধি এসে জুলুমবাজি করেছে। অমলের বাবা মা-কে ডাকাডাকি 'দোরটা খুলুন দোরে তালা দিয়ে রেখেছেন কেন ? উঠুন না শীতে জমে গেলাম যে !'

দোর খুলে অমলের বাবার সে কি ব্যস্ততা। নিশ্চয় কোন বিপদ হয়েছে নইলে ও ত' অসময়ে এমন ভাবে ডাকবার ছেলে নয়। কি হ'ল কে জানে ?

কিছুই না। দোর খুলে দিতেই একগাল হাসি 'খুব ব্যস্ত হয়েছেন ত' মেসোমশায় ?'

'কি হয়েছে ? কি ব্যাপার ?'

'ব্যাপার আবার কি ? ঘুমোতে এলাম।'

'অ্যাঁ ?' অমলের বাবা এ-হেন জবাব শুনে প্রায় তাজ্জব বনে গেলেন।

'ঘুমোতে এলাম। রাতে কাকা কাকী এসেছেন গৌহাটি থেকে। আমার ঘরই বেদখল।'

'তা এত রাতে ?'

'এই দেখুন ! রাত হয়েছে তা কি জানি ? হী হী শীতে বাইরে বারান্দায় শুয়ে কাঁপুনি লেগে গেল বেরিয়ে পড়লাম।'

'একবার ঘড়িটা অবধি দেখনি ?'

'না ত ! তবে হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল বটে রাতটা যেন বেশ বেড়েছে। কেন, ক'টা বাজে ?,

'দুটো।'

'সর্বনাশ !' ব'লে অমলের ঘরে সে ঢুকে যায়। চেঁচিয়ে বলে, 'যান শুয়ে পড়ুন মেসোমশায়। আমার জন্যে ভাবতে হবে না।'

তারপর, ছোটলেপ একবার এ কাড়ে, একবার ও। কোনমতে রাতটা কাটল।

আজকে কি সে-ই এল ? সে এসে ধাক্কা দিচ্ছে ?

কিন্তু কেমন ক'রে আসবে ? না হয় অমলের টানে সে উঠে এল, কিন্তু অমল কেমন ক'রে খুলবে দরজা ! কে এসেছে ? কেমন তার চেহারা ? সামনে ঝুলে পড়া ঘাড়, প্রসারিত বাহু। সত্যি সত্যি, তার হাত দু'খানা যে অত লম্বা তা অমল আগে লক্ষ্য করেনি। কেউই করে না। দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকে ততক্ষণ দেহকে আর অস্বাভাবিক মনে হয় না, অন্ততঃ স্বাভাবিকতার অভাব যদি এত সামান্য হয় তবে তা চোখে পড়ে না। কিন্তু প্রাণহীন দেহে সেই হাত দু'খানাই কি রকম লম্বা দেখাচ্ছিল। ধরে দাঁড় করাবার পর হাত দুখানা ঝুলতেই থাকল শক্ত হয়ে, চোখে দৃষ্টি নেই, ঠোঁট ও জিভ কালো। এখন কি অমল তাকেই দরজা খুলে দেবে ?

'তুমি কে ? তুমি কি সরিৎ ?'

উত্তরে আবার ঠকঠক শব্দ।

না সরিৎ নয়। কেমন ক'রে অমল ভাবতে পারল সরিৎ আসবে ? কোটি কোটি যোজনের চেয়েও যে অনেক দূরের পথ। কোটি কোটি ! কোটি কোটি টাকা, অর্বুদ ও মহাপদ্ম সংখ্যক সৈন্য, অযুত অযুত হাতী ঘোড়া, সেই শৈশবে একসঙ্গে মহাভারতের গল্প পড়তে পড়তে ঐ সংখ্যা-বাচক, পরিমাণ বাচক শব্দগুলো অমলের মনে কি রহস্যের অনুভূতিই না ঘনিয়ে তুলত। জ্যৈষ্ঠের গরম দুপুর, পালঙ্কের পাশে জানলার থাপে বসে বই পড়া, বিছানা থেকে পুরনো তোষকের গন্ধ, মহাভারতের পাতায় পাতায় সোঁদা সোঁদা সুবাস।

এখন ত তাদের দু'জনের মধ্যে অনন্ত দূরত্ব। কোন কথা দিয়েই সে দূরত্বের ধারণাকে স্পষ্ট ক'রে তোলা যায় না। কোন রশ্মি ফেলেই

মাঝ খানের সমুদ্রটিকে মাপা যায় না। এতদূরে, তবু হয় ত' জীবিতের ও মৃতের পৃথিবী আসলে খুবই কাছে, একটির মধ্যে একটি মিশিয়ে থাকে। এত কাছে, তবু দেখা যায় না। ঐ একটি জায়গায় সবাই হেরে গেছেন। সব দার্শনিক, পণ্ডিত, সাধক।

কে জানে সরিৎ আজ অমলের এ যন্ত্রণা দেখছে কি না। জানলা দিয়ে কেমন ছাট আসছে দেখ। মশারী দুলছে, ছেঁড়াকাপড়ের পর্দা দুলছে, দেওয়ালে মা-র ছবিটা দুলছে। এসব দেখতে দেখতেই অমল রাত কাটিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু দরজায় আবার ধাক্কা।

আবার ধাক্কা। আবার ধমনী চঞ্চল। বুকের নিচে ঢং ঢং ঢং! যেন ঐকস্বরে বেজে উঠল কাঁসর ঘণ্টা কাঁসি ঢাকঢোল। যেন ভয়ানক ছুটোছুটি পড়ে গেল ভেতরে। অমলের শিরা উপশিরা চঞ্চল অস্থির। শরীরের ভেতরে যেন তোলপাড় চলেছে।

নিশ্চয় সে আসছে।

হয়ত একদিন আগেই বেরিয়েছে, এখন সময় খুঁজে খুঁজে এসেছে।

আশ্চর্য। উদ্বেগের অবসান হলেই শান্তি। যদিও এ শান্তি শরীরকে বিধ্বস্ত ক'রে রেখে যায়, নির্জীব করে দিয়ে যায় অবসাদের বোঝা চাপিয়ে।

তবে আর কি! দরজা খুলে দেওয়া যাক। আস্তে উঠল অমল, ধীরে হুড়কো খুলল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ঘরে। অমলের পায়ে ধাক্কা লাগল। ভেজা রোমশ একটা কি যেন।

একটা কুকুর।

'ও তুই!'

হ্যাঁ সেই এসেছে! কেমন করে অমল ওর কথা ভুলে গিয়েছিল? বুড়ো হয়ে গেছে চোখ প্রায় অন্ধ। কানে শোনে না চোখে দেখে না, শুধু অনুভবে চলাফেরা করে বেড়ায়। ওর জ্ঞান থেকে এ বাড়ীতে, শেষ সময় ত' এগিয়ে এল। দালান বারান্দা, ঘর সবগুলো ওর চেনা!

নড়বড় করতে করতে কোন মতে ঘর থেকে দালান, দালান থেকে উঠোনে যায়। সকাল বেলা মনে থাকলে অমল ওকে তুলে নিয়ে উঠোনে রোদে রেখে আসে।

আজও রেখে এসেছিল। কিন্তু তুলে আনতে মনে নেই। উঠোন থেকে সিঁড়ি বেয়ে দালানে উঠতে না জানি ওর কত কষ্টই হয়েছে। কোন মতে এসে দোরের কাছে বসেছে আর শীতে কেঁপেছে। ওর শরীরের কাঁপুনিতেই দরজায় অমন ঠকঠক ঠুকঠুক শব্দ হচ্ছিল। গলায় স্বর নেই তাই আওয়াজ করতে পারে না, সামনের দুটো পা-ই ভাঙা তাই নখ দিয়ে আঁচড়াতে পারে না। অথচ অমলের কাছে আসতে হবে এটা ও আজও ভোলেনি। ভয়ে, বিপদে, ক্ষিদে পেলে অথবা অসুখ হ'লে। একেই কি বলে ভেতরের প্রবৃত্তি? তাই বা কি করে হবে। অমল ছাড়া ওর কেউ নেই এটা নিশ্চয় সহজাত শিক্ষা হতে পারে না। এ বোধটা জন্মের সঙ্গে পাওয়া নয়। অভ্যাসের ফলে এ জ্ঞান ও লাভ করেছে! অভ্যাস, প্রাত্যহিক অভ্যাস। অমলের কাছে আসা, অমলের হাতে খাওয়া, ঘা-এর যন্ত্রণায় অস্থির হলে অমলের পায়ের কাছে এসে পড়ে থাকা। সেই জন্যেই বোধ হয় বলে অভ্যাসের ফলে আর একটি স্বভাবের জন্ম হয়! কুকুরটারও তাই-ই হয়েছে।

যাক, ঘরে আরেকজন কেউ এল।

সহসা অমল বুঝতে পারল এতক্ষণ সে মনে মনে চা'চ্ছিল এই নিঃসঙ্গতা দূর হোক। যদিও নিজের সঙ্গেই থাকে সে, দ্বিতীয় সঙ্গী নেই তবু এখন যেন নিজেকে আর সহ্য করা যাচ্ছিল না।

চিন্তার গুরুভার, প্রতীক্ষার যন্ত্রণা।

কুকুরটা কাঁপতে কাঁপতে এককোণে গিয়ে ব'সে পড়ে।

বেশ বড় একটা নিশ্বাস ফেলে।

ঘনঘন বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে।

নীলাভ তীব্র আলোয় দেখা যাচ্ছে পুকুরপাড়ে একটা মস্ত বড় পিদীম, পুজোর উপচার। বিকেল বেলাই কারা যেন রেখে গেল।

তখন লক্ষ্য ক'রে দেখেনি অমল এখন চোখে পড়ছে। একটা বড় পিদীম, এক সরা ভাত তরকারী এক সরা পূজোর জিনিষ পত্তর। এই সামান্য ক'টা জিনিষ যেন ভয়ঙ্কর কোন রহস্যকে নামিয়ে এনেছে। বটগাছের মাথায় আর্ত শকুনের কান্না, পুকুরের জল বিষ্টির চাবুক খেয়ে টগবগ ক'রে ফুটছে তারই মধ্যে কে জানে কার জন্যে ওরা ভোগ নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখে গেল। ও-গুলো না থাকলে এমন অতিপ্রাকৃত ভাবটি আসত না। এখন মনে হচ্ছে ওটা আর পরিচিত আম্বিকেলে পুকুরটা নয় যেন প্রেতলোকের একটা ছবি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

হয়, এমন হয়। সামান্য একটু এদিক-ওদিক ঘটলেই চেনাকে মনে হয় অচেনা। স্বাভাবিককে মনে হয় অস্বাভাবিক। একপাটি বাঁধানো দাঁত মানুষের চেহারা পালটে দিতে পারে, যেমন নতুন দিদিমার চেহারা বদলে গিয়েছিল। বোস পার্কে বাড়ী, জ্ঞাতি কাকীমার মা। অমলকে কি ভালই বাসতেন। ভারী নরম কথাবার্তা, ব্যবহারটি অমায়িক। মারা গেলেন যেদিন সেদিন অমল কাকীমার বাড়ীতে। সবাই গেল বোসপার্কে, ও-ও গেল। উঠোনে নামানো হয়েছিল, খাটিয়া তোলা হবে। 'ছবি নেওয়া হোক, ছবি নেওয়া হোক' ব'লে কে একজন যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

ক্যামেরা জোগাড় হ'ল। অমলের হাতে ক্যামেরা। কোডাক বক্সের চোখ দিয়ে ভদ্রমহিলার মুখ দেখে অমল ভয়ে বিস্ময়ে প্রায় আঁতকে ওঠে। অস্ফুট আর্তনাদটি অবশ্য চেপে ফেলতে হয়। নইলে বড়ই খারাপ শোনাত।

যকৃতের ব্যাধিতে ফর্সা রঙ ঘোর কালো হয়ে গেছে, মুখ ও হাতের চামড়া কুঞ্চিত, বার্ধক্যের জন্যে পলিতকেশ মাথা। জরা ও রোগ মানুষটিকে একেবারে অতি জীর্ণ অতিদীন ক'রে তবে পৌঁছে দিচ্ছে শ্মশানে, অথচ সেই কঙ্কালের মত মুখের ওষ্ঠাধর ফাঁক। ঝকঝকে শুভ্র দু'পাটি দাঁতে বিকশিত হাসি।

তখনি একজন বাঁধানো দাঁতের পাটি খুলে নেয় অবশ্য, তবু:অনেকক্ষণ

অবধি, অনেক দিন পর্যন্ত অমলের মন থেকে সে অভিজ্ঞতার অস্বস্তি সরেনি। সামান্য একটু এদিক ওদিক ঘটলে একান্ত চেনা মানুষ, মুখ, ঘর সব কিছুই একেবারে অচেনা হয়ে যেতে পারে এ বিশ্বাস তার সেদিন থেকেই ঘনীভূত হয়েছে।

অবশ্য তার ফলে সব সময়ে যে বীভৎসতা, অলৌকিকতা বা অন্য কোন অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তা নয়। একটু এদিক ওদিক ক'রে দিলে অসুন্দর সুন্দর হতে পারে সামান্যের মধ্যে আসতে পারে অপার রহস্যের ব্যঞ্জনা। অমলের নিজের অভিজ্ঞতা নেই, সরিৎ বই পড়ে তাকে বলত এখন সে-সব কথা মনে পড়ে।

যেমন, 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' কথাটি গিরীশচন্দ্র না কি একসঙ্গে বলতেন না। প্রথম ছ'টি অক্ষরের পর একটি নিশ্বাস টানতেন। শেষ পাঁচটি অক্ষর উচ্চারণের সঙ্গে নিশ্বাসটি বুক কাঁপিয়ে পড়ত।

এই শতকের শৈশব। পামশু, ফুলমোজা গার্টার চেনঘড়ি, ডবলকফ শার্ট ও ব্রেস্ট কোট পরিহিত দর্শক। দৃশ্যসজ্জা দীনহীন, বহু দৃষ্ট নাটক, জীবন সম্পর্কে মোহমুক্ত নানা আঘাতে দীর্ণ হৃদয় বৃদ্ধ নট। তবু সব সামান্য অসামান্য হ'ত। ঐ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস না কি দর্শকদের 'চক্ষুদান' করত (যেমন প্রতিমার করা হয়, চোখে কাপড় বেঁধে কুমোর মৃৎপ্রতিমার চক্ষুদান করে। করার সঙ্গে সঙ্গে মৃন্ময়ী প্রতিমা হন চিন্ময়ী জগজ্জননী, সবই দেখতে পান, মানুষের জগৎ এবং এ-বিশাল ভুবন সব কিছুর প্রতিই তাঁর গর্জনতেলে পালিশ করা হাসি হাসি চোখের দৃষ্টি হয় প্রসারিত তেমনই।) দর্শকরা অনুভব করত ঐ কথাক'টির অন্তরালে এক বিশাল মরুভূমি যেন উষ্ণতার জ্বালায় খিকি খিকি দগ্ধ হচ্ছে।

আরো মনে পড়ে : সামান্যের মধ্যে কেমন ক'রে অসামান্য প্রকাশ পায়, সীমার মধ্যে অসীম। শিশু অমল এসে রোগশয্যায় শোবে, তার ঘর দোর জানলা সবই তৈরী। সে শয্যা আর তোলা হবে না অবশেষে

ঐ জানলা দিয়ে বৃহৎ বিশ্ব নেমে এসে তাকে দুটি হাতে নিজের বুকে নেবে। সব আছে, তবু কি যেন নেই।

ঘরখানিকে 'চক্ষুদান' করলেন অবনীন্দ্রনাথ। একটি পাখীর দাঁড় এসে বললেন শিষ্যকে 'দাও ওইখানে ঝুলিয়ে।' অমনি নিমেষে সব বদলে গেল। রঙ্গমঞ্চের ঘর, সাজানো ঘর, তারই সব কৃত্রিমতা যেন কেমন ক'রে সোনার সাজে সেজে হ'ল মহিমময়, তার এক কোণে বিশ্ব প্রকৃতি পড়ল ধরা। ঘরখানি যেন মানুষের সব প্রয়াসকে ব্যঙ্গ করতে থাকল। জানলা বন্ধ করছ নজর রাখার অন্ত নেই। অথচ যে যাবার সে যায়, তাকে ধরে রাখা যায় না। ঐ দাঁড় শূন্য, পাখীকে কি ধরে রাখতে পেরেছ?

হয়, এমনও হয়!

যা রোজ দেখছ তার থেকে কিছু সরিয়ে নিলে, কিছু যোগ করলে নানারকম অনুভূতির অভিজ্ঞতা হতে পারে।

যেমন এই দীঘিটা।

আজকাল প্রায়ই অচেনা অচেনা মনে হয়, চিনতে পারে না অমল। যেন নতুন জায়গায় এসেছে, এবং এই যে চেনাচেনা মনে হচ্ছে এটা আর কিছু নয় তার চিরকালের বাস যেখানে সেখানকার সঙ্গে এ জায়গাটার একটু একটু মিল আছে। অথচ এখানেই ত' তার জীবনের বেশীটুকু কাটল।

দুই

এখনো অমল মনে করতে পারে এই পুকুরটার বুকে কি ঘন নলবন ছিল। মাঝের জলটুকু এমনিই গভীর, অতল কালো। পাড়ের দিক থেকে ক্রমশঃ মাটি ভরাট হয়ে আসছিল। শর গাছ, কাশ ফুলের বন আর গভীর নলখাগড়ার জঙ্গল। পুকুরের পূব-দক্ষিণ কোণে ঐ বৃহৎ বটগাছ, উত্তর পাড় দিয়ে হাঁটা যায় না। সাপ, শেয়াল, সজারু আর বুনো খরগোশের আড্ডা।

অবশ্য তখন আর এদিকে কোন জায়গাটাই বা এ-রকম জমজমাট ছিল। ঐ পশ্চিমদিকে গাঙ্গুলীবাবুদের বাগান। আম-জাম, লিচু পেয়ারা, আঁশফল আতা, নারকেল সুপুরির ঝাড়। ওঁদের বাগান বাড়ীটায় ফুলবাগান। আবার এদিকে রথ তলার দিকে যেতে বৈষ্ণব ঘাটার জমিদারবাবুদের সারি সারি বাড়ী। ঘাট বাঁধানো দীঘি, ছায়া নিবিড় পথ, দেবালয় সম্বলিত নীলরং করা সেকেলে কেতার দু'মহলা তিন মহলা বাড়ীগুলোর লাল সিমেন্টের মেঝে দেখলে যেন প্রাচীন শীতলরক্ত আভিজাত্যের গন্ধ পাওয়া যায়।

পরে নগেন্দ্রনাথের বাড়ীর বর্ণনা পড়তে পড়তে তার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র যেন ঐ ফুলবাগান, এই প্রাচীন গ্রাম এ-সব দেখেই লিখেছিলেন বই।

এই পথই কি এরকম ছিল? অপ্রশস্ত রাস্তা, কিছু কাঁচা কিছু পিচঢালাই। এ পথে যানবাহনও ত' এত চলত না। সন্ধ্যে হ'তে সব নিঝুম, নিশ্চিত।

তবু ভয় পেত না অমল। গরমকালে যত রাতই হোক না কেন এসে স্নান ক'রে যেত। বাঁধানোঘাট ধ'রে অনেক দূর নামলে তবে জলের

নাগাল মেলে। নিথর শীতল জল, শরৎ কালের কৃষ্ণপক্ষের রাতে জলে তারার ছায়া জ্বল জ্বল করত।

অমলদের বাড়ীর সঙ্গেই লাগাও ঘাট। কয়েকটা হিজল গাছ পরস্পর জড়াজড়ি ক'রে উঠছিল। তাতে বেশ ছায়া ছায়া হয়ে থাকত। ঐ ঘাটেই একদিন সে দেখেছিল চক দিয়ে কে লিখে রেখেছে নিতু দা, সুশী আপনাকে বিয়ে করিবে। সত্যি, সত্যি, সত্যি।

সে কথাটা মনে পড়ে গেল। প্রায় কুড়িবছর আগেকার কথা। অমলের বয়স খুব বেশী হ'লে ষোল। সুশী যতীনকুণ্ডুর মেয়ে ওর বয়েস বড়জোর তেরো।

কথাটি লিখেছিল সুশীর খুড়তুত বোন হিমানী। লেখা পড়ে ত' অমলের বুক ভয়ে কেঁপে সারা। জল দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করেও ভয় যায় না। এখন ভাবলে হাসি পায়, নিজের ষোল বছর বয়সের জন্যে মমতাও হয়। বাবা দেখলেন না মা দেখলেন! পাড়ার যারা নাইতে আসে তারা দেখেছে না কি! দেখলে পরে অমলের সম্পর্কে নিশ্চয় যা তা ভাবছে। হয় ত' যতে কুণ্ডুর কানে গেছে। কুণ্ডু কাকা তাকে কি করবেন? মেয়েদের সঙ্গে বর বউ খেলেছিল বলে নিজের ন'বছরের ছেলেকে কানধরে ছুট করিয়েছিলেন।

সুশীই বা ওকথা বলতে গেল কেন? সেদিন খেতে বসে কি অস্বস্তি। মুখ গুঁজে খেয়ে যাচ্ছে। বাবার দিকে তাকায় না মার দিকেও না।

দুপুরে শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভেবেছিল। পালঙ্কে পাতা বিছানায় ঠাণ্ডা দুপুরের তাত, ঘাসের গন্ধ আর সেই সঙ্গে সুশীর ভাবনা। কিন্তু যতই ভাবে মনে মোটেই আবেশ আসে না। সুশী মানেই বলাইয়ের বোন। ফর্সা ট্যাপাটোপা বেটে চেহারা, লালচে চুল, বড়ির থালা অমলদের ছাতে শুকোতে আসে। তবে ইদানীং যেন বড় হয়েছে বড় হ'য়েছে মনে হয়। বলাই ব'লেছিল 'সুশী জল নিয়ে আয় নইলে মেরে কানপট্টি লাল ক'রে দেব।' অমল বলেছিল 'আমার জন্যেও এক গ্লাস। নইলে আরেকটা কান দেব টেনে।'

জন্মকাল থেকে অমলকে দেখছে, চিরকাল গালিগালাজ শুনছে সেদিন সুশীরাণীর সে কি ভ্যাঁ ভ্যাঁ ক'রে কান্না 'ও আমার দাদা ও যা বলবে তুমিও তাই বলবে ? কেন, তুমি কি আমার দাদা ?'

কথাবার্তা শুনে সেদিনই কেমনকেমন লেগেছিল। তারপর এই কাণ্ড ! শেষ অবধি অমল বলাইকে সব কথা বলে দেয়। বলাই মহা অসভ্য, তেমনি গোঁয়ার প্রথমে ত' চেঁচিয়ে বাঁচেনা। ব্রণ ভর্তি মুখ লাল ক'রে কাছে এসে বলে 'বটে ! বন্ধুর এই কাজ ! আমার বোনের সঙ্গে তুই লভ্ করছিস ?'

তারপর মাথা থেকে যখন পোকা স'রে যায় তখন বোনকে ছেড়ে মা-র কাছে গিয়ে দাপানি। 'হুঁ হুঁ, অমল ভাল ছেলে তাই বলে দিলে। তোমার মেয়ের যে এদিকে বিয়ের ভাবনা মাথায় ঢুকেছে। ঢুকবে না ? দিনরাত্তির শুধু শাড়ী আর গয়না আর বন্ধু আর বিয়ের গল্প।'

তাই নিয়ে কি হইচই না হয়েছিল। বেচারা সুশী কেঁদে কেঁদে মরে আর কি ! হিমানীর সঙ্গে জন্মের মত আড়ি। এখন আর মাথা তোলা যাবে না, মুখ দেখান যাবে না বাইরে।

ছোটবেলার কাণ্ড ! হয় তো অমলদের ছোট বেলায় ওরা অনেক সরল ছিল। জীবনে এত জটিলতা নেই, একটু পাপের সম্ভাবনাতেই কাঁপত বুকটা। কত কিছুকেই না পাপ ব'লে জ্ঞান করতে শিখেছিল। মেয়েদের সম্পর্কে ভাবা, চিন্তা করা, চিঠি লেখা এ-সব পাপ। লুকিয়ে বিড়ি সিগারেট খাওয়া পাপ। শুধু ত' তখন নয়, বছর আঠারো বয়স অবধি, অথবা তার পরেও পাপ সম্পর্কে এমন শত শত সংজ্ঞা বুকটাকে কুঁকড়ে রাখত।

শুধু বাবা বলেছিলেন 'কেন অমন একটা ছেঁড়া কথা নিয়ে কথা বাড়াচ্ছ ? ওরা জাতে কুণ্ডু। মেয়েরা একটু বড় হলেই মনে করে:কত বড় না হয়ে গেছে, তাই একটু পান থেকে চূণ খসলে দেয় হইহল্লা লাগিয়ে। কিছুই হয়নি। একটা পুঁচকে মেয়ে কি বলেছে তাই নিয়ে যত হাসাহাসি।'

যা হোক, সেই পুকুর পাড়ের লেখা নিয়ে যে কথাবার্তা উঠল সেই হিড়িকেই সুশীর বিয়ে হ'য়ে গেল। ওর শ্বশুররা দাশ। বেশ বড় কাপড়ের ব্যবসায়ী।

এই ত সেদিনও এসেছিল সুশী। মোটাসোটা গিন্নীবান্নী মানুষ। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এল বেড়াতে বেড়াতে। অমলকে বলল 'ঘরে বউদি আনুন দাদা।' মা-র নাম ক'রে কত দুঃখ করল।

ঐ পুকুর পাড়।

অমলের জীবনের এক একটা সন্ধিক্ষণের এবং নানা সময়ের বন্ধু, নীরব সাক্ষী।

সরিতের সঙ্গে কত দিন, কতরাত। চা-এর ব্যবসায়ে ফেল ক'রে ঐ ঘাটে ব'সে অমল সত্যি সত্যি ভেবেছিল ডুবে মরব না কি! আবার ঐ ঘাটে বসেই নীতা তাকে ফিসফিস ক'রে বলে 'যাবার সময়ে অতটাকা সঙ্গে নিয়ে গেল কেন? আমার কাছে রেখেছিল যে?'

না, নীতার কথা ভাববে না, এখনো না, এখনো সময় আছে।

আবার এই ঘাটে বসেই করুণ হেসে যূথী বলেছিল 'তোমার সঙ্গে আগে যদি আলাপ হ'ত অমল!' চ'লে যাবার আগে অমলের হাতে মুখ লুকিয়ে যূথী কিছুক্ষণ বসেছিল।' তারপর প্রায় বিনা ভূমিকাতেই উঠে চলে যায়।

কে জানত তারপরই এমন কাণ্ডটা ঘটবে। হয়ত' হঠাৎ ঘটেনি, অনেক দিন ধরেই ওর ভেতরে প্রক্রিয়াটা চলছিল। বাইরে থেকে বোঝা যায় নি।

ঐ ঘাটে বসেই।

আজ কেমন ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে দেখ। শ্রাবণের বিষ্টি। এ সহজে থামবে না। পুকুরের ঘাটটা তেমনিই আছে, শুধু হিজলগাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছে।

এইসব নানা কারণে অচেনা লাগে। হিজলগাছ দুটো নেই, পুকুর পাড়ে পরপর বাড়ী উঠেছে। কবে অনেক আগে গঙ্গার ঘাটে শবদাহ

করতে যাবার সময় দূরপথে যাত্রীরা ওখানে ভিখারী সা'এর দোকান থেকে মদটদ কিনে নিয়ে যেত। অনেকদিনের দোকান ছিল ভিখারী সা'এর। এই মোটা শরীর, শিখদের মতো মাথার ওপর চুল চূড়ো ক'রে বাঁধা, ভুঁড়ির. নিচে গিঁট দিয়ে ধুতি পরা। দোকানের বাইরে বাঁশের মাচা ছিল, তাতেই বসে থাকত। যুদ্ধের সময়ে এই সুদূর বৈষ্ণবঘাটার কাছেও আমেরিকান সৈন্যদের ক্যাম্প পড়ে। তখন নাকি তাদের দৌলতে ভিখারী সা' মোটা পয়সা কামিয়ে নেয়। টাকার লোভে সেই ভিখারীকে কে বা কারা যেন খুন করে ফেলে। সম্ভবতঃ ঘরে সুবিধে হয়নি, ঐ নারকেল বাগানের নিচে ভাঁটফুল ও ধুতরো জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে কাজ হাসিল করে। এমন কেউ এসেছিল যার কথায় বিশ্বাস ক'রে ভিখারী মাঝরাতে ঐ জঙ্গল পর্যন্ত গিয়েছিল। কে, শুধু তারই হদিস করা গেল না।

তারপর থেকে কতদিন অবধি ঐ জঙ্গলের পাশ দিয়ে কেউ হাঁটেনি। ভয়ানক ভয় পেত সবাই, ভিখারীর দোকানঘরটা পোড়ো হয়ে যায়, তা দেখেও গা ছমছম করত।

সেই নারকেল বাগান সে ধুতরো জঙ্গল নেই। সিনেমাহলের সামনে দোকানঘর, নিয়ন আলোর আভায় চারদিক ঝলমল করে। দশ-বারো-বছরের মধ্যে এমনটা হয়ে গেল। ঝোপজঙ্গল আর ধানক্ষেত কেটে বসতি হ'ল। হাজার হাজার মানুষ এল, গরীব চাষী গৃহস্থ মানুষেরা ঘরবসত তুলে নিয়ে পেছু হটতে থাকল। একবার পেছন হটলে যা হয়, শহর বাড়ছে, স্ফীত হচ্ছে মহানগরী। তাই আদিবাসিন্দাদের পশ্চাদপসরণে আর ছেদ পড়ছে না। যেদিন কলকাতার পরিধি বারুইপুর অবধি যাবে সেদিন কি হবে কে জানে।

'কি হবে? ওদের কি হবে?' অমলের বাবাকে মাঝেমাঝে মা শুধোতেন। অমল আর অমলের বাবা মুখচাওয়াচাওয়ি ক'রে হাসতেন। অমল বলত 'তুমি বোঝনা মা বিলেতেও একসময়ে এমনি হয়েছিল।'

বইপড়া বিদ্যে থেকে এসব কথা বললেই মা চটে যেতেন। তাঁর

মনেহ'ত লেখাপড়া জানেনন। তাই ছেলে অবধি তাঁকে খোঁটা দিচ্ছে। রাগে ঝেঁঝে উঠে বলতেন 'সে ওদের দেশে, তাতে আমাদের কি ?'

অমলের বাবা তখন নতুন উৎসাহে বোঝাতে বসতেন 'আহা নিতু ত' ভাল কথাই বলছে গো। ওদের দেশে ক্রমে কলকারখানা হয়ে মানুষের অবস্থা ফিরে গেছে, আমাদের দেশেও তাই হবে।'

'হ্যাঁ তোমার দেশের লোক সব সায়েব হয়ে যাবে।'

'সায়েব হবে কেন ? সায়েবদের যেমন অবস্থা ফিরেছে এদেরও তেমনি···'

এরচেয়ে বেশী আর বলতে পারতেন না ; তখনকার অনেক লোকের মতই নিজের ঘরসংসার কাজকর্ম ছাড়া আর কিছু বিশেষ বুঝতেনন। অনুগত ও বাধ্য ছেলের মত দুটো তিনটে পরীক্ষা টেনেবুনে পাশ করেছিলেন বটে, তবে চাকরীতে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই ও-পাট তুলে দেন। খবরের কাগজ বলতে দৈনিক বসুমতীখানা পড়তেন আর তাতে যা বেরুত লোকে যা বলত তাই ধ্রুববিশ্বাস করতেন। এমনকি চেতাবনীর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী যেদিন বারোটি ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে সৃষ্টি ধ্বংস করবেন কল্কিঅবতার, সেদিন অহোরাত্র নামসংকীর্তনের আসরে বউ ছেলে বুড়োদাসী সকলকে নিয়ে গিয়ে বসেন।

ঐ গঙ্গার ধারে হরিসভাতেই কীর্তন। ঝমঝম খোলকরতাল, উদাত্ত কণ্ঠে হরিনাম, কোঁচড়ে চিড়ে বাতাসা, খিদে পেলে তাই খাও। অবশেষে সংকটের সময়টি যখন কাটল, এবারকার মত পৃথিবী যখন রক্ষা পেল, তখন বাড়ী ফিরে দেখাগেল মাজা বাসনকোসন সব চুরি হ'য়ে গেছে। বলাবাহুল্য অমলের পিতার বহু বিফলতা ও পরাজয়ের তালিকায় এটিও যুক্ত হ'য়ে যায় এবং সময়ে অসময়ে অনেক বিদ্রূপ ব্যঙ্গ সইতে হয় তাঁকে। এসব কথাবার্তা কখন উঠে পড়বে কেউই জানতনা। কখনো লঘু ও প্রসন্ন কৌতুকের সুরে 'জান ঠাকুরঝি, তোমার দাদার সে যে কাণ্ড ! এমন আলাভোলা মানুষ, ওঁর কথায় মেতে গিয়ে আমিও যেন

বোকা হয়ে গেলাম। কীর্তন শুনে গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরে এসে দেখি কি না···।'

ক্বচিৎ কদাচিৎ। প্রায়শই শোনা যেত অভিশাপ দেবার সুরে। জীবনে যা যা হয়নি, যা যা পাননি সব কিছুর জন্য স্বামীকে দায়ী ক'রে তিনি যখন গলা তুলতেন, তখন তাঁর ভয়ঙ্কর চেহারা, লাল মুখ আর নিষ্ঠুর দৃষ্টি দেখে মনে হ'ত প্রজ্বলন্ত সর্বনাশকে যেন নামিয়ে আনতে চান তিনি। 'তুমি···তোমারি জন্যে আজ আমার এই হাড়িরহাল ডোমের দুর্গতি। পুরুষ মানুষ! মেয়েছেলেদের অধম তুমি নইলে হুজুগে পড়ে অমন করে আমাদের নিয়ে যাও আর বাসনগুলো খোয়াই?'

রেগে কথা বলতেন। তাই যুক্তি দিয়ে তর্ক ক'রে অমল কোনদিনই মা-কে বোঝাতে পারেনি, ঐ 'হাড়ির হাল এবং ডোমের দুর্গতি কথাদুটি ভুল। অন্তত এ যুগে ভুল। অমলদের মত মধ্যবিত্ত গেরস্তদের চেয়ে ওদের অন্তত আর্থিক অবস্থা অনেক ভাল। গতরে খাটতে পারে। সপরিবারে মাইনে পেতে পারে কর্পোরেশন বা মুনিসিপ্যালিটি থেকে। লেখাপড়া শিখলে? লেখাপড়া শিখলে ওদের জাতের একটি ছেলে অমলের চেয়ে অনেক, অনেক বেশী সুবিধে পাবে তাত' অমল নিজের জীবনেই দেখল।

কিন্তু কি কথা থেকে কি কথা। আসলে এই জায়গাটার ভূগোল পালটাবার কথা হচ্ছিল।

এদিকে লোকবসতি হবে, জমির দাম বাড়বে শুনে চেনাপরিচিত আত্মীয়স্বজন সবাই বলতে থাকেন 'এবার ত' অবস্থা ফিরে যাবে হে। জমির দাম বাড়বে, গভর্ণমেণ্ট হাতে নেবে সব। সময় থাকতে যদি এদিকে ধেনোজমিও কিনে রাখতাম।

সত্যিই দাম বাড়ছিল। কসবায় অমলের যে কাকারা থাকেন তাঁরা অবশ্য কাঁচাকাজ করেননি। কাগজপত্তর সব গোছগাছ ক'রে রেখেছিলেন বছরের পর বছর কাটল, এখন সোনার দামে জমি বেচে তাঁরা রীতিমত ধনী হয়ে গেছেন।

অমলের বাবা অতটা বিশ্বাস করতে পারেননি। প্রথমটা বলেছিলেন 'হ্যাঁ', এই বন জঙ্গলের মধ্যে বাস করতে আসবে কে?' পরে বেশ আশান্বিত হন। বলেন 'ভাল দাম যদি পাই তবে পনেরো কাঠা জমিই বেচে দেব' এবং জমিজমা বেচবার আগেই আগবাড়িয়ে ভাবতে সুরু করেন টাকা পয়সা দিয়ে কি করবেন। এ বাড়ীটা নতুন করবেন। কসবার এজমালী বাড়ীতে যে ঘরটা তালাবন্ধ থাকে সেইখানেই বাস করবেন। এ বাড়ীতে বসাবেন ভাড়াটে।

পরে অমল অবাক হয়ে ভেবেছে ওঁরমত সংসারী লোক এমন হিসেবে ভুল করলেন কেন? বাইরের পৃথিবীর কিছু না হয় বুঝতেননা কিন্তু জমিজমা বিষয় সম্পত্তি কিসে কি হয় না হয় তা ত' ভালই বুঝতেন। বুঝতেন বলেই পাঁচজন ওঁকে ডেকে ডেকে সব কাজের ভার দিত। কোথায় কার বাগান নিয়ে মামলা বেধেছে, কে দিল্লীতে চাকরী করেন অথচ এখানে কম খরচে বাড়ী তুলতে চান। কার বাড়ীর পাঁচিল ভেঙে ফটক বসাতে হবে, দোতলাটা হবে বাড়াতে, সব উনিই দেখেশুনে করেকর্মে দিতেন। পরের ঘরই সামলে গেলেন চিরদিন। নিজের বেলা আর কিছুই পারলেননা।

আত্মীয়স্বজনও বেশ। কোথায় ঠাকুরপুকুর, কোথায় দমদম, বাবাকে একবার লিখলেই হ'ল 'তুমি যখন আছ···তোমারই ভরসায়···।' অমনি বাবা গলাবন্ধ কোটটি টেনে বের করতেন, সাদা ক্যাম্বিশের জুতোয় ঘষতেন রং। মা-কে বলতেন 'নিতুর সঙ্গে অমনি আমাকেও দুটো দিয়ে দিও।'

মা সক্রোধে বলতেন 'বনের মোষ তাড়াচ্ছেন। বুঝলি নিতু, তোর বাবা চিরকাল বনের মোষ তাড়িয়েই গেলেন। যেদিন এ বাড়ীতে পা দিয়েছি, সেদিন থেকেই দেখছি ত। এক ভাবে সারাটাজীবন গেল।'

শুনেশুনে অমলের মনেও রাগ জমত। বাবাকে মনে হ'ত নির্বোধ। মা'র কাছে যা যা শুনত তাতে আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে ওর বিশেষ

ভালবাসা জন্মায়নি। কেমন যেন ধারণা হয়ে গিয়েছিল সবাই ওদের ঠকিয়েছে, ওর মা-কে বোকা পেয়ে খাটিয়ে নিয়েছে আর বাবার ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে নিয়ে নিজেদের সংসারের সুসার করে নিয়েছে।

হয়, এরকম হয়। ছোটবেলা থেকে যেমনটি শোনা যায় মনে তারই প্রভাব পড়ে। একবার মনের ক্ষোভ মুখ দিয়ে বেরোতে সুরু করলেই মা যে সংসারের আগোপান্ত কুলজীকুষ্ঠি গাইতে বসতেন। বীরু ঠাকুরপোর দমদমের বাড়ীতে ভাড়াটে বসছেনা তাতে তোমার কি! ঐ বীরুর জন্যে তুমি কম করেছ! অথচ নিতুর টাইফয়েডের সময়ে এমন হন্যে হয়ে ছুটে গেলে, ওর ত' নিজের দোকান, দিয়েছিল বাকিতে ওষুধ!

অথবা, রাণীর মেয়ের বিয়েতে অত দামী কাপড় দেবার শখ থাকে ত' যেখান থেকে পার কিনে দাও গে যাও। এতবড় মন, এমন অবস্থা এ চিরকাল শুনেই এলাম। এই ত' আমার নিতুর অন্নপ্রাশনে এসেছিল, দশটা নয় পাঁচটা নয় একটা ভাই পো কোন আক্কেলে ছুটি রূপোর টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করল বলত?

মাঝেমাঝে এমন একেকটা কথা বলতেন তাতে গায়ে জ্বালা ধরে ধরে যেত বটে কিন্তু পরে অমল বুঝেছে সত্যিকথাই বলতেন। নেহাৎ অল্পবয়স থেকে আঘাত পেতে পেতে সংসারটাকে ভালমতই চিনে ফেলেছিলেন। মাঝে মাঝে বলতেন 'যতদিন আমার অবস্থা ছিল, আমার কাছেও মানুষ আসত। সবসময়ে যে আশায় আশায় আসত তা নয়। তবু আসত। আমার সবকিছু দেখেই ভাল ভাল করত। সংসারের নিয়ম এই।'

পরে অমল ভেবেছে ঐ কথাগুলো থেকে যদি তিক্ততা ক্ষোভ ও জ্বালা সরিয়ে নিয়ে সুন্দর শোভন ভাষার সাজ পরিয়ে দেওয়া যায় তবে ঐ কথাকেই মনে হবে দার্শনিকের উক্তি।

আসলে নিজের জীবন দিয়ে যা শেখা যায় তাই মনে থাকে। পুলকের

পকেটে যেদিন টাকা ঝনঝন করছে অমলের পাওনা টাকা শোধ করবার কথা ভুলে গিয়ে পুলক সহসা একজন বিখ্যাত সদাশয় লোকের কথা তুলে বলেছিল 'ওনার হার্ট, দেখে ভাই আমি আশ্চর্য হ'য়ে গেলুম চোখে জল এসে গেল। বললেন পুলক আমার পক্ষে পাঁচশো টাকা দেওয়া মুস্কিল এখন, তবু আমি দেব আমি যখন অনাদির চিঠি নিয়ে এসেছ, অনাদি আমার বন্ধু। আমাকে দিলেন বটে, কিন্তু সেদিন হ'তে ওনার নিজের পকেটেই পয়সা নেই। কি রকম হার্ট বল দিখিনি?'

আজ ভাবলে পরে পুলকের প্রতি করুণা হয়। থাকবে, ওদের মত লোকেরাই জগৎজুড়ে থাকবে। যাদের নিয়ে সবাই হইহই করছে তাদের ঘিরে ওরাই হাততালি দেবে। নামের ভক্ত, নামের পূজারী। যতক্ষণ না মই-এর ওপর চড়তে পারছ ততক্ষণ কেউ তোমার পাশে নেই। যখন ওপরের সিঁড়িটি ছুঁয়ে ফেলেছ তখন ত সত্যিই আর কারুকে প্রয়োজন নেই তোমার। অথচ তখন 'আমি? আমি ত' ওঁকে চিনি, ওঁর বাড়ীতে যাই, আড্ডা মারি' এটুকু বলতে পারার জন্যেই অনেক লোক আশপাশে এসে ভীড় জমাবে। 'আমার লেখাটা সম্পর্কে অথবা আমার ছবিটা দেখে উনি বলছিলেন আজকাল ফ্রান্সে···'

এই হয়। যারা এমনি ধারা নামের আশপাশ দিয়ে হাততালি মেরে বেড়ায় তারা স্বভাবে চাঁদের মত। ধারকরা আলোটুকু নিয়েই তাদের কারবার। হয়ত এটা আজকের ব্যাপার নয়, চিরদিনই মানবচরিত্র এ রকমই ছিল। ঘরে দেখা যেত দাপুটে এবং বেশী রোজগেরে জ্যাঠা-মশায়ের খাওয়াদাওয়া দেখতে গিয়ে মহিলারা নিজের ছেলেপুলের কথা ভুলে যেতেন। বেলা গড়িয়ে চোখমুখ লাল করে শহীদের স্বর্গীয় হাসি মুখে মেখে বলতেন 'এই ঝোলটুকু ক'রে আনলাম না খেলেই অসুখ হবে ওঁর।' বাইরেও দেখা যেত এক একটি লোককে 'দাদা' বানিয়ে দশজন মাতামাতি করছেন। ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজসেবা যে যেদিকে নাম করেছে তাকেই দাদা ডাকবার মত একদল লোক তৈরী হয়েই থাকত।

পুলকও ওদেরই মত। এবং অতিতুচ্ছ, অতি নগণ্য। তবে সেদিন অমল এমন নিস্পৃহ হয়ে সবটা বিচার করতে পারতনা। পুলকের কথা শুনে তার মনে হয় বন্ধুকে সে আরেক চেহারায় দেখছে। তার কাছে কতবার টাকা নিয়েছে পুলক, কত অবস্থায় কি কষ্ট করে অমল তাকে টাকা দিয়েছে। কই তার টাকা শোধ করা দূরের কথা, তার হৃদয়টা বড় কি না সে কথাও ত বলেনি। তখনো অমলের মন কাঁচা এবং তার অবস্থা অনেকটা মুষ্টি যুদ্ধের রিং-এ নামা তরুণ ও অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীর মত। কোন্‌দিক থেকে আঘাত আসবে জানেনা, কোন সময়েই প্রস্তুত নয় এবং সেজন্যেই ঘুঁষি খেয়ে খেয়ে রক্তাক্ত হয় বেশী।

মার কথা মনে করতে কত কথাই মনে পড়ল। মা পুলকের কথাও বলতেন 'ও ছেলেটি যত কম আসে ততই ভাল।'

মা আর বাবা।

কি তেতোই হয়ে গিয়েছিলেন, কি নিষ্ঠুর ভাবেই না বিঁধতেন বাবাকে। অথচ কোথায় যেন একটা বন্ধন রয়ে গিয়েছিল, প্রাত্যহিক হাজার হাজার গ্লানির নিচে চাপা পড়ে থাকত একটি ক্ষীণ বিশ্বস্ততা বোধ। সময় হলেই তা প্রকাশ পেত।

বাবাকে উনি যা নয় তাই বলবেন। সবরকম দুঃখ বঞ্চনার জন্যে দায়ী করবেন। কিন্তু যা করবেন উনি নিজে। অন্য কেউ ভদ্রলোককে কিছু বলুক, অপমান দূরে থাক তাচ্ছিল্যের সুরেই বলুক অমনি জ্বলে উঠবেন মা। ফর্সা বিবর্ণ মুখ জ্বল জ্বল করে উঠত। খুব রাগলে গলার স্বরটা নামিয়ে নিতেন। আস্তে এবং ধরা ধরা গলায় বলতেন 'এ বাড়ীতে দাঁড়িয়ে ওনার সম্পর্কে কথা বল তোমার ত' আস্পদ্দা কম নয়।'

ঐ ধরাধরা গলাটি এবং নিচু কাঁপাকাঁপা স্বর হ'ল বিপদের লাল-বাতি। কেননা তারপরেই হয় হা হা ক'রে কান্নায় ফেটে পড়তেন নয়ত মূর্ছা যেতেন।

অমল জানে ওঁকে মোক্ষম আঘাত দেবার অস্ত্র ছিল ওঁর স্বামীকে

নিয়ে কিছু বলা। একমাত্র তখনই বোঝা যেত বহিরঙ্গের হাজার কুশ্রীতার অন্তরালে একটি নিরঞ্জন অনুভূতি আছে।

অথচ অন্য সময়ে ?

বাবার একটি সহকর্মী চেতলায় তেতলা বাড়ী তোলেন। গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্নে গিয়ে সে বাড়ী দেখে এসে অমলের মার সে কি ক্ষোভ। অমন বাড়ী ইচ্ছে করলে তুমি ও তুলতে পারতে। ওরা কেমন যে যার মত গুছিয়ে নিলে। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যান। কেননা অমলের বাবার চোখ দিয়ে দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ছিল।

এক সময়ে বোধ হয় অমলের বাবার উপর ওঁর গভীর বিশ্বাস ছিল। আশা করতেন স্বামী সত্যিই ওঁকে একটি সম্মানের আসন রচনা ক'রে দেবেন। বিদ্যে আছে বুদ্ধি আছে, চেহারার শ্রী উজ্জ্বল, বড় বংশের ছেলে, পারবেননা কেন। কর্পোরেশনের যে বিভাগে চাকরী করেন, যে চেআরে বসেন সে চেআরে ব'সে অন্যরা ত রমারম অবস্থা বাড়িয়েছেন।

সে বিশ্বাসটা নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়। এক হাতে বিদ্যা এবং এক হাতে বুদ্ধি দুই হাতে দুই তলোয়ার বনবন ক'রে ঘোরালেই সংসার সমরে জেতা যায় না। যোদ্ধা ব্যক্তিটি হাসি মুখে বলতেন 'যে যাই বলুক, সত্যের পথই একমাত্র পথ। অধর্ম করাটা কিছু না, কিছু না। আরে বাবা আমি হলাম এ সেঞ্চুরীর একটা শিক্ষিত লোক। একটা মানুষ খাঁটি থাকলে জাতের জোর বাড়ে কত। কেন, সেই বিন্দু বিন্দু জলে মহাসাগর হয়, ছড়াটা তোমাদের স্কুলে পড়নি ?'

বাইরে চুপ করে থাকতেন। বউএর কাছে এসে মুখ খুলতেন। বছর দশেক কাটতে না কাটতেই অবিশ্যি ভদ্রলোক বুঝতে পারেন তিনি পরীক্ষায় ফেল করেছেন। সুখ সমৃদ্ধি কোন পথে আসবে সে ঠিকানাটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না। আরো দেখলেন ছা-পোষা মধ্যবিত্ত লোকের মুখে ঐ সততা, ন্যায্যপথ, ধর্ম এ কথাগুলো মেকি মেকি শোনায়। এক বয়োজ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি ত' বলেই বসলেন 'সকলে ঐ

দোহাই দেয় হে, যারাই জীবনে কিস্সু করতে পারেনা তারাই বলে আজকাল ভাল মানুষের ভাত নেই। হ্যাঁ, টাকা আছে, দাপটে বাস করছে, ইচ্ছে করলেই পাপের প্রশ্রয় দিতে পারে এমন লোকের মুখে ওসব কথা মানায় বটে।

এ হেন কথাবার্ত্তা অমলের বাবাকে ব্যথিত করেছে, বিস্ময়ে তিনি তাজ্জব বনেছেন। কি আশ্চর্য কথা, কি জগাখিচুড়ি হিসেব সব বাবা! পয়সা হচ্ছেনা বলে তাঁর জীবনের নীতিটিতি এ-সব কথার কোন মূল্য নেই? তিনি, স্বাধীন ভারতের একজন সিটিজেন!

ভগ্নীপতি দামী ধুতি ফাঁক করে উরু চুলকোতে চুলকোতে বলেছিলেন 'নাথিং সাক্সীডস লাইক সাকসেক্স!' শেষের কথাটিতে যদিও 'ক' নেই তবু তিনি 'সাক্সেক্স' বলতেন। স্বল্প লেখাপড়া এবং বাপের লোহার কারবারে কামানো টাকা, সর্বোপরি বাড়ীর বড় জামাই তাই কেউ ভুল ধরিয়ে দিতে যেত না। মাংসের ঝোল চাখার মত চপচপ সপসপ শব্দ ক'রে তিনি 'সাকসেক্স' বলতেন। অমলের সন্দেহ হয় সকলের সামনে লাইসেন্স নিয়ে 'সেক্স কথাটি বলতে তাঁর ভাল লাগত। চাকরীর সন্ধানে ওঁর দোকানে ধণা দিয়ে বসে থাকবার দিনও এসেছিল তার জীবনে। ওখানে বসে বসে সে বিধান রায়ের বাড়ীর চূড়োয় সূর্যকে লাল হ'তে দেখত এবং হা ক'রে চেয়ে থাকত।

তখন পিসেমশায় লোহার সিন্দুকে ঠেস দিয়ে ময়লা ফরাসে বসে গরম গরম বই পড়তেন। অমল ওঁকে নাকমুখ গরম ক'রে খিকখিক শব্দে স্বগত হাসতে দেখেছে। 'তোর বাবার কিস্সু হ'লনা। আরে বাবা পয়সাকে যারা হেলা অশ্রদ্ধা করে পয়সা তাদের কাছে আসবে কেন!' কথাগুলো বোধ হয় অমলকে ইচ্ছে ক'রেই খোঁচা দিয়ে বলতেন। কথাগুলো নেহাৎ মিথ্যে নয়।

সেদিন থেকেই অমল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল বাবার মত সে কিছুতেই হবে না। পয়সার দাপট দেখাতে না পারলে সবাই আড়ালে

'শালা' বলে। যেন তেন প্রকারেণ তাকে অবস্থার সিন্ধবাদের বোঝা ফেলে সোজা হয়েদাঁড়াতেই হবে।

আজ মনে পড়ে।

কি চেষ্টা কি অবিরত প্রয়াস। পরিণামে? আদালতে রাজসাক্ষীর অবস্থা খুনীর চেয়ে অনেক হেয়। তাই অমলের আর বুঝতে বাকী থাকে না ওদের চোখে সেও খুনী এবং তার দু হাতের কনুই অবধি রক্তে লাল।

দূরে ফড়াৎ করে বাজ পড়ল। এখানকার আকাশে তার অনুরণন অনুভূত হল।

॥ তিন ॥

অনেকদিন আগে একসময়ে নাকি ওরা সবাই একসঙ্গে কসবার বাড়ীতে থাকত। এ বাড়ীটি অমলের ঠাকুরদার নিজের, আসলে ওরা এখানকারই বাসিন্দা। সেই যখন এই গঙ্গার জলে নৌকা পিনিস বজরা চলত বাঁশদ্রোনীর ঘাটে নৌকো বেঁধে আলালের ঘরের দুলাল মতিলালের বাবারা ঠকচাচাদের সঙ্গে আদালত কাছারী করতে আসতেন তারও আগে থেকে।

তখন এই গঙ্গায় নেয়ে লোকে পুণ্য অর্জন করত, এরই তীরে শিবালয় ও কালীমন্দির সম্বলিত শ্মশানঘাটে দাহ হ'লে মৃত স্বর্গ পেত। তারও আগে, সম্ভবতঃ মহাপ্রভুর নামের সঙ্গে জায়গাটি জড়িয়ে প্রবাদবাক্য ছড়াবারও আগে, এই দীঘিটি তৈরী করা হয়। এরই নিচে অতিগভীর নাকি উৎসর্গীকৃত দেব মন্দির আছে, অনেকসেঁচেও নাকি এর জলের তল পাওয়া যায়নি।

সেই সময়ে অমলদের পূর্বপুরুষরা এখানেই ছিলেন। তারপর গেলেন কসবা। সেখানেও বেশ জাঁকিয়ে বসেন, অমলের প্রপিতামহ একটি স্কুলও তৈরী করেন, অনেক অর্থবান সজ্জন ব্যক্তি যেমন করতেন।

অমলের বাবা নিজের বাবাকে দেখেননি, জ্যাঠামশায়ের হাতে মানুষ। বুড়ো ভদ্রলোক বিয়েটিয়ে করেননি। অনেকদিন লয়েড্‌স ব্যাঙ্কে ভাল চাকরী করেন, পরে রিটায়ার করে জ্যোতির্বিদ্যায় খুব ঝোঁক হয়।

জ্যোতির্বিদ্যা পড়তে গিয়ে দেখলেন অঙ্ক না জানলে চলছে না, এবং ভালমত সংস্কৃত না জানলে শুধু অঙ্ক চর্চা করেও তৃপ্তি পাওয়া কঠিন।

পড়তে পড়তে মাথায় নানা চিন্তা ঢোকে। অবসরপ্রাপ্ত মানুষ বাড়ীর কর্তা। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠতেন 'মন দে মন দে! হাতের

বইয়ের দিকে মন দে। তোদের দিয়ে কিছু হবেনা। হবে কি করে? মন যে গাভী দ্বারা আচ্ছন্ন।'

গাভী দ্বারা আচ্ছন্ন কি রে বাবা। জিগোস করতে সাহসে কুলোত না, ছেলেরা মাথা নিচু করে বসে থাকত। তখন তিনি সেই বৈদিক যুগের এক যজ্ঞ সভার গল্প ফেঁদে বসতেন। তর্ক হবে, যিনি জয়ী হবেন তাঁকেই রাজা সুবর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গ একলক্ষ গাভী দেবেন। বিরাট সভা। দুর্গম পাহাড় থেকে জোড়াজোড়া সোমপাতা আহরণ করা হয়েছে। বিধি মতে পিষ্ট করে তার কাথ বের করে দই দুধ ঘি মধ্ সহযোগে পান করা হয়েছে। যজ্ঞস্থল সভাক্ষেত্রের বহুদূর অবধি নানাবিধ কোলাহল গমগম করছে, সূপশালা থেকে পক্ক মাংসের গন্ধ আসছে, হোমাগ্নির ধোঁওয়ায় আকাশ কালো। বাইরে তাকালেই বিস্তীর্ণ হরিৎ ক্ষেত্রের ওপর দুগ্ধ ধবল, পাটল, কৃষ্ণবর্ণ গাভীদের দেখা যায়, তাদের দেহ চিক্কণ, শৃঙ্গ সুবর্ণমণ্ডিত এবং বলিষ্ঠ দেহ গো-পালকগণ হই হই করে সপত্র গাছের ডাল আস্ফালন করে ওদের ভয় দেখিয়ে বেড়ার মধ্যে রাখছে।

তর্ক করবেন কি, ব্রাহ্মণরা কেবলই ঘনঘন ঐ গাভীর দিকে তাকান। যিনি তর্কটি তুলেছেন তিনি অবশেষে ক্রুদ্ধ হয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেন 'আসল বিষয়ে এঁদের মন নেই, এঁদের মন গাভী দ্বারা আচ্ছন্ন।'

গল্পটি শেষ করে বৃদ্ধ আবার বলতেন। 'জ্ঞানলাভের কোন ইচ্ছে নেই, সামনে চকচক করছে আসন্ন পরীক্ষা কোনমতে পাশ করবার প্রলোভন। সাধে কি বলি তোদের মন গাভী দ্বারা আচ্ছন্ন?'

অন্যদের এঁটে উঠতে পারেননি, তারা প্রত্যেকেই নির্লজ্জ ভাবে গাভী আহরণের চেষ্টায় ধাবমান হয়। শুধু অমলের বাবাকে পেলেন অনুগত। বললেন 'ছাখ্, তোকে আমি এখনি একটা পরীক্ষায় বসিয়ে ডেপুটি সার্ভিসে ঢোকাতে পারি। এখনো হার্পার, নটউড ওরা সার্ভিসে রয়েছে। কিন্তু আমার ইচ্ছে তুই কর্পোরেশনে ঢোক। হাজার হলেও আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান। দেশের মুখউজ্জ্বল করা রত্নরা সব ওর মধ্যে রয়েছেন।'

গুরুআজ্ঞা শিরোধার্য করে অমলের বাবা অবতীর্ণ হলেন সমরে। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর তাঁকে সবাই মিলে 'তুমিই এখন বাড়ীর কর্তা' ব'লে একটি গালভারী পদে বসিয়ে দেয়। সে কথা শুনে গলাবন্ধ সাদা কোটের নিচে হৃৎপিণ্ডটি আনন্দে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে অস্থির। দশজনকে নিয়ে বাস করতে ভালবাসেন, মনের মত পদ, বাড়ীর কর্তা।

তার ফলে ভদ্র নিরীহ মানুষটিকে নানাবিধ দায়িত্ব নিয়ে একসঙ্গে বহু ভূমিকায় নেমে পড়তে হয়। বাজার করবেন,অমন বাজার কেউ করতে পারে না। ছোটদের পড়াবেন, হাজার হলেও বাড়ীর কর্তা, ওঁর কাছে যেমন বসবে, তেমনি কি আর···? এমন কি শীতের প্রারম্ভে ধুনুরী ডেকে তোষক লেপ করাতে দেবার দায়িত্বটি অবধি ওঁরই মুখচেয়ে থাকত।

তাঁর সাদাসিধে জীবনযাত্রা এবং মুখে জীবন-নীতির কথা যারা শুনত তারা মুচকি হাসত। পরে অমলের বাবা জানতে পারেন তিনি যখন ওসব কথা বলতেন তখন ওরা বলত 'ভারী চালাক সেজদা। কর্পো-রেশনের যে ডিপার্টমেণ্টে ঢুকেছে সেখানে দু'হাতে রোজগার। আসলে রীতিমত আখের গোছাচ্ছে দেখ গে।'

অমলের বাবা আশ্চর্য এবং ব্যথিত হন। তারপর ব্যথার কথাটথা ভুলে যেতে হয়। অবাক হওয়ার যেন শেষ থাকে না। মোটাঘুষ নিচ্ছেন এ ধারণা যতদিন ছিল ওরা তাকে তবু শ্রদ্ধা করেছে। যেদিন জানাগেল সত্যিই উনি ঘুষ নেননা, নিজেদের বাড়ীর ট্যাক্স কায়দা ক'রে কমাতে মোটেই ইচ্ছুক নন, সেদিন ওদের শ্রদ্ধাভক্তি সব টুপটুপ ক'রে নিভে গেল। যেন দাদাকে ওটুকু সম্মান দেখান অনর্থক বাতি জ্বালাবার মতই বোকামি। ও উদ্যমটুকু অন্যত্র খরচ করলে কাজ দেবে।

ওঁর জীবনদর্শন এবং নীতি-ও দেখা গেল মস্ত একটা ঠাট্টার জিনিষ। অথচ সত্যিই উনি লোক দেখান' কিছু করেননি। এক ভাগ্নীপতি এবং তস্যপুত্র বড় ডাক্তার। এ বাড়ীর সব চিকিৎসাপত্তর তাঁরাই ক'রে থাকেন। ওঁদের বিব্রত করতে লজ্জা পেতেন ব'লে নিজের দরকারে

অমলের বাবা পয়সা দিয়ে ডাক্তার ডাকতেন। বাড়ীতে সবাই বলত বাড়াবাড়ি এবং ডাক্তার আত্মীয় দুটি-ও অসন্তুষ্ট হতেন। বলতেন 'অন্যলোক ষোলটাকা দিয়ে দেখতে পারলে ভাগ্যি মনে করে, ভায়ার কাছেই শুধু পাত পেলাম না।'

অমল যখন খুবই ছোট, তখন তাঁরই ঠাকুর্দার নামের ইস্কুলটিতে ওকে ভর্তি করতে চাননি। বলেছিলেন 'ওরা হয়ত নিতুনে ফ্রী পড়াবে. একটা গরীব ছেলে সীট পাবেনা! তার চে' আমার ছেলে অন্যত্র পড়ুক। আমরা শিক্ষিত সিটিজেন। উই মাস্ট মেক ওয়ে ফর আদার্স'।

তিনি যে একজন শিক্ষিত সিটিজেন এ কথাটি কখনো ভুলতেন না। রাস্তার বাঁ দিক ধরে হাঁটতেন, পথেঘাটে পানের পিচ ফেলতেন না, কর্পোরেশান, ট্রামকোম্পানী, বাস, সরকার, যে যখন সাধারণে আপীল জানাত 'সহযোগিতা করুন' তিনি সবচেয়ে আগে এগিয়ে যেতেন।

ফলে অকালে বুড়ো হ'লেন। শরীর শুকোতে থাকল এবং কর্মক্ষমতা কমে আসবার সঙ্গে লক্ষ্য করলেন তাঁরচেয়ে তাঁর কৃতী ভাইপোরা সংসারে অনেক বেশী সম্মান পায়। পঞ্চাশে পৌঁছে যখন বুঝলেন তাঁর জ্যাঠামশায়ের দিন নেই, হয়ত' কোনদিনই ছিলনা। লয়েড্স-ব্যাঙ্কের মোটাপেনশান না থাকলে তাঁর গম্ভীর কণ্ঠে 'তোরা গাভীতে আচ্ছন্ন' সে কালের যুবকরাও মাথানিচু ক'রে শুনত নাকি সন্দেহ, তখন মনটা ভেঙে গেল।

কসবার বাড়ী ছেড়ে এখানে এসে যেন একদিকে বাঁচেন। অন্যদিকে খুব কষ্ট হয়েছিল। পাঁচজনের জন্যে ভেবেভেবে নিজের জন্যে আর কিছুই করা হয়নি। পুরনো, ব্যবহারের অযোগ্য অথবা সেকেলে হয়ে যাওয়া ক'টা খাট পালঙ্ক বাসন কোসন নিয়ে এবাড়ীতে এলেন। ঠিক কি কি কারণে সাফল্য পেলেন না সেটা শেষদিন অবধি বোঝেননি। না বুঝে মাঝেমাঝেই অবাক হয়ে চেয়ে থাকতেন। কেন পারলাম না? কিসে ভুল হচ্ছিল? তাঁর চোখ দুটি মাঝেমাঝেই সে প্রশ্ন শুধোত।

সদাসর্বদা চিন্তা করতেন, মাথায় হাত রেখে ভাবতেন।

এ সব জায়গায় লোকবসতি হবে, জমিজমার দাম বাড়বে তা প্রথমটা বিশ্বাস করেননি।

যখন সত্যিই লোকজন আসতে আসতে স্থুরু করল তখন ওঁদের দুজনকে বেশ খুশী খুশী দেখা গেল। বহু বছর বাদে দু'জনে মাঝেমাঝে মুখোমুখি ব'সে কথা বলেন। বয়স হবার অনেক আগেই বুড়িয়ে গিয়েছিলেন দু'জনেই। এখন সত্যিসত্যি প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে এসে দুজনের চেহারাই বেমানান লাগে। বিশেষ ক'রে বাবাকে, অবাক হ'য়ে দু'চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকেন যখন।

আবার একবার তাঁর চোখেমুখে অসম্ভব আশা জ্বলজ্বল করতে দেখা গেল। গরীব কাঠুরে ব্যর্থ দিনের শেষে রত্নগুহার সন্ধান পেয়ে যেমন আনন্দে ভাসতে ভাসতে বাড়ী ফেরে তিনিও তেমনি খবর টবর কুড়িয়ে বাড়ী ফিরে আসেন। হাসিমুখে বলেন 'আশ্চর্য, অবাক কাণ্ড করলে। এখান থেকে যাদবপুরের মধ্যে তিনটে হাই ইস্কুল বসবে. দরজার কাছে লণ্ড্রী, মুদীখানা কে জানত বল এত সব হবে?'

বলতেন 'যতে কুণ্ডু আমায় বলল জানেন, জমি এখন সোনার দরে বিকোবে। আমায় বলে কি না দাদা এসব জায়গা ভালকরতে সরকার টাকা ঢালবে তাতে আপনার কি? আমি বলি কেন আমার আনন্দ হবেনা কেন? আমি কি স্বাধীন ভারতের সিটিজেন নই?'

আগে ছিলেন পরাধীন ভারতের নাগরিক, এখন স্বাধীন দেশের সিটিজেন হ'য়ে সকলের বশংবদ ভালমানুষ লোকটির আর গর্বের সীমা ছিলনা। বলতেন ও 'বাবা এরা একেবারে রাতকে দিন ক'রে ফেলবে। দেখছ না, জমির দর কেমন উঠতির দিকে?'

শেষ অবধি অবিশ্যি মুখে হাসি থাকেনা। সকলের আগে আগবাড়িয়ে জমি বেচতে গেলেন, জলের দরে বেচতে হ'ল। বাড়ীর সঙ্গেকার কাঠাপাঁচছয় জায়গা ছাড়া সবই দিলেন বেচে।

আবার তাঁকে ঘা খেতে হ'ল।

চোখের সামনে সেসব জমির দর কোথায় উঠেগেল। হাজার হাজার টাকায় একমুঠো জমি বিক্রী হ'ল। খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি হ'ল জায়গাটার। দোকান বাজার, চওড়া রাস্তা, ইলেক্ট্রিক, ইস্কুল কলেজ কোন কিছুরই অপ্রতুল রইলনা। এই সর্বাঙ্গীণ উন্নতি দু'চোখ দেখতে দেখতে একদিন তিনি মারা গেলেন।

অমল অনেক সময়ে অবাক হ'য়ে ভেবেছে বাবা এমন ভুল করলেন কি ক'রে। আর ক'বছর অপেক্ষা করলেই যে অনেক অনেক বেশী টাকা পাওয়া যাবে তা কেন বুঝলেন না। অথচ জীবনে এই একটি জিনিষই বুঝতেন। এই নিয়েই নাড়াচাড়া ক'রে গেছেন।

শেষের দিকে যেন সত্যিই ভীমরতি হ'ল। জমির দাম যখন খুব চড়া তখন আর ভদ্রাসন সংলগ্ন বাগানটুকু বেচলেন না। বাগান মানে নামেই বাগান। ক'টা নারকেল, একটা আমড়া, দুটো নিষ্ফলা আমগাছ।

জমি বেচেননি শুনে সবাই নানারকম মন্তব্য করে। পুলক বলেছিল 'না ভাই, তোমার বাবার বৈষয়িক বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারছিনা। পঞ্চাশ টাকা কাঠায় একদিন জমিবেচতে পারলেন। এখন দু'হাজার টাকা যখন কাঠার দাম, তখনই বেঁকে বসলেন?'

সেইদিন শুধু আর ধৈর্য রাখতে পারে নি অমল।

সে জমিটুকু এখনো আছে।

ঐ নারকেল গাছ, অমলের বাড়ী আর অমলদের ঘাটটাই যা বদলায়নি। আর সবই ত উল্টে পাল্টে অন্যরকম হ'য়ে গেছে। ঐ ত, পুকুরটা, বারোমাস টলমল করছে জল। মাঝেমাঝে এসে ঢাকঢোল বাজিয়ে ওরা পূজো দিয়ে যায়। সারাবছর ধরেই কালীপূজো করে এরা। প্রতিমা ডুবোতে আসে। আধপোড়া অর্ধস্ফীত মৃতদেহের মত প্রতিমার কাঠামো ভাসতে থাকে জলে।

বাবা অবিশ্যি এত সব দেখে যাননি।

শেষসময় যখন আসে যখন ওঁর চোখদুটি ভোরাই তারার মত ক্ষীণ

প্রভ ও করুণ হ'য়ে অমলের মুখের ওপর স্থির হ'য়েছিল। যতক্ষণ জ্ঞান ছিল ঐ চাহনিটি অমলের কাছে ক্ষমা চা'চ্ছিল। অমলের জন্যে তেমন কিছুই করতে পারেননি ব'লে ক্ষমা চাইছিলেন ভদ্রলোক।

আজ কাল কি দুঃখই হয়।

ক্ষমা চাইবার কি আছে? যে যার ভাগ্য নিয়ে আসে, কপালে যেমনটি লেখা আছে তেমনটি হিসেবে নিজের পাওনা বুঝে নিয়ে চলে যায়।

বটগাছের একটা ডাল মড়মড় ক'রে ভেঙে পড়ল।

অমল চকিত হয়ে তাকাল।

জানত, সে সবই জানত। তবু প্রলোভনের ফাঁদে ধরা দিল কেন?

নিয়তি। নিয়তিকে এড়িয়ে যাওয়া চলেনা।

আজ রাতের বুকে এই যে দাপাদাপি, গাছের ডাল মড়মড় ক'রে ভাঙছে, দরজা জানালা ধড়াস ধড়াস করছে সব কিছুর মধ্যেই অমল নিয়তির পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে।

আজ রাতেই আরেকজনের জেলবাসের মেয়াদ পূর্ণ হচ্ছে। নিশ্চয় তার চোখেও ঘুম নেই। কাল সকালে অথবা যে কোন সময়ে সে এসে দাঁড়াবে। ফর্সা রং, দীর্ঘকায় চেহারা। মাথায় টাক, পাতলা চুলে ব্যাকব্রাশ। হয়ত খানিকটা রোগা হয়েছে এবং চোখদুটি প্রতিহিংসা নেবার আনন্দে আরো উজ্জ্বল। এসেন্স ঢালবার অভ্যাসটি আজও রেখেছে কি না কে জানে।

সে আসবে তাই আকাশে বাতাসে এতগুলো দুর্লক্ষণ। হয়, শেষ সময়ে হয়। সে আসবে অমলকে ডাকবে। অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হয়ে সত্যবান যমকে অনুসরণ করেছিলেন। নীরবে, অসাড় পুত্তলিরমত নাগপাশে বাঁধা।

অমল কি করবে?

কিছুই না। কত আর ছুটতে পারে সে ? কখনো ভাগ্যের পেছনে, কখনো নিয়তিকে এড়াবার জন্যে ? যত দৌড়ও যতদূরেই পালাও শেষ অবধি হারমানতেই হয় এবং ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

এখন শান্ত হওয়া উচিত। আত্মসমর্পণ কর। অন্ধকারে ব'সে থাক স্থির হয়ে। তবু ত' অমল স্থির হ'তে পারছেনা। এমন কি, আজ ভাবলে করুণা হয় সর্বনাশ ঘটে যাবার পরেও অমল সৎভাবে বাঁচার চেষ্টা ক'রেছিল।

তখনো সে তার পরিণাম জানত। একদিন আরেকজন কারাগার থেকে বেরুবে, প্রতিশোধ নিতে আসবে।

তবু, জীবনের ক্ষণিক মেয়াদটুকু সৎভাবে বাঁচার জন্যে অমলের সে কি চেষ্টা। পরিণাম ত' জানে, তবু অমল চেষ্টা করল কেন ?

পরিণম জানা থাকলেও মানুষ চেষ্টা করে। কর্ণপর্বের কর্ণ। পুরনো সিন্দুকের ওপর তুলোট কাগজে ছাপা ভারী এবং পোকায় কাটা মহাভারত। 'দিনমণি অস্তগামী তবু কর্ণ রথচক্র তুলিতে চেষ্টিত হইলেন।' সামনে অর্জুন এবং কৃষ্ণ। যুদ্ধের সময়ে শত্রুর ওপর কোন দয়া নেই। সূর্য অস্তাচলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেহ থেকে সব শক্তি চলে যাচ্ছে। কবচ ও কুণ্ডল নেই, জয়লাভের সব লক্ষণই পাণ্ডবদের। এদিকে দিনমণি অস্তগামী। 'তবু কর্ণ চেষ্টিত হইলেন এবং আবার চেষ্টিত হইলেন।'

অমলও চেষ্টা ক'রেছিল। একই কারণ, কোন তফাৎ নেই। যে সব কারণে মানুষ চেষ্টা ক'রে থাকে সেই সব মানবীয় কারণেই।

॥ চার ॥

ঠিক কোন মাস তা মনে নেই, আষাঢ় শ্রাবণ হবে নীতাদের বাড়ীতে গিয়েছিল অমল। সেই প্রথম দেখা। এখনো বেশ মনে পড়ে গাঙ্গুলীদের মাঠ ছাড়িয়ে একতলা বাড়ীটার সামনে কয়েকটি স্কুলের ছেলে ভয় পাওয়া অথচ কৌতূহলী মুখে দাঁড়িছিল। অমলও একটু দাঁড়ায়। ভেতর থেকে একটি মেয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল 'মেরে ফেললে মেরে ফেললে।'

কে চেঁচায় রে বাবা! একটা ছেলে বললে 'পটল মিস্তিরীর বোন চেঁচাচ্ছে।'

পটল মিস্তিরী, কে সে? যেই হোকনা কেন, তার বাড়ীর ব্যাপারে দোর ধাক্কা দিয়ে কারণ জিগ্যেস করাটা কি উচিত হবে? বাড়ীটা অবশ্য একেবারে অচেনা নয়। অন্তত চেহারাটা ক'বছর ধরেই দেখা যাচ্ছে তার আগে বাঁশঝাড়ে একেবারে ঢাকা পড়েছিল।

দরজার কাছে ছেলেদের কথাবার্তা বোধহয় ভেতরে পৌঁছচ্ছিল। দোর খুলে যে ছেলেটি বেরিয়ে এল তাকে অমল চেনে। সরস্বতী পূজো অথবা অন্যকোন উৎসব পার্বণে যে দোকানটা লাইটের বাল্‌ব, তার, কলেরগান, মাইক ভাড়া দেয় সেই দোকানেই দেখেছে। ফর্সা রং নীল লুঙ্গি পরণে, খালি গা। মুখটা লাল এবং চোখের দৃষ্টিটা বেশ কড়া।

'কি সার, আমার খিড়কীর কাছে কি ক'চ্ছেন?'

অমল অপ্রস্তুত। ছোট ছেলেগুলো সরে পড়েছে। কি বলবে? সত্যিই ত' ওর বাড়ীর খিড়কীতে দাঁড়িয়ে অমল কি করছে!

'আপনি ত' চাটুজ্জে মশায়ের ছেলে।'

অমল ঘাড় নাড়ে। কিছু একটা বলা দরকার। চাটুজ্জেমশায়ের ছেলে বটি, তবে তোমার বাড়ীর খিড়কীতে কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই।

'দেখুন, আমি এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম....' অমলের কথাটি শেষ না হতেই আবার একটি মেয়ে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে 'মেরে ফেললে, কে আছ বাঁচাও গো।'

পটলের চোখমুখ লাল। অমলের-ও। সহসা ভেতর থেকে একটি মেয়ে ছুটে আসে 'দাদা, তুমি শীগগির এস। বৌদি আর আমি সামলাতে পারছি না।'

'কি দেখছেন? মজা দেখছেন? যান যান, বাড়ী যান' ব'লে পটল ভেতরে ঢুকে যায় ও দুমক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়।

সেদিন আর একমিনিটও না দাঁড়িয়ে চলে আসে অমল। কিন্তু মনের কৌতূহল যেন যেতে চায় না। সরিৎটাকে পেলে জেনে নিতে পারত! সরিৎ পাড়ার এবং বেপাড়ার সকলকে চেনে। ছোটবেলা মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করার জন্যে দোরে দোরে ঘুরত। পরে হরিসভার গ্রামসেবকদের সঙ্গে ভিড়েছিল। শবদাহ করা অথবা দাঙ্গা হাঙ্গামা থামানো, যেকাজে দশজনের দরকার তাতে ও এগিয়েই থাকে।

সরিৎ খবরটি এনেদিতে পারত! কার বাড়ী, ওরা নিশ্চয় পুরনো বাসিন্দা নয়, কেন না পাঁচবছর আগেও ওখানে সিতিকণ্ঠরা থাকত। বাবা মারা যেতে উঠে গেল বাড়ী ছেড়ে।

সরিৎ গেছে ওর পিসীমার শ্বশুরবাড়ী। তাই অমলের হাতে অনেক সময়, অগাধ অবসর।

অবশ্য অবসর ঠিক নয়। কলেজের পরেও বাড়ী ফেরেনা অমল। ঘোরে শুধু ঘোরে। খুব সহজে, কম মূলধনে কি ব্যবসা করা যায়। কে কি করে অল্প সময়ে অবস্থা কিনেফেলেছে তার খোঁজ নেয়। লাজুক ও গম্ভীর প্রকৃতি, সুন্দর চেহারা। নিজে কেচে হোক, ধোপাকে তাগাদা দিয়ে হোক, বাইরে ফর্সা জামাকাপড় পরা চাই। লোকে

ওকে দেখে অবস্থাপন্ন ভাবে, অমল নিজেও সত্যি কথাটা বলতে লজ্জা পায়। তাছাড়া বন্ধুবান্ধব যখন বলে 'হাইক্যামিলির ছেলে ভাই, পূর্ব-পুরুষের নামে কলকাতায় ইস্কুল আছে, কসবায় বাড়ী। বাগানটাগান কে দেখে তাই ওখানে থাকে'—সে সব কথা শুনতে ভালই লাগে। হাজার হ'লেও অল্পবয়সের মন, বাড়া থেকে বেরুলেই দুঃখকষ্টের চিন্তাটা ফিকে হতে থাকে। শার্টের কলার একটু তুলে দিয়ে চোখ নিচু ক'রে ও শোনে এবং অল্প অল্প হাসে।

তখন ত' অমল জানেনা এমন নির্দোষ দুর্বলতাটুকুর জন্যে পরে ওকে কি কষ্টই পেতে হবে।

খুব কষ্ট পেতে হয়েছে। কলকাতায় নিজের বাড়ী, অমন চেহারা, তোমার আবার টাকার দরকার কি হে? ব'লে চূড়ান্ত সংকটে দারুণ প্রয়োজনের সময়ে ওর বিপন্ন অবস্থার গুরুত্বকে তুচ্ছ ক'রে দিয়ে হেসেছে মানুষ। অমলকে সবাই মিলে দগ্ধেছে, অবস্থার তাপে সেঁকে ঝলসে পুড়িয়ে ছাইছাই ক'রে দিয়েছে। আবার সেই পুরাণের পাখীর মত সেই অবস্থা থেকেই অমলকে আরো বাঁচবার মত, আরো চলবার মত শক্তি সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়াতে হয়েছে।

তবে প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা দাগ রেখে গেছে, দাগ রেখে যায় তুমি যত নিষ্পাপ সুকুমার হও এবং তফাতে থাক না কেন, সংসার এমনি ক'রে জ্বালা দিতে থাকে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমাকে নষ্ট ক'রে দেয়। তুমি অবিশ্বাস করতে শেখ, নিজের ঘা লুকোবার জন্যে ভাণ করতে শেখ। সংসার তার পাঠশালায় অমলকেও সে শিক্ষা নিতে বলছিল। কিন্তু ঠিকমত শট্‌কে পড়তে শিখলনা বলেই ত' জ্বালাযন্ত্রণা তার সঙ্গ ছাড়লনা, জীবনেও না।

কিন্তু কলেজে পড়বার সময়ে অমল অতকথার কিছু জানেনা। বাবা মা-কে কিছু বলেনা। সরিৎকেও না। তখনকার মত সান্যাল ব'লে একটি লোকের সঙ্গে ঘোরে। ও নাকি অমলকে একটা পথ বাৎলে দেবে। এই ঘোরাঘুরিতেও অমলের তখন দারুণ বিশ্বাস।

এখানে সেখানে চা-এর দোকান অথবা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে। করতে হবে, একটা কিছু করতেই হবে। বাবার মত অবিমৃষ্যকারিতা ক'রে নয়, অবস্থার মোড় ফেরাতেই হবে।

অবস্থা ফিরলে তার অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায় সে সম্পর্কে তখন অমলের ধারণা খুব পরিষ্কার। বাড়ীর আমূল সংস্কার, ঝকঝকে চেহারা, টেবিলে রেডিও এবং টাইমপীসঘড়ি, অমলের পরণে সাদা সার্ট প্যান্ট। মা ও বাবার সুখী সুখী চেহারা, মুখ সদাই প্রসন্ন।

তখনো সে খুব অনভিজ্ঞ। পরে, তার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার কল্পিত ঐ সুখের ছবির চেহারা-ও বারবার পালটেছে। কখনো সে বাড়ীর খোলনলচে বদলে ঝকঝকে নতুন ঢঙের হালফ্যাশানের বাড়ী হয়েছে। যে রকম বাড়ীর কথা মনে করলে গোলাপী, 'ক্রীম, হালকা হলুদ, হালকানীল এ-সব সুখী শৌখীন রঙ ছাড়া অন্য কোনরঙে ঘরের দেওয়াল পর্দা বা কাঁচের শার্সিকে রঙানো যায়নি। কখনো, উৎসাহ নিভে গিয়ে যখন চোখের সামনে সবই অন্ধকার তখন মনে হয়েছে বাড়ীর ফাটলগুলো যেন চোখের সামনে বড় হয়ে গেল, কবজা খুলে দরজা পড়ল ঝুলে আর ঠিক দুপুরবেলা যে সব বাজিকর আসে তাদের দেখানো 'আম আঁটির থেকে ফলভরা-গাছ-হওয়া' জাদুর মত একনিমেষে কে যেন বট অশ্বথের বীজ দিল ছড়িয়ে, দ্যাখ্ দ্যাখ করতে করতে দেওয়াল ও কার্নিশ দিয়ে বট অশ্বথের গাছ বেরিয়ে হ'য়ে গেল মহীরুহ। তারই নিচে যেন অমলের সব আশা আকাজ্ক্ষা পড়ল চাপা।

আরো অনেক পরে। সব স্বপ্ন মিটিয়ে জীবনের সব লেনদেন চুকিয়ে দিয়ে মনে হ'ত আর কিছুই চাইনা! এই জীর্ণ বাড়ীটি যেমন আছে তেমনি থাক। তেমনি শান্ত, সন্ধ্যার তুলসীমঞ্জরীর গন্ধে আমোদিত। উঠোনে মুখোমুখি দু'টি প্রৌঢ় নরনারী অমলের প্রতীক্ষায় বসে। অমল শুধু ঘরে ফিরতে চায়। বেলা গেল, সন্ধ্যা হল, এবার তুমি ঘরে চল।

বলাবাহুল্য একটি ছবিও ধরে রাখতে পারেনি অমল, কোন

আলেখ্যটিই অখণ্ড হয়ে থাকলনা তার চোখের সামনে। একটি আশাও সত্যি হলনা। ভাগ্য আর বলে কাকে।

সে অবশ্য পরের কথা। অনেক অনেক বছর পরের কথা।

সরিৎ যখন পিসীমার বাড়ী, অমল যখন যতক্ষণ বাইরে থাকে ততক্ষণ হাওয়ায় ইমারত গড়ে, সেই সময়ে একদিন সরিতের দাদা তড়িৎ তাকে ডেকে পাঠাল। বলল 'আমার অফিস থেকে ফিরতে দেরী হ'বে। বউদিকে নিয়ে একবারটি রাজপুরে যেতে হবে। গিনির বিয়ে।'

গিনি তড়িতের খুড়তুত শালী। কাছাকাছি বাড়ী হওয়াতে যাওয়া আসা আছে। তা ছাড়া অমল জানে তড়িৎ শ্যালকশ্যালিকা মহলে জনপ্রিয় জামাইবাবু। অমলদের কাছে যদিও খুব গম্ভীর থাকে তড়িৎ ওদের সঙ্গে বেশ মেলামেশা করে, সিনেমাটিনেমা দেখায়।

'আমি যাব, অফিস থেকে ফিরে রাত ক'রে যাব।' তড়িৎ বলল। সন্ধেবেলা বউদিকে ওখানে পৌঁছে দিয়েই চলে আসছিল অমল কিন্তু ওরা ছাড়ল না। 'দেখে ফেলেছি, দেখেফেলেছি' ব'লে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল। 'এই কি হচ্ছে, ছেড়ে দে গুপী, দেখছিস না যাচ্ছেতাই জামাকাপড় পরে আছি?' ব'লে গিনির দাদা গুপীকে যদি বা সামলান' গেল মেয়ের দিদি সামনে এসে দাঁড়ালেন। বছর দু'য়েক আগে বিয়ে হওয়াতে যেন কে না কে হ'য়ে গেছে, এমনি ভাবখানা। গলা তুলে চেঁচিয়ে বলল 'ওকি, চলে যাচ্ছ যে? সরিতের সঙ্গে কি কমবার এসেছ, না চেন না?'

'এই মেনি কি হচ্ছে' বলতে যাচ্ছিল অমল, কিন্তু মেনি ওরফে মৃণালিনী সে কথা শুনবে কেন? 'অ মা! দেখে যাও, অমল কেমন কুটুমবাড়ী কুটুমবাড়ী ব্যাভার করছে।'

চেঁচিয়ে মেচিয়ে সে এক কাণ্ড। অপ্রস্তুত অমল 'আচ্ছা বাবা যাচ্ছিনা যাচ্ছি না' ব'লে গুপীদের সঙ্গে সরে পড়তে চাইল। তের চোদ্দ বছর থেকে যে মেয়ে শুধু বিয়ের ভাবনা ভেবেছে এবং সময়ে অসময়ে খোঁপা

থাবড়ে থাবড়ে আয়নায় মুখ দেখেছে, সতেরোয় না পড়তে বিয়ে হ'লে সে যেমন সদাসর্বদা মনের সুখে ছলছলিয়ে বেড়ায় মেনিও তেমনি বেড়াচ্ছিল। সিল্কের শাড়ী, এক গা গয়না, খোঁপায় আস্ত একটা গোলাপ। অমলের সঙ্গে আগে কথাই কইতনা, লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যেত! এখন যেতে আসতে প্রগল্‌ভ ঠাট্টায় অমলকেই লজ্জায় ফেলতে লাগল।

একবার বলে গেল 'ভাল করে দেখে রাখ, কোনটিকে পছন্দ হয়।' আর একবার খাওয়া দাওয়ার আগেই একটি মেয়েকে হাত ধরে টেনে আনল। বলল 'কার জন্যে জল নিয়ে যাচ্ছ বল দিখি নীতা? অমলকে এক গেলাস জল দাও। দেখে দেখে ওর গলাবুক শুকিয়ে উঠেছে।'

'না না, কে বললে আমি ত জল চাই নি?'

অমল মহা অপ্রস্তুত। মেয়েটি কিন্তু কিছু মনে করেনি। এগিয়ে এসে শান্ত ভাবে জলের গেলাসটি হাতে দিল। অসন্তুষ্ট অমল কি করবে ভেবে না পেয়ে গেলাসটা নিল। জল খেয়ে অবশ্য খারাপ লাগল না তেষ্টাও পেয়েছিল। গেলাসটি মেয়েটির হাতে দিয়ে অমল অবাক হ'য়ে তাকাল।

মেয়েটিও ভারী অপ্রস্তুত হয়েছে। 'গেলাসটা দিন' ক্ষীণ কণ্ঠে কোন মতে ব'লে গেলাসটা নিয়ে যেন পালিয়ে গিয়ে বাঁচল।

সেই মেয়েটিই। সেদিন বিকেলে ঐ সিতিকণ্ঠদের বাড়ার খিড়কীর দোর খুলে ও-ই বেরিয়ে এসেছিল। পটল মিস্ত্রিকে সভয়ে বলেছিল 'দাদা, বৌদি আর আমি পারছি না, তুমি শীগগির এস।'

ঢ্যাঙা এবং ফর্সা, স্বাস্থ্যটা ভাল নয় তাই চোখ মুখ যেন নিষ্প্রভ, বাঁপাশের দাঁতটা উঁচু তাই ঠোঁটটা একটু বেশী ফোলা মনে হয়। সম্ভবতঃ ঐ বৈশিষ্টটুকু সেদিন অমল নিজের অজ্ঞান্‌তে লক্ষ্য ক'রে থাকবে। নইলে আজ এত সহজে চিনতে পারল কেমন করে?

বিয়ে বাড়ীতে গ্যাসের আলোয় সব মেয়েকেই সুন্দর দেখায়, বাক্সে তোলা পুরনো বেনারসী, খোঁপায় জড়ানো জুঁইফুলের মালাতে সবরকম

চেহারাই একটা আলগা শ্রী পায়। গুপীর ধারণা হয় একান্ত সেই কারণেই অমল নীতাকে দেখছে।

'কে রে ?' অমল অন্যমনস্ক।

'নীতা। পটলের বোন। বেশ দেখতে না রে ? কিন্তু ওর বড় বোনটা দেখতে ফাস্ট ক্লাস। বেরুতে দেয় না, নইলে দেখতিস।'

'পটল কে ?'

'সিঁতিকে চিনতিস ত' ? তারই মামাতো ভাই। ওরাই এখন ও বাড়ীতে থাকে।'

'পটলকে মিস্তির বলে কেন সবাই ?'

'মিস্তিরি ব'লে। লেখাপড়া শেখেনি, দিব্যি রেডিও সারায়। দু'পয়সা কামায় জানলি ?'

'তোদের সঙ্গে···?'

'মিনির বন্ধু নীতা। নীতার দিদি ছিল মেনির বন্ধু। তাছাড়া পটলের সঙ্গেও আমাদের চেনা জানা আছে।'

একবার অমলের বলতে ইচ্ছে হয়েছিল ওরা বাড়ীতে একটি মেয়েকে নির্যাতন করে। বোধ হয় ওর বড় বোনকেই। বলতে পারেনি।

ইতিমধ্যে সান্ন্যালের সঙ্গে অমলের বন্ধুত্বটি বেশ ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। সান্ন্যাল বলত সে বড়লোকের ছেলে (পরে জানা যায় কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়)। চা এর ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ আছে, অন্তত দোকানে দোকানে সরবরাহ করতে পারলে।

সম্ভবতঃ অমলকে সে যতটুকু দেখত তাতে এই ধারণা হয় দরকার হ'লে অমল টাকা পয়সা বের করতে পারবে।

সে ধারণাটা সত্যি কি না, যাচাই করবার জন্যেই একদিন অমলদের বাড়ীতে এসে হাজির। রবিবারের দুপুর। পুরনো বাড়ী হলেও সেকেলে ভারী পালঙ্ক সিন্দুক আলমারী, খাটের নিচে তোলা বাসন কোসন দেখে সে মনে মনে আঁচ করে জলুসপালিশ না থাকলে কি হয়. মক্কেল এরা শাঁসালো।

অমল তার মনের কথা বোঝেনি। ম্যাডানস্ট্রিটের খুপরিঘর সাজিয়ে গুছিয়ে অফিস খুলে যে বসে থাকে সেই সান্যাল তার কাছে এসেছে এতেই সে ধন্য। এর মধ্যে যেন ভবিষ্যতে কি হবে না হবে :তার আঁচও পাওয়া যাচ্ছে। নিশ্চয় একটা কিছু হবে। নইলে সান্যাল আসত না।

বড় কাঁসার রেকাবী ভর্তি জল খাবার খেয়ে অমলের বাবার সঙ্গে কথা বলে সান্যাল আরো নিশ্চিন্ত হয় এদের সিন্দুকের তলে নির্ঘাৎ বেশ কিছু টাকা সরান আছে। যে চাকরী করেছেন ভদ্রলোক তাতে অবস্থা ভাল হবারই কথা।

অমল তাকে তুলে দিয়ে আসে বাসে। তারপর মাঠ পেরিয়ে আসতে থাকে।

নেহাৎ নানা কথা ভাবছিল এবং অন্যমনস্ক ছিল তাই খেয়ালই হয়নি ঐ বাড়ীটার কাছাকাছি এসে পড়েছে। হঠাৎ সেই একই গলায় আর্তনাদ 'বাঁচাও বাঁচাও' এবং চোখ তুলে দেখে যতীন কুণ্ডুর ছেলে বলাই ও আর একটি লোক পটলের সঙ্গে রীতিমত ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে। তারা ভেতরে ঢুকবেই, পটল ঢুকতে দেবে না। অমলের ভাবতে লজ্জা হয় সে কেমন ক'রে ওদের মধ্যেই গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল।

বলাই চিরকালের গোঁয়ার। সে চেঁচাচ্ছে 'ঢুকতে দেবে না মানে ? কে জানে কি ব্যাপার বাধিয়ে রেখেছ ? রোজ নিত্যি নৃশংস মারধোর কর টের পাই না বুঝি ?'

'দেখুন, আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু আমাদের ইজ্জত আছে। পুলিশ ডাকব দরকার হ'লে'—পটলের গলায় ক্রোধের চেয়ে বেদনাই যেন বেশী। গলাটা বন্ধ হয়ে এল আবেগে এবং ভয়ে। পষ্ট বোঝা গেল এ লোকের পুলিশ ডাকবার সাহস হবে না।

ভেতরের আর্তনাদ যদি থামত তাহলেও হ'ত। মেয়েটি চেঁচাচ্ছে ত' চেঁচাচ্ছেই।

অমল বোঝাতে গেল 'দেখুন আপনার বাড়ীর ব্যাপারে অপরে কেন

মাথা গলাতে যাবে ? সত্যিই ত ! বলাই সরে আয়। তোদের একটা সভ্যতা জ্ঞান নেই !'

'সভ্যতা !'

রাগলে বলাই যেমন অসভ্য তেমনি গোঁয়ার। আস্তিন গুটিয়ে অমলকেই মারতে যায় আর কি। 'সভ্যতা ! আমরা মাছ ধরে ফিরছি এমন সময়ে এই মহাপ্রভু দেখি এক হাতে লাঠি নিয়ে গো-বেড়ান ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে নিয়ে যাচ্ছে একটা মেয়েকে। আমাদের দেখতে পেয়েই ভেতরে ঠেলে দিয়ে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল। সেই থেকে মেয়েটা চেঁচাচ্ছে তা দেখব না ? তোমার আর কি ! আমার বাড়ী এই কাছেই। এই মেয়েটার চেঁচামেচি প্রায় শুনি। একটা খুন জখম হ'লে পাশের প্রতিবেশী ব'লে পুলিশ আমাকে নিয়ে অবধি টানাটানি করবে না ?'

'তা ব'লে বাড়ীর ব্যাপারে···'

পটল আবার ঝেঁঝে উঠছিল। এমন সময়ে সেই মেয়েটি বেরিয়ে এল। শান্ত গলায় বলল 'দাদা, ওদের আসতে দে।'

'ঘরে যা নীতা ! মেরে ফেলে দেব !' পটলের কথা শুনে অবশ্য তখন যেন অমল আচ করতে পারছে এই লোকটি খানিক ফাঁকা হামবড়াই ছাড়া আর কিছু করে না। মেরে ফেলব কেটে ফেলব বলবার মধ্যে যেন যথেষ্ট ওজন নেই।

'না ওনাদের আসতে দাও। দেখে যাক নিজের চোখে।' অভিমানে নীতার গলা থমথম করছে।

এমন সময়ে 'ধরধর গেল গেল' হইচই, ভয়পেয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা কেঁদে উঠল, একটি অতিফরসা সুশ্রী মেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ! হাসি হাসি মুখ, কাপড়ের আচল মাটিতে লুটোচ্ছে। এদিকে একবার ওদিকে একবার চেয়ে একটু হাসল। তারপরে আবার সেই আর্তনাদ 'মেরে ফেলল' সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা। পটল হাত চেপে ধরতেই হাত কামড়ে দিল।

অপ্রস্তুত অমল বলাই এবং লোকটি স'রে পড়ে। পটল মেয়েটিকে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেল।

তখনকার মত সরে পড়ল বটে, কিন্তু অবার অমল নিজেই উদ্যোগ ক'রে পটলের কাছে যায়। রেডিও সারাবার নানারকম শব্দ এবং পটলের হাতে একটা উখো। কি যেন চাঁছছে। অমল দোকানের মালিকের সঙ্গে দুটো একটা কথা কইল, বিনাপ্রয়োজনেই টর্চের ব্যাটারী কিনল।

পটল অতঃপর বোর্ডে লাগানো সকেটে বাল্‌ব বসিয়ে টেস্ট্‌ করতে ব্যস্ত হ'ল। ভূরু ক্রমেই কুঁচকে যাচ্ছে কপালের শির ফুলে উঠছে, ফর্সা মুখ লাল।

মালিক টাকার নোট ভাঙাতে পাশের দোকানে উঠে যায় এবং সেখানে একটি লোকের সঙ্গে কথা কইতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে।

অমল খুব কুণ্ঠিত।

'দেখুন সেদিন বড় অন্যায় হয়ে গেছে।'

'অন্যায়! না না, অন্যায় হবে কেন। ফর্‌সা জামাকাপড় পরে ভদ্দরলোক হ'লে তার অন্যায় হয় না। গেরস্তর বাড়ীতে ফস্‌ করে ঢুকে পড়া যায়।'

বোঝা যায় কথাগুলো বলবার জন্যে ও সুযোগ খুঁজছিল। আরো বোঝা যায় লোকটা খুব বদ্‌মাস নয়। মনের ভাব চেপে রেখে এখন অমলকে ও ইচ্ছে হ'লে বাঁকাবাঁকা কথায় যথেষ্ট অপমান করতে পারত। তা করেনি। ওর কথাগুলো চোয়াড়ে বটে তবে এ-ও বোঝা যায় মনে দুঃখ এবং রাগ হয়েছে ওর, ও ব্যথা পেয়েছে।

'কি দেখতে চায় লোক বুঝি না। গেরস্ত মানুষ, রাত্তির দিন খেটে ডান বাঁ দু'দিক এক করতে পারি না একার ঘাড়ে পাঁচটা লোক খাচ্ছে। অতবড় বয়স্থা বোন পাগল বলে এক এক সময় মাথায় বাড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করে। দেখবার আছে কি? না কি দুঃখ কষ্ট যন্তরনা দেখেনি কেউ? নিজেদের ঘরেদোরে যেন কতই···জানা আছে সব

মক্কেলকেই, যেন নিজেরা সুখের শয্যায় এপাশ ওপাশ করে গায়ে গতরে ব্যথা হয়ে গেছে তাই মুখবদলাতে পরের দোরে উঁকি দেওয়া চাই।'

পটলের চোখ বাল্‌বের দিকে। সহসা অমল যেন বুঝতে পারে লোকটার বয়স এমন বেশী না, ছেলে মানুষ। সম্প্রতি দুঃখ এবং অভিমানে চোখের কোণ রাঙা হ'য়ে উঠেছে।

'আমি বুঝতে পারিনি।'

'আপনি মশায় মিছে ঝামেলা করছেন। বুঝতে পারেননি ত' পারেননি। আপনার বন্ধু ত' আমাদের তুলে দেবে ব'লে শাসাতে গেছল সেদিন। থানায় বলবে, তুলে দেবে হ্যান ত্যান কত কি! শেষমেশ দেখছি মাপ চাওয়ার মচ্ছব পড়ে গেল। তিনি এসে মাপ চাইছেন। আপনি মশায় মশায় করছেন।'

অমল চুপ।

'বিয়ের যুগ্যি বয়স্থা বোন পাগল হয়ে গেলে কেমন লাগে কে বুঝবে? আমিও অপদার্থ, বামুনের ঘরের ষাঁড়, নইলে শালা বোন রোজগার করতে চায়? পাড়ার লোক এসে ঘরে ঘরে উঁকি দেয়? কপাল, সবই কপাল!'

কথা বলতে বলতে পটল যেন বোঝে ক্রোধের শেষ উত্তাপটুকুও কখন ঠাণ্ডা হয়ে মিইয়ে গেছে. এখন থমথম গমগম করছে দুঃখ, খেদ, আক্ষেপ।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ। পটল ধরা গলায় বলল 'যান' কাজ কত্তে দিন।'

অমল উঠে পড়ল, খুচরো পয়সা একহাতে এবং আর এক হাতে ব্যাটারী নিয়ে অন্যমনস্কের মত কি ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরল।

এরপর অবশ্য ব্যাপারটা আরো ঘোরাল হয়।

কিছু কিছু মানুষের স্বভাব হচ্ছে ঘোঁট পাকানো, অসহায় লোককে বাগে পেলে নির্যাতন করা।

বলাই কুণ্ডুর বাবা লোক ভাল নন, তবু শান্তিপ্রিয়। বিশেষতঃ ছেঁড়া ঝামেলাকে শতহস্ত দূরে রেখে চলেন।

বলাইটা ছোটবেলা লেখাপড়া করল না, বড় হ'তে না হ'তে দেখা গেল ওর মগজ খুব সাফ। বাবার কাছ থেকে টাকাপয়সা হাতিয়ে ছোট-খাট একটা কন্ট্রাক্টরী বাগাল ঘুষটুষ দিয়ে। তখন ঠিক কলোনী গুলো বসছে, সরকারের নানারকম স্কীম। রাস্তাঘাটের কন্ট্রাক্টরী ক'রে যথেষ্ট পয়সা কামাতে থাকল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপত্তির লোভ। পাড়ায় প্রতিপত্তিওয়ালা লোক হ'য়ে বসতেই হবে। যে ক'রে হোক।

হঠাৎ দেখা গেল সব ব্যাপারেই বলাইচন্দ্র এগিয়ে আছে। অমলদের চোখের সামনেই সে মিউনিসিপ্যালিটিতে ঢুকল। এ অঞ্চলে যা কেউ কোনদিন করেনি, রাস্তার মোড়ে লণ্ড্রী এবং চা-এর দোকান খুলে ফেলল।

একদিন অমলের বাবা ভারী বিব্রত গলায় কার সঙ্গে কথা কইছেন। কৌতূহলী অমল এগিয়ে যায়। বলাই! ভারী শরীর, সিল্কের সার্ট ধুতি, ছাঁটাচুল, এ বয়সেই কানের কাছে চুল সাদা হচ্ছে, কান, হাত ও পায়ের গাঁট থেকে গোছা গোছা চুল বেরিয়েছে।

কি ব্যাপার? না, ব্যাপার নাকি গুরুতর। 'একটা সই দিতে হবে ভাই সেজন্যে এসেছি। মেসোমশায়ের সই।'

পটলের বোন হাসিকে নিয়ে বুঝি পটল আর নীতা ধপধপার মন্দিরে গিয়েছিল। পুজো দিয়ে মাদুলী পরিয়ে তাগা বেঁধে নিয়ে আসে। বিকেল বেলা ওরা ফিরছিল, তখন কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে বল খেলছিল। কাদামাখা বল হাসির কাপড়ে লাগে। হাসি বলে 'কেন বল ছুঁড়লি?' তারপর যখন দেখে ওর কাপড়ে কাদা লেগে গেছে তখন রেগেমেগে একশা। একটি ছেলেকে চড় চাপড় মেরে কাঁদতে থাকে 'আমার কাপড় নষ্ট করে দিল।' ছেলেটার গালে না কি দাগ বসে গেছে।

বলাইএর কথা হল, এরকম উৎপাত প্রায়ই হয়। পটল বাড়ী থাকে

না, মেয়েরা সামলাতে পারে না। সেদিন একটি ইস্কুলের মেয়ের আঁচল চেপে ধরেছিল। বলেছিল 'আমার কাপড় 'ও চুরি করেছে।'

এখন না হয় বিশেষ কিছু করছে না। আস্তে আস্তে এরচেয়েও বড় কিছু ক'রে বসবে কি না তার ঠিক কি। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল ঐ চ্যাঁচামেচি হট্টগোল। দশজনে সই দিয়ে জোর ক'রে ওদের ওঠান যায়।

অমলের বাবা শেষমেশ বুঝিয়ে বললেন পাড়ায় বড়রা আছেন তাঁরা বুঝে দেখবেন। এত সামান্য কারণে কাউকে পাড়াছাড়া করা যায় কি না তাও ভেবে দেখবার কথা। অনেক বোঝাবার পর বলাই ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে বিদায় নেয়।

সরিৎ ফিরে এসেছে। সব শুনেটুনে দু'জনের তরুণ রক্ত রীতিমত তপ্ত। এ কি অন্যায়, এতবড় অন্যায় কি সহ্য করা যায়? অমলের রাগ বেশী। কেন যেন তার মনে ওদের পরে অসম্ভব একটা মমতা জন্মেছে। বোধ হয় পাপবোধ থেকে। সেদিন পটলদের বাড়ীতে গিয়ে প'ড়ে ও অন্যায় ক'রেছিল সেটা ভোলা যাচ্ছে না।

একদিন দেখেছে নীতা তার দিদিকে নিয়ে মাঠে বেড়াচ্ছে। নীতা কি যেন বলছে, বড় দিদি হাসি মুখে শুনছে। হাসি নামটি সার্থক। মুখটি বড় ঢলঢলে, লাবণ্য ভরা। ঐ মেয়েটি পাগল! ওর চেহারা, লাবণ্য, স্বাস্থ্য, কোন কিছুই কাজে লাগবে না। বিধাতার পরিহাস। মাঝে মাঝে নীতাকে দুটি ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে ইস্কুলে পৌছে দিতে দেখেছে। নিশ্চয় ওর দাদার ছেলেমেয়ে।

যতক্ষণ বাইরের মানুষের মত দেখা যায় ততক্ষণ ঝামেলা নেই। কোন কিছুই মনে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না, দাগ কাটে না। এই ত সেদিন এই পুকুরে একটি ছেলে ডুবে মারা গেল। যখন জলে পড়ে তখন অমল বাড়ী ছিল না। কখন তোলা হয়, নিয়ে যাওয়া হয় টালীগঞ্জে গোলাম মহম্মদ হাসপাতালে এবং মৃতদেহ এনে পৌছে দেওয়া হয় খালপারের বাড়ীতে কিছুই জানেনা অমল। বাড়ী ফিরল, শুনল, ফুরিয়ে গেল।

মা'র কাছে একবার শুনল বাবা মার সে কি কান্না, ছেলেটির মুখ নাকি ঢলঢল করছিল। 'যেন ঘুমিয়ে আছে, কে বলবে মরেছে' মা বললেন।

তখনো অমলের ছেলেটির কথা বিশেষ ক'রে মনে হয় নি। যেহেতু ছেলেটিকে চেনে না, বাপ মাকে চেনেনা, ওদের এতবড় ক্ষতি তাকে একেবারেই ছুঁলনা। বরঞ্চ, অমল ভাবল মার কথাগুলোর কোন মানেই নেই। ঘুমিয়ে আছে, যেন মরে নি,এ সব কথা মৃতদের সম্পর্কে প্রায়ই বলা হয়। যদিও কথাটি ভুল। অমল যখন বেশ ছোট তখন ওর একটি শিশু ভাই মারা যায়। মাস ছয়েক বয়স হবে. খুব একটা দাবীদাওয়া নিয়ে আসেনি, শান্তস্বভাব, খুব খিদে না পেলে কাঁদতনা সংসারের বড় দুর্দিনে এসেছিল, ইনফ্যাণ্টাইল লিভারে ভুগে ভুগে চলে গেল। অমলের মনে আছে ভাইটির মাথা শুঁকতে ওর ভাল লাগত। কেমন মিষ্টি গন্ধ। একদিন মনে হয়েছিল ওর মাথা কি গরম।

অবশেষে সেই ভাইটি সকাল বেলা মারা যেল। কাকীমা, জ্যাঠাইমা পিসীরা সবাই ভিড় ক'রে এল। 'দাও, গঙ্গাজল দাও' মা বেশ জোরে জোরে বললেন। অত্যন্ত দুঃখে, ভয়ে. রাগে, মনোকষ্টে, যন্ত্রণায় অমলের মা অন্যের সামনে কাঁদাকাটা করতে পারেন না, খুব ধীর হ'য়ে স্পষ্ট স্পষ্ট ক'রে কথা উচ্চারণ করেন এ অমল চিরদিন দেখছে। এ-ও জানে সবাই ব'লে থাকে 'কি শক্ত, কি মনের জোর!' অথচ সেটাও বোধ হয় সব সময়ে সত্যি নয়।

ভাইটির মুখে গঙ্গাজল দিতে গিয়ে বাবার হাতটাত কেঁপে ন'ড়ে অস্থির।

শেষে, বেলায় নিয়ে যাওয়ার আগে অমল শোনে সবাই বলছে 'দেখ. সমু যেন ঘুমিয়ে আছে।'

অমল তখন খুব ছোট। তবু মনে হয়েছিল ওরা ঠিক জানেনা, ঠিক বলছে না। ওর কাকীমাকে জিগ্যেস করল, বড়রা সত্যি কথা বলবে কি না তাই দেখার জন্যেই জিগ্যেস করল 'ভাইয়ের কি হয়েছে?' 'কিছু না, ঘুমোচ্ছে। ভাই ঘুমোচ্ছে দেখছিস না?' কাকীমা ধরাগলায়

বলেন। অমল ভেবেছিল বড়রা এমন ভুল কেন করে। ও ত' ঘুমের চেহারা নয়। শান্ত, মুখের রেখাগুলো নিশ্চল, স্থির, চোখ বোঁজা। কিন্তু ঘুম নয়। কি যেন থাকেনা চেহারায়, কি যেন চলে যায় অমনি দেহ অন্ধকার হ'য়ে যায়। পরিত্যক্ত এবং বাতিনেভান ঘরের মত, যে ঘরে আর কেউ বাস করবে না।

না। ছেলেটির মৃত্যুসংবাদের চেয়ে মার একটি কথায় সে অভিভূত হয় বেশী। তার পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। সে বহুকাল আগে মৃত ভাইটির কথা ভাবে। কিন্তু নীতাদের সম্পর্কে সে যেন না ভেবে পারে না। কেন, তার ভাবনা ওদের আশ্রয় করে ঘোরে কেন!

নীতার কারণে, এ কথা বলতে পারলে খুশী হ'ত অমল, কিন্তু ঠিক তা নয়। আসলে সেদিন দোকানে বসে বসে পটলকে দেখে ও যেন অনুভব করেছিল অল্পবয়সে সংসারের দায়িত্ব নিয়ে এমনটি একলা চলার জ্বালা কি তীব্র হতে পারে! ছেলেটি যে ভদ্র পরিবারের তাতেও কোন সন্দেহ ছিল না। ওর কষ্ট হচ্ছিল। নীতার মুখে-ও দাদার মত একই অসহায় আকুতি দেখেছিল এবং পটল জানেনা ঘাড় নিচু করে বাল্ব লাগাবার সময় তাকে কিরকম ভরসাহীন নাবালক দেখায়। একটি তেইশচব্বিশ বছরের ছেলের নোয়ানো ঘাড়ের ভঙ্গী দেখে আরেকজনের সহানুভূতির উদ্রেক হতে পারে এবং তার থেকে নানাবিধ জটিলতার প্রথম সূত্রপাত সৃষ্টি হয় একথা কেউ বললেও বিশ্বাস করত না অমল।

অথচ তাই-ই হল।

পটলের তখন রীতিমত বিপন্ন অবস্থা। সে অবশ্য বলে তার পিসতুত ভাই সিতিকণ্ঠ থাকতে ওদের সঙ্গে পাঁচিলের সীমানা নিয়ে কি দ্বন্দ্ব হয়েছিল তা পটল জানেনা। তবে ইদানীং বলাই ওকে ক'বার শাসিয়েছে। বলেছে পাঁচিল মেরামত করবার সময়ে পটল সীমানা ছাড়িয়ে একটু এগিয়েছে। এই নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই অশান্তি একটা চলছে। তার ওপর সেদিনকার ঐ কাণ্ড। সে

মিনতি করে বলে 'দেখুন, হাসি কোনদিনই কারোসঙ্গে অশান্তি করে না।'

অমল অবশ্য তা মনে করে না। সেদিন এবং আগেরদিন যে রকম চেঁচাতে শুনেছে।

পটল তা বোঝে। তার মুখ অল্প অল্প লাল হয় ও জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে। বলে 'মাঝেমাঝে বেড়ে যায়। সেদিন কাপড়ে কাদা লেগেছিল বলে ছেলেটাকে মেরেছিল, নইলে মারতনা। ঐ ত' একমাত্তর শখ, ঐ জামাকাপড় নিয়েই আছে।'

পরে অমলরা জেনেছিল সত্যিই বড় হতভাগা মেয়েটা। ছোটবেলা অত বোঝা যায়নি। মাঝেমাঝে গুম হয়ে বসে থাকত। আবার ছুটে ছুটে এসে মাকে বোনকে নানারকম কথা বলত। একটা বুড়ী ওর হাতে গোলাপফুল দিয়েছে, একজন সন্ন্যাসী ওকে নিয়ে গাছের নিচে গিয়ে আশ্চর্য আশ্চর্য ফল খেতে দিল, একটা সিংহ ওর হাত থেকে দুধরুটি খায়, নীতার সঙ্গে ভাব করতে একটা মেয়ে উড়ে উড়ে আসে।

যখন মেজাজ ভাল থাকত সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ে বলত 'কি ভাবুনে মেয়ে, কি গল্পই বানাতে পারে।'

মেজাজ ভাল না থাকলে বলত 'ঐ এলেন মিথ্যে কথার ধুচুনি খুলতে। নে বাবা, তোর গুচ্ছের মিথ্যেকথা শোনাছাড়া সংসারে আরো কাজ আছে আমাদের।'

মিথ্যেবাদী বললে হাসি রেগে উঠত, আঁচড়ে কামড়ে শেষ করত। রোগা রোগা হাত পা কিন্তু শরীরে এমন শক্তি ভর করত যে বলবার নয়। ছেলেপিলে মজা পেয়ে আরো ক্ষেপাত, রাগের চোটে কথাবন্ধ হয়ে মুখে থুথু বেরিয়ে হাসির যেন ভিরমি লেগে যেত। শেষ অবধি নীতা ওর জন্যে বাইরে খেলতে যাওয়া ছেড়ে দেয়। দিদিকে সবাই ক্ষ্যাপাত, ওর ভাল লাগত না।

বড় হ'তে না হ'তে বোঝাগেল এটা অসুস্থতা।

টের পাবার আগে অবধি হাসিকে অনেক লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে।

সংসারে যা হয়। যাকে দশজন সুস্থতা, স্বাভাবিকতা ব'লে জানে তার বাইরে অন্যরকম কিছু দেখলেই বিশজোড়া ভুরু কপালে উঠবে। যে অবস্থায় গিয়ে পৌঁছলে ক্ষমা, সহিষ্ণুতা এবং করুণার প্রয়োজন সে অবস্থায় যারাই পৌঁছয় তারা প্রায়শ কোমল ব্যবহারটুকুও পায় না। যাদের মনের অসুখ তাদের সম্পর্কে বোধহয় আমরা সব চেয়ে নির্দয়।

বছর তেরো চোদ্দ বয়স, যখন শরীরে মনে পরিবর্ত্তন আসে তখন যে হাসিও বদলে যাচ্ছে, ওর আশাআকাঙ্খা নতুনরূপ নিচ্ছে তা কেউ বোঝেনি। পাশের বাড়ীর ছেলের বিয়ের সময়ে প্রথম বোঝাগেল। ওরা তখন নারকেলডাঙায় থাকে। ছেলের মা-কে ধাক্কা দিয়ে কনের বাক্স থেকে কাপড় নিয়ে সে চলে আসে। বলে 'আমার বিয়ে, আমার কাপড় দিয়ে দাও।'

কাপড় কেড়ে নিতে চাইলে আঁচড়ে কামড়ে একশা ক'রে দিল। ছেলেটির মা ভালকথা বলেছিলেন 'এ ত' অসুখ বলে মনে হয়। তোমরা ডাক্তার কবিরাজ কর বাপু।

ডাক্তার আর কবিরাজ! ক্রমেক্রমে হাসির মধ্যে অসুখের অন্যসব লক্ষণ প্রকাশপেতে থাকে। ঐ বিয়ে বিয়ে বাই, আর সেজেগুজে থাকতে ভালবাসে। কেউ যদি না ঘাঁটায় তবে আয়নার সামনে ব'সে পাউডার কাজল, কুমকুম নিয়ে বেশ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে পারে। শাড়ীর ভাঁজটি নষ্ট হ'লে বা খোঁপায় হাত দিলে আর রক্ষে নেই।

ডাক্তার বদ্যিও করান 'হয়েছে, সাধ্যমত। বারোমাস ত' আর অসুস্থ থাকেনা, অন্যসময়ে ভালই থাকে, অর্থাৎ সুস্থমানুষের মত অল্পসল্প ঘরের কাজ করে। আবার যখন শরীটা খারাপ হয় তখন আর জ্ঞানগম্যি থাকে না। বিশেষ করে কেউ ওকে ক্ষ্যাপাচ্ছে বা ঠাট্টা করছে, কেউ ওর শাড়ীতে একটি জলের ফোঁটা ফেলেছে বা চুলের ফিতে সরিয়ে নিয়েছে এতেই কুরুক্ষেত্র বেধে যায়।

পটল ওকে ভালবাসে। মাদুলীতাবিজ এনেদিয়েছে, ডাক্তার বদ্যিও অশমি তা নয়। তা ছাড়া ক্রীম, পাউডার, রিবণ, যখন যা পারে কিনে

আনে ওর জন্যে। নীতা, পটলের বউ সবাই ওর সঙ্গে শিশুর মত ব্যবহার করে, ভুলিয়ে ভুলিয়ে রাখে।'

পটল কোঁচার খুঁটে চোখমুছে বলে 'দেখুন আমি কারো সাতে নেই পাঁচে নেই, আমার সঙ্গে এমন খোঁচাখুঁচি ক'রছেন কেন? এমন করলে যে আরেকটা বোনেরও বিয়ে দিতে পারবনা।'

তারপর আপনমনে বলে আমার হয়নি, তবে বোনগুলো ত' পড়া-লেখায় মন্দ ছিল না। ভাগ্যদোষে ওর সবই খারাপ হয়ে গেল। ছোটটা ম্যাট্রিকপাশ, বিয়ের চেষ্টা করি মাঝেমাঝে খোঁজখবরও পাই। এর খবরটা রটেগেলে আর বিয়ে দিতে পারবনা ওকে।'

সব শুনেটুনে অমলের মাথার রক্ত অনেকক্ষণ অবধি চিনচিন করে জ্বলতে জ্বলতে ওঠে নামে। না, পটলকে আর খারাপ লাগছে না। খন ওর জন্যে দুঃখহচ্ছে। নীতার বিয়ে হবেনা, ওদের বের করে দেবে বাড়ীর বাইরে, হাসি কোথায় যাবে?

সে বলে 'কি অন্যায় বল দেখি সরিৎ? এমন রাত নেই সন্তোষ পাল ওখানে মদখেয়ে হল্লা করেনি, তা ছাড়া আজ নয় অবস্থা পড়ে গেছে, বড়ছেলেটা মারাযাবার পর রমরমা নেই, ঐ জলধি ঘোষের বাড়ী কি হয়েছে আর কি হয়নি! হই হল্লা, তাসের আড্ডা মারামারি। তখন সবাই চুপটি করে সহ্য করেছ। কেন? না ওদের অগাধ পয়সাছিল, গুণ্ডাগুণ্ডা ছেলেপুলে, তাই বলবার সাহস ছিল না। এদের সাতকুলে কেউ নেই, এদের ওপর এত জুলুম?'

ওর কথাশুনে সরিৎ হেসে ফেলে। বলে 'এই ত' নিয়ম রে। এই হয়। ও অবস্থার প্যাঁচে পড়েছে, নিরীহ গরীব লোক, ওর বেলাইত' লাই-এর জ্ঞানকাণ্ড মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। সিটিজেন্‌স রাইট! অন্যদের উপর সিটিজেনের রাইট খাটাতে যাকনা, দেখিয়ে দেবে না?'

যাহোক, অমল সরিৎ আরো ক'জনের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটা চাপা দেওয়া গেল। পটল ত' রীতিমত কৃতজ্ঞ। কিছুতেই ছাড়বেনা, অমলকে ওদের বাড়ীতে নিয়ে যাবেই। ও বাড়ীতে যেতে নীতা অবশ্য

এসে সামনে দাঁড়ায়নি। তবে দরজার ও পাশ থেকে সে-ও কি অমলকে দেখেনি? কি সব সেলাইয়ের সাজসরঞ্জাম তক্তাপোশের ওপর ডাঁই করা ছিল। সেলায়ের কল, রঙীন কাপড়ের টুকরো, সুতো, লেস, আরো কি কি।

পটল বলে 'ছোটটার। সেলায়ের ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিচ্ছে কি না! আমি-ও বলেছি যা পারিস করে নে, তোদের দাদা অশিক্ষিত হতে পারে অমানুষ নয়, যতদূর সাধ্য তোর জন্যে করবে।

একটু থেমে, অস্বস্তি ঢাকবার জন্যে অমল মুখনিচু করে আছে এবং সরিৎ নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে চৌকির ওপরে রঙীন কাপড়ের স্তূপ দেখছে বুঝতে পেরে, 'হ্যাঁ, ওরই করা। ছোটটার বেশ নানারকম গুণ আছে তবে বিয়ে দিতে পারব ব'লে মনে হচ্ছে না।'

পরে অমল দেখেছে, সংসারে বিলিব্যবস্থা করতে পারবনা বোনের বিয়ে দিতে পারব না এ-সব কথা কইবার সময়ে পটল রীতিমত অসহায় হ'য়ে পড়ে। এমন দীন হয়ে যায় ওর কণ্ঠস্বর যেন ও ভরসা চাইছে।

অমল ভেবেছে আচ্ছা, সংসারের জ্বালাপোড়া এমন ক'রে সেঁকছে যাকে সে এখনো এত কাঁচা আছে কেন? সংসারের হালচাল শেখেনি কেন? অন্যের সামনে নিজেকে এমন অবারিত করে কেন?

কিছুক্ষণ ব'সে ওরা উঠে আসে। সেদিনের পর আর ক্বচিৎ গেছে অমল ওদের বাড়ী, নীতাকেও দেখেনি। তবু মনে ভেবেছে আমার অবস্থাও কিছু একরকম থাকবে না। সেদিন ওকে বিয়ে করলেই বা দোষ কি।

একবার ভেবেছে সরিৎকে বলবে, আবার লজ্জা পেয়েছে। না, বলে কাজ নেই। মনের কথা মনে মনে থাকাই ভাল। তবে খুব ব্যস্ততার মধ্যে একদিন শুনেছে সরিৎ বুঝি মাঝে মাঝেই ও বাড়ী যায়। 'যাস না কি?' জিগ্যেস করতে সরিৎ বললে 'হ্যাঁ রে, অমনমেয়েটা একেবারে মানুষের বাইরে হ'য়েই জীবন কাটাবে? তা ছাড়া ওটা যখন অসুস্থতা, চিকিৎসায় নিশ্চয় কমে। ওদের তাই খোঁজঠিকানা দিচ্ছিলাম।

ডাক্তার বস্তির খবর এনে ত' দিই, পারলে চিকিৎসা করাবে নইলে প'ড়ে থাকবে বাড়ীর এককোণে, যেমন আছে।'

'কেন মাদুলীতে কাজ হ'চ্ছে না ?'

'ওরা বিশ্বাস টিশ্বাস করে বটে, তবে এই পেনিসিলিন আর অ্যান্টি-বায়োটিকের যুগে কি কেউ মাদুলী বেঁধে পার পায় ?'

'আরে, এ রোগেত' আর অ্যান্টিবায়োটিক লাগবেনা।'

'না ! তবে অন্য চিকিৎসা আছে, ওষুধ আছে।'

'ভাল।'

অমলের মনে হ'ল তার মনথেকে যেন ধীরে ধীরে একটা গুরুভার নেমে যাচ্ছে। যেন তার বুকের ওপর গুটিসুটি মেরে একটা জন্তু বসে ছিল এখন ধীরে নেমে যাচ্ছে, বুক হালকা, বড়বড় নিশ্বাস নেওয়া যায়। আরে, হাসির বিয়ে হবে না, সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়ে চিরদিন অসম্ভব সব আশাআকাঙ্খা মনেমনে লালন ক'রে কষ্ট পাবে সেজন্যে অমলের মনেও বেদনা ছিল ? কই, টের পায়নি ত ? সরিৎ যেন তার কাজই করছে !

অমলের ইচ্ছে হ'ল সরিৎ-কে বলে 'জানিস ঐ নীতা মেয়েটা মন্দ নয়, আমার ইচ্ছে আছে ওকে বিয়ে করব।'

বলতে পারলনা, লজ্জা পেল। সরিতের কাছে।

॥ পাঁচ ॥

ঠিক এই সময়ে অমলের বাবা অদূরদর্শীর মত একটা কাজ করলেন। কেন করলেন কে জানে! যখন এদিকে জনবসতি হচ্ছে, ফাঁকা ঝোপ-জঙ্গল, ধানক্ষেত, ডোবা জলা সব বসত জমিতে রূপান্তরিত হ'চ্ছে সেই সময়ে কিছু কিছু দূরদর্শী লোক এদিকে সরে আসতে চাইল।

নতুন নতুন ফ্যাক্টরী বসাবার জন্য বিঘা বিঘা জমি চাই। তা ছাড়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝল আজ জমি কিনে রাখলে ভবিষ্যতে দাম দেবে। শুধ্ তিনিই বুঝলেন না।

অথচ সারাজীবন ঐ নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি ক'রেছেন। কর্পোরেশনে চাকরী ক'রেছেন একসময়ে, তাঁর এসব ভাল করেই জানবার কথা। তবু বুঝলেন না। যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না এখন যে দাম পাওয়া যাচ্ছে তার চেয়ে আরো বাড়বে। যতীন কুণ্ডু বললে 'দাদা আপনার জমির সঙ্গে কলোনীও-এলাকার কোন সংশ্রব নেই। ধ'রে রাখুন দাম পাবেন।'

বাড়ী এসে সেকথা ব'লে ভদ্রলোক খুব হাসলেন 'আরে, যতীন বলে কি? এখন যা দিচ্ছে তার চেয়েও বাড়বে দাম? ওদিকে ঢাকুরে' এদিকে নাকতলা সব আনডেভেলপ্‌ড প'ড়ে আছে না? আজ তিনশো ক'রে কাঠা দিতে চাচ্ছে, পরে দেবে!'

'শনি, কাঁধে শনি চেপেছিল' মা পরে বলতেন। কাজ করতে করতে, মহাভারতের পাতায় চোখ রেখে অথবা ভাত খাওয়ার পর পানের বাটা নিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে ব'সে 'জানিস নিতু. বিশ্বাস ত করিস না। আমি কিন্তু আগেই জানতাম!'

'কি জানতে?'

'তোর বাবা যে এমন ক'রে চালে ভুল করবেন। হবে না, সামনে

ঐ শকুনগুলো চ্যাঁচাচ্ছে ত' চ্যাঁচাচ্ছেই ! মাগো, ওদের নিশ্বাস যে বাতাসে বাতাসে আমার ঘরেদোরে বইছে দিবারাত্তির। তা অনিষ্ট হবে না ?'

যে কয়বছর বেঁচেছিলেন, বাবার আর লাঞ্ছনার শেষ ছিলনা। মা যখন বলতেন 'ওর কথা মনে ক'রেও জমিটুকু রাখলেন না।' অপ্রস্তুত হেসে বাবা বলতেন 'আহা, সাতটা নয় পাঁচটা নয় একটা ছেলে, ওর জন্যে তুমি ভাব কেন ?' মা অমনি বলতেন 'ভাগ্যে সাতটা পাঁচটা নেই, একটা ছেলে তাকেই কোনদিন একটু আরামদিতে পারলাম না। বাছা আমার অল্প বয়স থেকে সংসারের চিন্তা ক'রে ক'রে হাড়-মাস কালি ক'রে ফেলল।'

এ কথা বলতেন বাবাকে। কিন্তু অমল যদি নিজে বলতে যেত 'সংসারে নিত্যি অভাব দেখে দেখেই ত' লেখাপড়া ছাড়লাম' তখনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন 'মিছে কথা কয়োনা নিতু। সংসারের অবস্থা যাই হোক, তোমাকে কেউ পড়াশোনা ছেড়ে মানুষের পেছনে ছুটতে বলেনি। অধিক লোভ করতে গেলে ওই হয়।'

না, কোনদিক রেখে কথা কইলে মা'র মন পাওয়া যাবে তা কোন দিনই বোঝা গেল না। আসলে খুব সহজ সরল পষ্ট কথা ভালবাসতেন। অপ্রিয় এবং নির্মম হ'লেও সত্যিকথা কইতে ভয় পেতেন না। তারফলে মাঝে মাঝে তাকে দুঃসহ কষ্ট পেতে হয়েছে।

তবু তিনি স্বভাব পাল্টাননি এবং যদিও মার সঙ্গে মনান্তর মতান্তর দুইই ঘন ঘন লেগে থাকত-তবু অমলের সন্দেহ হয় মাকে সে ঐ জন্যেই যেন একটু বেশী শ্রদ্ধা করত। ঐ ঋজু, সরল এবং কঠিন স্বভাবের জন্য। সংসারে থাকা মানেই আপস করা। নিজের মত, রুচি, পছন্দ-অপছন্দ সব কিছুর ধার ক্ষইয়ে নিয়ে সংসার যেমনটি চায় সেই মাপের ছাঁচে ঢেলে সাজা। মার মধ্যে সে সব ছিল না। স্বামী এবং ছেলে ত বটেই, নিজেকেও তিনি রেহাই দিতেন না।

পথেঘাটে, মিছিলের সামনে এবং কাগজের পাতায় 'আপসহীন

সংগ্রাম' কথাটি যখনই পড়েছে অমল তখনই মার কথা মনে হ'য়েছে। আপস এবং আখের না বুঝে সংগ্রাম করতে ঐ একটি মানুষকেই দেখেছে সে।

কসবার বাড়ী ছেড়ে আসবার সময়ে বাসনপত্তর খাটপালঙ্ক সবই আভাকাকীমা একে একে নিয়ে নেন। লম্বা নাক, টিপ থেকে সিঁদুর ঝরে নাকের ডগা সদাই লাল। চশমার পেছনে পক্ষহীন ন্যাড়া চোখ এবং চাপা পাতলা ঠোঁট, দুটির অভিব্যক্তিই নিষ্ঠুর। দেখলেই মনে হয় এ মানুষ সুবিধের নয়। তাঁর লোহার সিন্দুক ছিল ব'লে অমলের মা বুঝি সামান্য ও অবশিষ্ট গয়না তাঁর কাছে রাখেন। ফিরিয়ে দেবার সময়ে মহিলা সবগুলো দেননি। আমার টায়রা কই ? বলতে সরু ও ক্যানকেনে গলা তুলে ঝগড়া করেছিলেন মার সংগে।

এ-সব অমল পরে শুনেছে। তাদের এই বাড়ীতে একদিন কি মনে ক'রে মহিলা আসেন। ততদিনে স্বামীপুত্র হারিয়ে একটি গুরু ধরেছেন। গুরু বলেছেন 'যার যা আছে দিয়ে দে, মুক্ত হ।' তখন তাঁর অনুশোচনা হয়েছে। 'কে জানত বল রাঙাদি, তোলাকাপড়ের নিচে টায়রাটা প'ড়ে আছে। তাই ভাবলুম।'

মা তীক্ষ্ণ হেসে বলেছিলেন 'সেজন্যে ত আসনি আভা, পরকালের চিন্তা ক'রে দিতে এসেছ। নইলে সেদিনও তুমি ভাল ক'রেই জানতে ও টায়রা তোমার কাছেই আছে।'

'সত্যি রাঙাদি আমি জানতাম না'···আভাকাকীমার মুখ লাল হচ্ছিল। যারা চিরকাল অপরকে কথাশোনায় এবং পাল্টা জবাব শুনে অভ্যস্ত নয় তারা মুখের উপর কথার চাবুক খেলে যেমন জ্বলতে থাকে তিনিও তেমনি জ্বলছিলেন। অমলের মা'র কথাগুলো গায়ে চিড়বিড় ক'রে জ্বালা ধরাতে জানে।

'সেদিনও জানতে, কেননা, আমি বলেছিলাম তোমার কাছে আছে, আমি মিথ্যে কথা বলিনা। তবে দেখ, অন্যায়ের ফল কেমন ক'রে ফলে নিজেই টের পেলে, আমি আর কিছু বলব না।'

আভাকাকীমা রেগে নাক লাল করে কেঁদে কেটে একশা। মা সে কথায় কর্ণপাতও করেননি। বলেন 'নেব কেন! ও জিনিষ আমি নেবনা। শত অভাব হ'লেও নেবনা। কেন, তোমার ভাসুর কি আমায় খেতে দিচ্ছেননা, না পরতে দেননি?'

আভাকাকীমা পরাজয় স্বীকার ক'রে বিদায় নেন। বাবা মা'কে যখন বলেন 'শোকা-তাপা মানুষ, ওকে কষ্ট দিলে···' মা বলেন 'শোকতাপ আজ পেয়েছে, আমার সেই দুর্দিনে তোমার ভাই আর ও দু'জনে অমন করল কেন? এত অভাবের দিন গেল তখন মনে পড়েনি?'

ব'লতে বলতে জ্বলে ওঠেন 'আজ সব ধুয়েমুছে পুণ্যকরার শখ হয়েছে কেন? আস্পর্ধা দেখে মরে যাই, যেন ওটা ফেলে দিয়ে গেলেই ওর সব পাপ ঘুচে যেত।'

'সংসারের অভাবের সময়ে··· নিজে ত তেমন কিছু দিতে পারিনি বাবা আস্তে আস্তে বলেন।

'সংসার থাকলেই অভাব আছে। এমন ত' এখনো হয়নি যে খাওয়াপরা জুটছে না। আর গয়না! গয়না পরে কত সুখ সে ত' দেখলামই চোখের সামনে।'

কথাগুলো খুব নরম বা মধুর ক'রে বলেননি মা, তবু মা'র কথাগুলি অমলের ভাল লেগেছিল। তখন তার বয়স পনেরো। অভিভূত হবার বয়স। মা-কে মনে হয়েছিল বুনোরামনাথের স্ত্রী'র চেয়ে কিছুমাত্র কম নন।

এই রকমই দেখেছে তাঁকে বারবার। পরে বয়স এবং অভিজ্ঞতা বাড়লে তবে বুঝেছে কেন এবং কি কি কারণে মা শ্রদ্ধেয়। দেখেছে দশজনের সঙ্গে একত্র হ'য়ে গলা মিলিয়ে যারা 'আপসবিহীন সংগ্রাম' ব'লে চ্যাঁচায়, তাদের ব্যক্তিগত জীবনে হয়ত সবরকম অন্যায় অসাধুতার সঙ্গে আপস করার আর অন্ত নেই। ঘরে বাইরে, সভায় এমনকি স্বগত চিন্তায় সর্বত্র সব সময়ে মানুষ নানারকম অসাধুতা নীতিবিরোধিতা

অসত্যের সংগে গলাগলি করছে। সে সব দেখে তবে অমল বুঝেছে কেন তার মা অনেকের চেয়ে বড়।

বুঝেছে, অভিভূত হয়েছে। কাছে বসে বলতে পারলে বড় সুখ পেত সে, তবে মা ত' ততদিন থাকেননি। যতদিন ছিলেন, তখনও অমল কাছে গিয়ে এ-সব কথা বলতে পারেনি। বললে মা অবাক হ'তেন। হাতে কাজ থাকলে বলতেন 'ঐ হয়েছে, ঐ থাক, বাড়াবাড়ি করতে হবে না।' সব রকম বাড়াবাড়ির সম্পর্কে তাঁর গভীর সংশয় ছিল।

বাবা যখন বসত বাড়ীসংলগ্ন জমিটুকু বাদে সব বেচে দিলেন তখনো অমল সংসারের আসল অবস্থাটা যেন তেমন বোঝেনি। সরিতের দাদা তড়িৎ অবিশ্যি তাকে বলল 'মেসোমশায়ের যা কাণ্ড, কেন আমাকে বলতে কি হয়েছিল? জানিস না ত' জমি এখন সোনা। কেন মেসোমশায়ের কি ক্যাশ টাকার বড় দরকার পড়েছিল? জানিস কিছু?'

না, অমল সেসব জানে না, তখনও বোঝে না। ঐ এক স্বভাব অমলের বাবার, পারত পক্ষে কিছু বলতে চাননা, বউকে, ছেলেকে বা আর কাউকে। যতক্ষন পারেন নিজে বুকের ভেতরে সব উদ্বেগ ও অশান্তি ব'য়ে নিয়ে বেড়ান, যদিও তার ফল সবসময়ে ভাল হয়নি। স্বাস্থ্যটা জীর্ণ উইপোকার বাসার মত ঝুরঝুর ক'রে একটু একটু ক'রে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়েছে।

তখন সান্ন্যালের সঙ্গে চা-এর ব্যবসায়ে নামবে ব'লে মনে মনে স্থিত সংকল্প অমল। ম্যাডানস্ট্রীটে, সান্ন্যালের সেই সাজান গোজান খুপরির মত অফিসঘরে ব'সে ছেঁড়া কথার টুকরোয় ঝুড়ি বোঝাই করা হয়।

সেখানেই অমল প্রথম পুলককে দেখে। কালোরঙ, ওর কথা বিশ্বাস করতে হ'লে ম্যাট্রিকপাশ, মাথায় প্রচুর হেআরফুড ঘসে এবং শার্ট প্যান্ট পরার দিকে খুব ঝোঁক যদিও হাঁটাচলার ভঙ্গীটা বিশ্রী ব'লে খারাপ দেখায়। কেন যেন অমলকে দেখে ও দারুণ গদগদ হ'য়ে উঠল। দিন নেই রাত নেই 'অমলদা অমলদা' করে। পরপর তিনটি যুক্তাক্ষর উচ্চারণ করতে পারে না। শোনা গিয়েছিল সরকারের কাছ থেকে

'স্মলস্কেল ইণ্ডাস্ট্রি' করবার টাকা ধার নিয়েছে কার্ডবোর্ডের বাক্স বানাবার ব্যবসা ফাঁদবে ব'লে।

সে-সব টাকা দ্রুত ফুঁকে দেবার ফলে পুলক কিছুটা কাবু এবং সান্ন্যাল ওকে প্রায়ই ভরসা দিয়ে ব'লে থাকে 'বেশ করেছ, চালাক ছেলে। হাতে যতক্ষণ সার্টিফিকেট আছে ততক্ষণ তোমার ভাবনা কি?

'সার্টিফিকেট কেন? শুনলাম তোমরা ত' বর্ধমানে থাকতে।' অবাক হ'য়ে অমল প্রশ্ন করে তখন হ্যা হ্যা ক'রে হেসে পুলক বলে 'কিন্তু পৈত্তিক বাড়ী কোথায় জানত? মস্ত লোকের গ্রাম হে, যদিও কেউ বললে পরে আমাদের চিনবে না অনেকদিন ভিটে পরিত্যাগ করা হয়েছে কি না!'

যে নিগূঢ় কৌতুক বোধ মানুষকে জীবনের জটিল ও বন্ধুর পথে চলতে সাহায্য করে পুলকের সে-সবের বালাই ছিল না। প্রায়ই করুণ গলায় বলত 'সেজ জামাইবাবু বলে দেশ গাঁয়ের পরিচয়টা আর দিও না। বলবে না কেন, বাড়ীতে সবাই শিক্ষিত আমি একাই পড়ে আছি কিনা।

ঐ 'দাদা দাদা' করা এবং লেপটে লেপটে থাকা অমল মোটেই পছন্দ করত না কিন্তু কি আর করা যায়। পুলকের ভিজে ভিজে কথা শুনলে ওর ওপর করুণা-ও হত। 'ওসব কথা ভাব কেন, জীবনে দাঁড়াতে চেষ্টা কর সবাই ভাল বলবে।'

অমলের এ সহৃদয় কথার উত্তরে পুলক বলত 'হ্যাঃ, জন্মথেকে একটা নাম রাখবার ফুরসত হয়নি বাবুদের শেষকালে পাঁচবছর বয়সে নাম রাখা হ'ল প্রাণকালী। এমন নাম থাকলে কি কেউ জীবনেদাঁড়াতে পারে? এ নামটা ত' নিজে নিজে নিয়েছি আমি। ফাদার এক্সপায়ার করেছেন তাঁকেও অবহেলা করা হলনা। এ নামের মধ্যে ঐ 'প' 'ল' 'ক' তিনটি অক্ষরই রইল। এখন পুলক দত্ত খুব মন্দ শোনায় না কি বল?'

পুলকের নামদর্শন শুনে অমল ত' হতবাক। বলল 'কি জানি অত ভেবে দেখিনি ভাই, ভালই ত!'

'সেদিকে ভাই তুমি মেরে বেরিয়ে গেছ অমলদা, না কি বলেন প্রভাত বাবু?'

সান্ন্যাল স্মিতহাস্য করল।

'নামখানা অমল চ্যাটার্জি, চেহারা আছে বাড়ীঘর আছে, রেসপেক্টেবেল আর বলে কাকে? একেবারে অ্যারিস্টোক্র্যাট তুমি!'

জাতঅভিজাত সম্পর্কে পুলকের মতামত শুনে অমলের হাসি পাচ্ছে। পুলক কিন্তু পরপর দুটো বড় বড় ইংরেজী কথা বলতে পেরে ভারী খুশী।

তখন কিছু কিছু কথাকে অমল হাল্কা ভাবেই নিয়েছে।

'নাম, নাম চাই' পুলক বলত 'কি রকম জান? যেখানেই প'ড়ে থাক বলবে আমি প্রেসিডেন্সীর ছাত্তর, যেখানেই বাস কর বলতে হবে আমি বালিগঞ্জে থাকি। নাম ছাড়া এদিনে কিছু হবেনা। কি করে যে নাম করি!' পুলক ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়ত।

এক একসময়ে বিরক্ত হ'য়ে সান্ন্যাল বলেছে 'যাও না, দু'হাতে বন্দুক নিয়ে ডাকাতি করতে যাও, নাম হবে।'

পুলক টেবিলে চাপড়মেরে বলেছে 'অস্বীকার করতে পার? ঐ ত' সেই ডাক্তারটা জলজ্যান্ত তিনটে খুন করল, কে না বুঝল যে ও-ই খুন করেছে, তবু লোকটা কেমন বেরিয়ে গেল দেখ। একে ডাক্তার তার খুনে, আদালতে কেস দাঁড়ায়নি বটে তবু ত' সবাই জানে। নাম, নাম চাই জানলে?'

এসব কথা এককান দিয়ে শুনেছে অমল এককান দিয়ে বের ক'রে দিয়েছে। তখন কি আর সে জানে এই টুকরো এবং ছেঁড়াকথা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। সমাজে একটু পাত্তা পাবে বলে যে আত্মপরিচয় গোপন করে, নাম বদলায় এবং যার মতে খুনে হ'লেও আপত্তি নেই যদি গা বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসা যায়, সে লোককে শতহস্ত দূরে রাখাই সমীচিন।

কেমন করেই বা বুঝবে। তার আগে ক'টা খল লোক দেখেছে

অমল ক'জন সুবিধাবাদীর মুখোশ খোলা চেহারা দেখেছে? একদিকে অনভিজ্ঞতা, আর একদিকে শর্টকাট খুঁজে পাবার ইচ্ছে। বাবার মত অনেক পথ হেঁটে, ঘাড় সরু ও চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ ক'রে ফুরিয়ে যাবার ইচ্ছে তার নেই।

টাকা চাই, টাকা। বাড়ীঘরদোর নতুন ক'রে ফেলতে হবে, বাবা মাকে মুড়ে দিতে হবে সুখ ও আরামে তা ছাড়া সে নিজে?

জামাকাপড় সাবান দিয়ে কেচে নিয়েছে অমল, ইস্ত্রী চালিয়ে নিভাঁজ সুন্দর ক'রে তুলেছে শার্ট ও ধুতি। সে যখন সাবান ঘষেছে, বাবা ব'লেছেন 'ভেরি লডেবল। এই ত' চাই।' সে নিজেও নিজেকে বলেছে 'এই ক'রে জীবনে দাঁড়ায় মানুষ।' কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঐ অবস্থার ওপর ঘেন্না আসে। কত আর পুরনো জুতোর কালি ঘষা যায়? শার্টের কলার ছিঁড়লে কত আর দর্জির দোকান থেকে পালটে নিয়ে কাজ চালানো, দুটো পয়সা কমাবার জন্যে দু'স্টপ এগিয়ে গিয়ে বাসধরা, এক একদিন পয়সা নেই বলে রাতে ভবানীপুর থেকে টালীগঞ্জ ট্রামডিপো পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে বাস ধরা, এতে ক্লান্তি এসে যায়।

কি হবে, পড়াশোনা শেষ করে কি হবে? মোটেই মন নেই। না হয় কোনগতিকে পাশ করলাম, কিন্তু অগতির গতি ত' সরকারী অফিসে কেরানী হ'য়ে ঢোকা। তাতে কি অভাব মেটে? চাকরী করলে যা পাওয়া যাবে তাতে দেওয়ালের গায়ে আস্তর ধরানো চলেনা।

সুন্দর ছিমছাম একটি জীবনের চিত্র মাঝেমাঝেই দেখত অমল। কি আশ্চর্য, সে জীবনে নীতার যেন একটা জায়গা আছে। নীতাও যেন কোথাও আছে, আড়ালেই, অমলের সুখী হ'য়ে যাওয়া বাবা এবং মা'র সঙ্গে সঙ্গেই তারও অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

কে জানে এর নাম ভালবাসা কি না! এত অল্প দেখে এবং জেনে কোন মেয়েকে ভালবাসা যায়? অমল ভাবছিল কাজকর্ম একটায় লেগে যেতে পারলে নীতার দাদাকে বড়মুখ ক'রে বলা যাবে 'বোনটার বিয়ের জন্যে অন্যত্র চেষ্টা করবার দরকার নেই।' এ কথাটা বলবে স্থির করবার পর

বারবার মনে হয়েছে সরিৎকে কিছু বললাম না, সরিতের জানা দরকার।

কেন যেন কিছুতেই সময় পাওয়া যাচ্ছিল না। সরিৎ উদ্বিগ্ন ভাবে তার গতিবিধি লক্ষ্য করে, অমল সব বুঝতে পারে। অবশেষে একদিন সরিৎ তাকে জিগ্যেস ক'রে বসে 'কি ব্যাপার বল্ত ?'

অমল হঠাৎ হাসে। হাঁ সান্ন্যালের সঙ্গে সব ঠিকঠাক ক'রে ফেলেছে, এবার সরিৎকে সব বলা চলে। বলে 'সন্ধেবেলা পুকুরঘাটে আসিস, কথা আছে।'

সেই ঘাট। ছোটবেলা 'সুশী আপনাকে বিয়ে করবে' লেখা নিয়ে কত কাণ্ড। হিজল গাছের ছায়ামাখামাখি ঘাটের রাণায় হিজল ফুলের গোলাপী পাপড়ি ছড়িয়ে আছে। তবু ও সব ক'টা গাছ নেই, একটা মাত্র গাছ। পুকুরে জল টলটল করছে, ওদিকে বটগাছের বাঁয়ে আর একটি নতুন বাঁধানো ঘাট, সেখানে রাত হ'লে রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালারা নাইতে আসে, এ ওকে সাবান মাখায়, হইহল্লা করে স্নান ক'রে উঠে যায়।

একটি লোক পাড়ে সাইকেলরিকশা রেখে জল তুলে ধুচ্ছিল। সাইকেলের চাকায় চাঁদের আলো চিকমিক করছে, বাস চলে যাচ্ছে, তার আলো।

সরিৎ এল। সাইকেলটা পুকুর পাড়ে রাখল, পাশে এসে বসল। হাতে বেলফুলের মালা জড়ানো। ঐ এক শখ। কলকাতার দিকে দিকে গেলে পথ থেকে কিনবে, নইলে বউদিকে দিয়ে গাঁথিয়ে নিয়ে ছাড়বে। ফুলের কুঁড়ি চটকে গেলে তার গন্ধ না কি আরো ভাল।

সরিৎ হাতের মালাটা শুঁকল, অমলের হাত থেকে সিগারেট নিল। দু'চোখে হাসি নিয়ে তাকাল এবং আস্তে বলল 'পয়সা হয়েছে দেখছি, গোল্ড্ফ্লেক খাচ্ছিস!'

অমল নিচু হ'য়ে ধরাল এবং বলল 'সান্যাল দিয়েছে, একটিন।' কিছুক্ষণ চুপচাপ।

'সরিৎ, আমি কলেজ ছেড়ে দিচ্ছি।'

জবাব নেই। সরিৎ চেয়ে আছে. চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হ'চ্ছে। অমল একবার চাইল। না, সাহস হারিয়ে যাচ্ছে। কে জানে কি ক'রে বলবে। সরিতের হাতদুটি হাঁটুর ওপর জড়ানো, সিগারেট নিভিয়ে পাশে রাখা, চোখের দৃষ্টি জলের ওপর।

'সান্যালের সঙ্গে চা-এর ব্যবসা করছি।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

'কই, কিছু বলছিস না ত'. অমল একটা খোঁচাদেয় কনুই-এ।

'উঁ ?' সরিৎ যেন জেগে ঘুমোচ্ছিল এখন জাগল।

'কিছু বল্ !'

'কি ?'

'ভাবছি কাজটা তুই ভাল করছিস কি না !'

'মন্দ কি দেখছ ?'

'কি দেখছি !'

সরিৎ একটা ছোট নিশ্বাস ফেলল, বলল 'লেখাপড়াটা ছেড়ে দিবি, সেটা ভালহ'ল কি না তাই ভাবছি।'

'লেখাপড়া !' অমল উত্তেজিত হয়েছে এবং বন্ধুর নিরুত্তাপ ব্যবহারে বেশ দুঃখিত 'দেখ সরিৎ, ঐ বি, এ. বেঙ্গলী সিলেক্‌শন্‌স আমার দ্বারা হবে না। ও যারহয় তার হয়। বাড়ীর এই অবস্থা, বাবা রিটায়ার ক'রে বসে আছেন, এই সবই ভাবব না পড়াশোনা করব ?'

'মেসোমশায় কি বলেছেন তিনি পড়াতে পারছেন না ?

'না না, তা ব'লেননি বটে !'

'তবে, ?

'তবে মানে ! প'ড়ে না হয় তাঁকে খুশী করা গেল, ছেলে আমার গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। আমার কি হবে বল্ ত' ? সেই ত' পাঁচনম্বর বাড়ীতে নাম লিখিয়ে কবে শ্যামের বাঁশী বাজবে সেই আশায় সেজেগুজে ব'সে থাকি। আর বাজারটা তুমি দেখছনা আমি ত' দেখছি। মেয়েদের ঠেলে তুমি অফিসে জায়গা পাচ্ছনা। পেলেও কোন ভরসা নেই।

যত দেখছি ফিলসফি, বাংলা আর হিস্ট্রির এম. এ. সবাই দেখি কেরাণী হ'তে ছুটছে। কোনমতে যদি ঢুকলে তবে প্রস্পেক্ট বলতে কিছু নেই, পার্মানেণ্ট হ'তে হ'তে তোমার ছেলে কলেজে ঢুকে যাবে।'

'সত্যি কথা।'

'এমন ক'রে ঘষতে আমি পারছি না সরিৎ। তা ছাড়া দেখ, ক' বছর হ'ল দেশ স্বাধীন হ'য়েছে, এখন দিকে দিকে হাজারটা পথ খুলে যাবে। একটু সাহস থাকা চাই, পুতুপুতু করলে চলবে না।'

'ঠিকই বলেছিস। তোরকথা একেবারে মিথ্যে নয়, স্বীকার করতেই হবে।'

'তা হ'লে কিছু বল্?' মুডটা যেন কেমন হ'য়ে গেল। সরিতের সঙ্গে কাজের কথা সেরে নিয়ে অমল নীতার কথাটা পেড়ে রাখবে ভেবেছিল তা হ'চ্চে না। যা হোক, সময় কিছু পালাছে না, বললেই হবে।

'তোর ভাল হলেই ভাল। ঐ সান্যাল না কে, তেমন চিনি না ত' বুঝতে পারছি না তোকে ঠকাবে না কি!'

'তুইত যেমন, আমি কি টাকাপয়সা খাটাতে যাচ্ছি না কি?'

আরো কিছুক্ষণ কি ভাবল সরিৎ। তারপর বলল 'ব্যবসা ক'রে অনেকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।'

অমল আর একটি সিগারেট ধরাল! এই ত' সরিতের গলার এ-স্বর ও চেনে। এতক্ষণ আলাদা হয়ে বসেছিল তার কারণ হচ্ছে ওর নিশ্চয় অভিমান হয়েছে। হবারই কথা। অনেকদিন দু'জনে আলাদা আলাদা। দেখাশুনো হয়না। নিজে কি করছে না করছে সে-সব কথা অমল তেমন খোলামেলা ভাবে আলোচনা করে নি।

সরিতের অভিমানের সে-ও একটা কারণ হতে পারে।

'বোধহয় দার্জিলিং যেতে হবে।' অমল বলল।

'মাসীমারা জানেন?'

'না। সেজন্যেই ত' তোমায় ডাকা। আমি দার্জিলিং' যাব. তুমি সব কথাটি ওঁদের খোলসা ক'রে বলবে।'

'এই মরেছে।'

'আমি বললেই ফাটাফাটি লেগে যাবে।'

'মাসীমা আর তুই হু'জনেই অবুঝ।'

'আরে বুঝতে চাননা ওঁরা, চোখে ঠুলি পরে থাকেন, ত' কে কি বলবে! দেখেও দেখেন না ওঁরা, বোঝালেও বোঝেননা', কসবার বাড়ীর হু'কাকার হুই ছেলে কি একটা কালী আর সাবানের এজেন্সী নিয়ে দিব্যি দাঁড়িয়ে গেল। গাপুটা সেদিন অবধি বোম্ বানাত, একেবারে ব'খে গিয়েছিল এখন ঐ বাড়াতেই ছোটখাট ভাবে কাপড় কাচা সাবানের কারবার ক'রে ঐ অগ্রমূর্খ ছেলেটা সবচেয়ে বেশী কামাচ্ছে জানিস্ ? ওঁদের বললে পরে বলবেন ভাগ্য !'

'ওঁদের কথাও সত্যি !'

'অস্বীকার করি না। তবে কবে কি হবে ব'লে বসে থাকব! দেখ্ বাপু ঐ গ্যাম্ব্লারের মত হঠাৎ ঝুঁকি নিতে জানতে হয়, নইলে হয় না।'

'আমি আর শুনে কি করব বল ? আমাকে ত' পড়তে হবে, পাশও করতে হবে। ও চাকুরী বাকুরী যতই একঘেয়ে হোক, তা-ই করতে হবে। নীতা আছে যে !'

'কি বল্লি ? কে আছে ?'

অমল প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছে। প্রথমটা ভেবেছে বোধহয় অমলের মনের কথা জানতে পেরেছে তাই ঠাট্টা করছে সরিৎ।

সরিৎ আস্তে বলে 'চ্যাচাস কেন ? শোন্, একটা সিগারেট দে।'

ক'মাস অমল ওদের খবর রাখতে পারেনি, হাসির চিকিৎসার জন্যে সরিৎ যাওয়া আসা করেছে। ইতিমধ্যে, নীতার একটি বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যায়। বেশ কথাবার্তা চলছিল, হাসির কথা কেমন ক'রে যেন তারা জানতে পারে। হাসিকে নিয়ে নানারকম উৎপাত ত' আছেই, উপরন্তু ইদানীং যেন কারা উড়োচিঠি ছাড়ছে। এই নিয়ে হু'খানা হ'ল। পাত্রপক্ষকে সাবধান ক'রে দিয়েছে লেখক। হাসির কথাটা নানাভাবে

লিখেছে, এমতাবস্থায় বিয়ে যে দেবে সে যেন নিজের দায়িত্বে কাজ করে, লেখক সদাশয় তাই জানালেন।

বলাবাহুল্য এরপর আর পাত্রপক্ষের সাধ্য বা সাহসে কুলোয়নি। শেষের চিঠিটিতে লেখাছিল মেয়েটির দাদা ছাড়া অন্যঅভিভাবকও আছে, তারাই নীতাকে চালায়।

'এমন চিঠি কে লিখল?' অমলের প্রশ্নের জবাবে সরিৎ হাসে। দুজনেরই বলাই-এর কথা মনে হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভেবেছে না না, বলাই এত নিচে নামতে পারে না।

সরিৎ বলে 'সেই সময়ে বুঝলি, কি যে মাথায় চাপল বলে বসলাম ভাবছেন কেন, আপনার বোনকে আমি বিয়ে করব।'

অমল চুপ।

'জানি এখন চুপ ক'রে থাকবি, এখন তোর চুপকরবার পালা। কিন্তু ভেবে দেখ, আমি আর কি বলতে পারতাম! তা ছাড়া, মেয়েটি বোধহয় মন্দ নয়। ভাইটা অবিশ্যি··· তা কি আর করবে, অবস্থার ওপর ত' মানুষের হাত থাকে না।'

একটু ভেবে নিয়ে বলল 'এখন চিন্তা হ'ল বাড়ী নিয়ে। তা বাড়ীতে এখন বলতে যাচ্ছে কে! পাশটাশ করি, চাকরি করি, ওর দাদাকে ব'লে দিয়েছি এখন ক'বছর চুপচাপ থাক। তবে আমার কথায় বিশ্বাস না ক'রে যদি ইতিমধ্যে আর কোথাও ছুটোছুটি কর ত' সরিৎ ঘোষাল আর তোমাদের বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াচ্ছে না। ব'লে দিয়েছি বোনকে বাড়ীতে রাখবে, চাকরি করতে পাঠিও না।'

'বেশ জমিয়ে ফেলেছিস তা হ'লে।'

'তুই বিশ্বাস করিস?' সরিৎ চোখের কোণ দিয়ে তাকায় এবং নিচু, শান্ত গলায় বলে 'তুই বিশ্বাস করতে পারিস আমি ওখানে যাচ্ছি, মেয়েটার সঙ্গে ভাব করছি, নানাকথা কইছি?

না। যদিও সম্প্রতি, এইমাত্র অমলের ছোট একটি বাসনার বাতি

সরিৎ একফুঁ-এ নিভিয়ে দিয়েছে তবু সরিৎ সম্পর্কে ও-কথা বিশ্বাস করা যায় না।

'নীতা তোকে খুব ভক্তি করে।'

এমন একটা কথা কইল সরিৎ, যার মানে বোঝা যায় না। 'ভক্তি করে, ভক্তি করে মানে? ক'দিন দেখল যে এর মধ্যেই···?' 'ও ধরে নিয়েছে তুই গিয়ে না দাঁড়ালে ওদের লাঞ্ছনার শেষ থাকত না। আর···সে কথা ত' মিথ্যেও নয়। আমি ত' জানি।'

'কি জানিস?'

'তোকে জানি।'

এইটুকু ব'লেই সরিৎ থামল এবং বন্ধুর হাতে হাত রাখে। অমল হাত সরিয়ে নেয় না। ইচ্ছে ক'রলে এই অবস্থাটাকে নিয়ে সে মনে-মনে অনেক দুঃখ ফেনাতে পারত। ভাবলেই হ'ল আমি কি হতভাগ্য। যে মেয়েটাকে বিয়ে করব ভেবেছিলাম, যার প্রতি অনুভূতি বিন্দু বিন্দু করে মনের তলায় সঞ্চিত হ'চ্ছিল, এইমাত্র বন্ধু বলল তাকেই ভালবাসে। ঠিক এই পরিস্থিতি থেকে জীবনে অনেক ট্র্যাজিডি আসতে পারে, অন্তত ট্র্যাজিডির অভিজ্ঞতা এ-থেকেই সঞ্চয় হয় জীবনের পাত্রে। তবু গভীর কোন বেদনা ত' মনকে মথিত করছে না। যেন উদাস হয়ে যাচ্ছে মন, এবং এখনই অমল মনেমনে বলছে এই ভাল, সরিৎ সুখী হোক।

সরিৎ সুখী হোক? সুখ পাবে ত' সরিৎ? বিয়েটা ত' শুধু ওর একার সাধ আহ্লাদের ব্যাপার নয়। ওর মা, তড়িৎ, তড়িতের বউ, বুড়ো পিসীমা সকলের মুখ পরপর মনে পড়ল অমলের। কি ভাবে নেবেন? হাজার হ'লেও ওরা এ অঞ্চলের প্রাচীন এবং বনেদী গৃহস্থ পরিবার।

'বাড়ীতে বলবি না?'

'এখনো না, এখনো সময় হয়নি।'

সরিৎ হাতের মালাটা শুঁকল। এখন, এখন অমলের মনে হ'ল ওদের বাড়ীতে বেলফুলের গাছ নেই। কে জানে, পটলদের বাড়ীতে আছে কি না। যদিও, পটলদের বাড়ী, এ-কথাটা ভাবতেই মনে পড়েছে

নানারকম ফুলের মিশ্রিত সোঁদা ও মিষ্টি গন্ধ। একতলা বাড়ীটির উঠোনে নানারকম ফুলের গাছ আছে যেন, মনে করা যাচ্ছে না। হয়ত' আছে, হয়ত' নেই। পুরানো লাল ইঁটের বাড়ীর উঠোনে যেমন কিছু সন্ধ্যামালতী, টগর, রঙ্গন, মোরগঝুঁটি, বোতামফুল ও দোপাটি ফুটে থাকে তেমনি হয়ত' নীতাদের বাড়াতেও আছে। হয়ত' কিছু বেলফুলও ফোটে সেখানে এবং নীতা মালাগেঁথে দেয়। সে মালা গাঁথে এবং সরিৎ হাতে জড়ায় এটা বোধহয় এরমধ্যেই ওদের কাছে স্বাভাবিক একটি ঘটনা হয়ে উঠেছে, যা দেখে কেউ আশ্চর্য হয় না।

'চল, ওঠা যাক।' মৃদু নিশ্বাস ফেলে অমল বন্ধুকে বলল।

॥ ছয় ॥

অবশ্যই চা-এর ব্যবসার ব্যাপারটা অমলের কপালে ভালভাবে উতরায়নি।

পরে, অনেকপরে সরিৎ বলেছিল 'কি আর করবি বল্, নিয়তি তোকে টানছিল।'

সরিৎ ঐরকমই। অমলের বিষয়ে একেবারে অন্ধ। যেন অমলের কোন দোষ থাকতে নেই, থাকতে পারে না।

ছোটবেলা থেকে অমলের স্বভাবের মন্দদিকগুলোও ও ঢেকে এসেছে এবং অমল মন্দ কাজ করলেও তার সাফাই খুঁজেছে।

ক্লাসনাইনে পড়বার সময়ে এক ঘটনা ঘটে।

একদিন আষাঢের বিকেলে প্রবল বিষ্টি নেমেছে। ঝড় বিষ্টির মধ্যে একটা বুড়ো ভিখিরী এসে অমলদের বারবাড়ীর দালানে বসেছিল। দালানটা কোন কাজে লাগেনা। বিশ্বনাথ গোয়ালার চালাঘর পড়ে যাওয়াতে কোণে গোরুর খড় বিচালী ভূসি রাখে, বাঁশের আলনায় কতকগুলো বস্তা। তা ছাড়াও কোদাল, খন্তা, শাবল, খুরপী, ঝুড়ি, নারকেলদড়ি, একতাঁই বাঁশ। এখানে থাকতে গেলে ওসব জিনিস বারোমাস দরকার। বাড়ী তৈরীর যন্ত্রপাতি-ও পাওয়া যাবে, কড়াই, বালতি, বুরুশ, পিটুনী, কণিক, লোহারশিক। ঘোড়ার আগে দড়ি কেনার মত অমলের বাবা 'যদি কোনদিন বাড়ী সারান' হয়' বলে কতকগুলো কিনে এনেছিলেন।

মাঝে মাঝেই তাঁর মাথায় নানারকম সম্ভাব্যকাজের পরিকল্পনা নড়েচড়ে উঠত, মাঝেমাঝেই তিনি আজেবাজে জিনিস কিনতেন। যেমন একটা কাঠের মই, অনেকখানি পাটের শন, পাতলা ও বাজে ক্যানেস্ত্রা টিন। 'লাগবে, কাজে লাগবে' তিনি বলতেন বটে, কিন্তু কোন কাজেই

লাগত না। মইটা যার যখন দরকার চেয়ে নিয়ে যেত। পাটের শন পচে যায় এবং টিনগুলো উঠোনে ফেলা থাকত। তোড়ে বিষ্টি নামলে টিনগুলোয় ঝমঝম ক'রে যতবারই শব্দ হ'ত, অমলের মা বলতেন 'ওই যে, কাজের লোক কাজ ক'রে রেখেছেন। আমার কানের মাথা খাচ্ছেন।'

সেই দালানের এককোণে বসেছিল বুড়োটা। সেদিন সকাল থেকেই সরিৎ অমলদের বাড়ীতে। বিষ্টিতে ভিজে বাজার করতে হয়েছে এবং আকাশের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে অমলের রবিবারটা মাঠে মারা গেছে ব'লে মেজাজ খারাপ। তার ওপর মা সকাল থেকে কবুল করিয়ে রেখেছেন বিষ্টি ধরলেই কাঁঠাল নিয়ে কসবায় পৌঁছতে যেতে হ'বে। 'গাছের ফলটা' ব'লে বাবার হঠাৎ ও-বাড়ীর লোকজনের জন্যে সোহাগ উথলে ওঠে এবং কি কারণে কে জানে হঠাৎ তু'জনে, বাবা এবং মা সে রবিবারে মনের এবং মতের মিল ক'রে ফেলেছিলেন।

কেন যেন অমলের কারো ওপর প্রতিপত্তি ফলাতে ইচ্ছে হয়! সম্ভবত সেজন্যেই সে এগিয়ে গিয়ে হম্বিতম্বি হইচই ক'রে লোকটাকে চলে যেতে বলে 'বিষ্টি থামলেই নেমে যেও, এটা বসবার জায়গা নয়।'

লোকটা ওর কথা না বুঝে মাথানাড়াতে নাড়াতে হতচকিত হ'য়ে নেমে পড়ে। ভূষির বস্তার সুখপ্রদ আশ্রয় ছেড়ে দালানের নিচে নামে এবং আস্তে আস্তে বটগাছের দিকে রওনা হয়। ঝড়বাদলে ভিখারী কুকুর, অন্ধ, আতুর বটগাছের নিচে আশ্রয় নিতে যায়, চিরদিনের গল্পকথায় লেখা। থাকে বর্ষার বিকেল। বিষ্টি, অথচ আকাশ বিকেলের হলদে আলোয় উদ্ভাসিত। আষাঢ়ের দিন এই অনৈসর্গিক আলোকিত আভাস দিয়ে অনেকক্ষণ অবধি মুখ মেজে রাখে, সন্ধে পর্যন্ত।

তখন বাবা এবং মা ব'কে ওঠেন 'ছিল একপাশে নিজের মনে। কি দরকার ছিল তাড়াবার ?'

'আমি তাড়াইনি।' অমল মুখ গোঁজ ক'রে বলে। তখনই সে

অনুতপ্ত এবং নেহাৎ অভিমানে বাধছে তাই নেমে গিয়ে লোকটিকে ডেকে আনতে পারছে না। মুক্তো ঝি অবধি উঁকি দিয়ে বলল 'দালানটা কি ক্ষ'য়ে যাচ্ছিল, হ্যাঁ নিতু ?'

'ধুত্তোর' ব'লে অমল সেই বিষ্টিতেই নামতে যায় এমন সময়ে সরিৎ বলল:'না মেসোমশায়, নিতু ঠিকই করেছে। লোকটার পায়ে কি বিচ্ছিরি ঘা দেখেননি ত' গন্ধ বেরুচ্ছিল।'

তখন বাবা বলেন 'তাই নাকি ? লক্ষ্য করিনি ত' ?' যে যা বলেছে সেদিন তার সঙ্গেই সায় দিচ্ছেন বাবা। মেজাজ খুব ভাল। কেননা মা অতীত এবং ভবিষ্যৎ ভুলে সেদিনকার মত বাবাকে যেন নিজের দলে নিয়েছেন, যদিও এই মিটমাটের আয়ু যে কোন মুহূর্তে ফুরিয়ে যেতে পারে। ভাব থেকে ঝগড়া হ'তে বিশেষ বড় উপলক্ষ্য কোনদিনই দরকার হয়নি ওঁদের। হলেই হ'ল। বাজার থেকে খারাপ মাছ এসেছিল, ও ধোপা কাপড়ের ওপর মায়া ক'রে কাচেনা তা আগেই জানা এই ধরণের যে কোন সামান্য বিষয় থেকেই কুরুক্ষেত্র বেধেছে অমলদের বাড়ীতে।

সরিৎ অমলের ঐ রূঢ়তাটুকু ঢাকার জন্যে যে কথাটি বলে তা যে মিথ্যে তা অমলের চেয়ে আর কে ভাল জানে ? সরিৎ ছিল এপাশের ঘরে। লোকটিকে ভালক'রে দেখেওনি। ঘা আছে কি না তা ওর জানবার কথা নয়।

ছোট বিষয়ে অমলকে ঢেকে ঢেকে আগলেছে ছোটবেলায়। বড় হয়ে বড়বড় বিচ্যুতি ঢেকেছে। অবশ্যই তাতে শূন্যস্থান পূর্ণ হয়নি। তবে ক্ষতের ওপর ক্ষতির ওপর প্রলেপ পড়েছে। জীবনের বিশেষ দুঃসময়ে ঐ সরিৎ ছাড়া আরত' কেউ কোনদিন তেষ্টার জল এগিয়ে ধরল না।

অতিরিক্ত ভদ্রতাবোধ, আত্মসম্মানজ্ঞান, এগুলো জীবনের প্রথমদিন থেকেই অমলের অসুবিধে ঘটিয়েছে। চূড়ান্ত অভাবেও লোককে মুখফুটে বলতে পারে না, তার ওপর ওর সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাতে আরো দুটি একটি ব্যাপার ত' বরাবরই সঙ্গের সাথী হ'য়ে থাকল। আরে, ওর সঙ্গে কার কথা, জাননা ওর কলকাতায় বাড়ী আছে? অমলের প্রপিতামহের নামে ইস্কুল, হুঁ হুঁ, চালাকি নয়।

ইস্কুল থাকলে প্রপৌত্রের কোন সুবিধে নেই সে কথা এদের বোঝাবে কে? 'যা ব'লছ তা ঠিক নয়' বলতে গিয়েও মুস্কিল। কেন বাবা ঢাকতে চেষ্টা করছ? জানি জানি তোমরা গোছান লোক। অমল এ ধরণের কথা কতবার শুনেছে।

সান্ন্যাল তার সম্পর্কে একটা ধারণা ক'রে নিয়েছিল। একজন মানুষ যখন আরেকজনকে দেখেশুনে ধারণা গড়ে নেয় নিজের মনে মনে, তখন সে ধারণা অপনীত করা যে কি কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়। ওই যে সান্ন্যালের মাথায় ধারণ' ঢুকে যায় অমলরা বেশ শাঁসালো অবস্থার লোক সেটি আর সরল না। ফলটি পরে অমলকে ভালকরেই টের পেতে হয়।

প্রথমটা অমলের কি উৎসাহ। জলপাইগুড়ি যাবে, দার্জিলিং যাবে। চা-এর স্যাম্পল আনবে।

'কোম্পানীর খরচ ত?'

সরিতের সে প্রশ্নের জবাব দিতে অমল একটু ইতস্তত করে। বলে 'সান্ন্যাল বলেছে যা দরকার দেবেখ'ন। তাছাড়া, ব্যবসাটা দাঁড়ালে ত' নিজেদেরই হবে। খরচপত্তরের ব্যাপারে মায়া করলে হবে কেন?'

সান্ন্যাল অবশ্য ওর হাতে একশো টাকা দিয়ে গেল। দার্জিলিং, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে ক'জায়গার ঠিকানা দিল। বলল 'জলপাইগুড়িতেই থাকবে। ওখানে ত' আমাদের বাড়ীতেই যাচ্ছ, অসুবিধে নেই।'

অবশেষে সরিৎ ও উৎসাহে মেতে উঠল। স্যুটকেশ কিনে আনল একটা, হোল্ডঅল। জন্ম জন্ম ধ'রে এক জায়গায় পড়ে থাকলে য' হয়। অমলের বাড়ীতে নিয়ে বেরুবার মত স্যুটকেশ, বিছানাপত্তর কিছুই নেই। এক এক বাড়ীতে বাইরে বেরুবার রেওয়াজ থাকে, ওদের বাড়ীতে সেসব কথা ভাবাই যায় না। ওর বাবা এবং মা কসবার বাড়ীতে থাকতে বাড়ীর অন্য লোকদের ব্যবস্থা ক'রে এখানে ওখানে পাঠাতেন, নিজেরা বাড়ী আগলে রাখতেন। 'আমি বাড়ী থেকে গেলে চলে কখনো' একথা ব'লে ভারী আত্মপ্রসাদ পেতেন।

পরে অবশ্য দেখা গেল বাড়ী ঠিকই চলল, কোন অসুবিধে হ'ল না। মাঝখান থেকে ওঁরা সেই যে কুয়োর ব্যাং সেই কুয়োতেই রয়ে গেলেন।

একে রেওয়াজ নেই, তাতে তখনো দেশজুড়ে এমন 'ভারত দেখুন, ভারতকে জানুন' এর হিড়িক পড়েনি। তাতেই আরো হ'ল না। পরে অবশ্য দেশ বেড়াবার শখটা ক্রমে ক্রমে বেড়েছে। মা ব'লেছেন 'তোর বাবা আর তুই দু'জনে আমাকে ফেলে রাখলি ঘরে। ঐ সুধীর মা যে বার উঠোনে পা দেয়নি সে অবধি কত দিল্লী দিল্লী ঘুরে এল।'

সরিৎ শুধু স্যুটকেশ কিনে হোল্ডঅল জোগাড় ক'রে দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি। জামাকাপড়ও জোগাড় করে আনে। গরম ট্রাউজার আর তাড়াতের পুলওভার পরে শেয়ালদ' স্টেশনে গিয়ে আগে ভাগেই পৌঁছয় অমল।

জীবনে প্রথম ট্রাউজার পরে সে কি অস্বস্তি। সবাই যেন তাকেই দেখছে। সরিতের সঙ্গে পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খুব ভাল লাগছিল তার, মনে হ'চ্ছিল নিশ্চয় তাকে বিশেষ স্মার্ট দেখাচ্ছে। বুকপকেটে বারবার হাতটা চলে যাচ্ছিল, সবাই যেন জেনে গেছে ওখানে একশো টাকা আছে অমলের। গাড়ীতে উঠেও সে ঘুমোতে পারেনি। যেন সবাই জানে এই প্রথম সে বিদেশ যাচ্ছে, নেহাৎই অনভিজ্ঞ। ঘুমিয়ে পড়লেই দুষ্টু লোকরা তার টাকাপয়সা নিয়ে নেবে।

ফিরে আসবার পর অবশ্য সে নবীনতা তার বেশীদিন থাকেনি।

সান্ন্যালই থাকতে দেয়নি। মাত্র ছ'টি মাস ছিল সে সান্ন্যালের সঙ্গে, তাতেই শেষের দিকে অবস্থা দাঁড়ায় ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচে অমল।

ছ'মাস ধরে অমল খুব খাটে, ওখান থেকে চায়ের নমুনা জোগাড় করা, দোকানে দোকানে ঘুরে এখানে অর্ডার সংগ্রহ করা, পরিশ্রম কম হয়নি তার। অথচ টাকা দিতে চায়না সান্ন্যাল, অমল বুঝে পায়না মা বাবাকে বড়বড় কথা বলেছে এতদিন ধ'রে, এখন পূজোর মুখে টাকা-পয়সা দিতে না পারলে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে ? মা চাননি, বাবা ত' কিছুই বলেননা তবু অমলের ত' আত্মসম্মান ব'লে কিছু আছে। বরাবর দেখেছে পূজো যত কাছে আসত বাবার মুখটা ততই শুকিয়ে সরু হয়ে যেত, দিতেই হবে এমন আত্মীয়স্বজনের তালিকা ছাঁটতে ছাঁটতে ছোট হয়ে এসেছিল তবু আর কম করা যেত না। কি যে রীতি দাড়িয়ে যায় পূজোর ছু'মাস আগে থেকেই ধোপা, গোয়ালা, রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া মিউনিসিপ্যালিটির জমাদার সবাই হাসি হাসি মুখে জানিয়ে যায় 'এবার ভাল কাপড় চাই, গতবার কাপড় ভাল হয়নি' অথবা 'ধুতি নেবনা, বউকে শাড়ী দেবেন।' শেষ অবধি এমনও কোন কোন বার হয়েছে ওদের দিতে গিয়ে বাড়ীতে সকলের কাপড় কেনা যায়নি, নইলে নিজে নিরেস কাপড় কিনে ওদের ভাল জিনিস দিয়ে খুশী রেখেছেন।

বড় আশা করেছিল পূজোর সময়ে বাবার হাতে কিছু দিতে পারবে। তা ছাড়া, এক এক সময়ে শোনা ছোট ছোট কথা তার মনে দাগ কেটে বসে যায়। যেমন মা বলেছিলেন এক বিষণ্ণ বুকচাপা চৈত্রের গুমোট বিকেলে,' একটা রেডিও থাকলে বসে বসে শুনতাম। আজকাল ঘরে ঘরে রেডিও।'

'নেই, শান্তিতে আছ।' অমল বলে।

অন্য সময় হ'লে মা হয়ত' ঝেঁঝে উঠতেন, স্বামীর ও সন্তানের অক্ষমতার ওপর আঘাত ক'রে বলতেম 'পারবে না তাই বল, শান্তিতে আছি না স্বস্তিতে আছি তা দেখে ত' তোমরা আর বাঁচছ না।' হয়ত' বলতেন 'যেদিন থেকে এ বাড়ীতে পা দিয়েছি' এই কথাটি শুনলেই

অমলের বিরক্তি বোধ হয়, বাইরের লোকের কাছে মা যখন 'আমাদের বাড়ী' বলেন, তখন শ্বশুর বাড়ী বোঝান, বাড়ীর লোকের কাছে যখন বলেন 'আমাদের বাড়ী' তখন চিরদিন বাপের বাড়ীর কথা বলছেন এ একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। নিজেকে শ্বশুর বাড়ীর মধ্যে বিলিয়ে দিতে এত বাধা কোথায় যেন থেকে যায়, যারা তাঁর সমস্ত সুখদুঃখের ভাগী সেই স্বামীসন্তানের কাছেও বাপের বাড়ীর কথা ব'লে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখতে কত না প্রয়াস অথচ অমলের বাবা নিরুপদ্রব শান্ত লোক, স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব গ্রাস করবেন বা ভেঙে দেবেন সে মানুষই নন।

কিন্তু মা কিছুই বললেন না। উঠোন থেকে কাপড় তুলে ভাঁজ ক'রে ক'রে হাতের 'ওপর রাখছিলেন, উঠোনে তারে মেলা কাপড়ের মধ্যে কি যেন আছে, দুপুরে বা সকালে সাবানকাচা কাপড় টানটান ক'রে মেলা আছে দেখলেই অমলের ভাল লেগেছে, যেন সংসারের সবকাজ সুষ্ঠুভাবে হয়েগেছে, কোন অশান্তির বালাই টালাই নেই। বিশেষ ক'রে ওর মা'র হাতে কাচা কাপড়, শেষ জলবিন্দুটি পর্যন্ত নিংড়ে নিতেন, শব্দ ক'রে ক'রে বাতাসে আছড়ে নিভাঁজ ক'রে তবে মেলে দিতেন, নারকেল দড়ি দু'হাতে ধরে মুক্তো পাকিয়ে দিত, ধোপা শিখিয়ে দিয়েছিল। তাতেই কাপড় গুঁজে দিতেন।

কাপড় মেলতে তুলতে অমলের মা-র কোনদিন ভুল হয়নি তবে ক'বছর বাদে কেন যে অমলের বাবার ধুতিটা তুলতে ভুলে গেলেন, বাবার অতবড় অসুখের মধ্যে অমল ঢুকছে বেরুচ্ছে, বাড়ীতে অন্য লোকজনও আসে যায়, উঠোনের একপাশে, তারের কোণে ধুতিটা পাকিয়ে গুটিয়ে বাতাসে উড়ছিল। ময়লা হচ্ছিল, অমলের চোখেও লাগে, মনে আরো বিশ্রী অনুভূতি। মাঝে মাঝে মুক্তোকেও ধমক দেয় 'রাজ্যের কাজ হচ্ছে বাবার কাপড় খানাই কি তুলতে মনে থাকে না?' নিজেই বা কেন তোলেনি কে জানে, কেউ কি বিশ্বাস করবে বাবা মারা যাবার পরে তবে কাপড়টা তোলা হয়। এককোণে পেয়ারা গাছের দিকে উড়ে চলে গিয়েছিল কারো চোখের সামনে ছিল না এবং বাবার মৃত্যুর পর অমলের একথা

অনেকবার মনে হয়েছে বাবাকে আমরা অবহেলা করেছিলাম। মনে মনে তাঁকে খরচের খাতায় রেখেছিলাম তাই ঐ ঔদাসীন্য আসে।

মা একটু ভুরু কুঁচকে আপন মনে বলেন 'তা ঠিকই বলেছিস, তবু শুনতে ভাললাগে, সময় ভাল কাটে, তোরা ত বাড়ীতে অষ্ট প্রহর থাকিস না বুঝবি না।'

শেষের দিকে গলায় আবদারের সুর এসে যায়।

বলেছিলেন, সম্ভবত পরে ভুলেও গিয়েছিলেন, কথাটি ব'লে ঐ যে মুখ একটু তুলে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন, মার মুখখানা অমলের মনে আঁকা হয়ে রইল। একটা রেডিও পূজোর সময়ে কিনে দেবে মা-কে, বাবার হাতে টাকা দেবে, কত টাকা তাকে দিতে পারে সান্ন্যাল তা নিয়ে মনে মনে কত কল্পনা, ও কত টাকা দেবে জানতে পারলে তবে অমল মনখুলে ভাবতে পারে তিনশো টাকার রেডিও কিনব, চারশো টাকার রেডিও কিনব।

সরিৎ অবশ্য বলেছিল কিছু টাকা দিলে পটল বেশ রেডিও তৈরী ক'রে দিতে পারে, সে রেডিও এমন মন্দ নয়, কে জানত একদিন পটলেরই দ্বারস্থ হ'তে হবে, জানলে অমল তুচ্ছতাচ্ছিল্য কম দেখাত, যেমন দেখিয়েছিল সরিতের কাছে।

সোজা কথায় সান্ন্যাল অমলকে ঘোরাতে আরম্ভ করে। যে টাকা পাবে, তাকে ঘোরাবার ও হয়রাণ করবার যত রকম কলাকৌশল জেনে রাখা দরকার, সান্ন্যাল সবই জানত।

যেমন, অমল যখন আসবে তখন সময় বুঝে স'রে পড়া অফিস থেকে। কি হয়রাণি, কি মনখারাপ, সময় মত খেয়েদেয়ে তাড়াতাড়ি ক'রে বেরিয়ে যখন যায় অমল, যত সময় মত যায়, দেখা আর কিছুতেই পায় না। দেখা হ'লে একথা সে কথায় আশল কথা এড়িয়ে যায়।

অমলের সামনে অন্য লোককে টাকা দেয় অথচ অমলকে বলে 'ওদের দরকার, ওরা হল নৌড়ি, তুমি ত' আর ওদের মত হাত ধুয়ে ব'সে নেই বাবা, ভাবছ কেন ?'

শেষে একদিন বলল 'সকাল সকাল এস ত অমল, কথা আছে। কথাটি ব'লে একটু হাসল। তাতেই অমলের ধারণা হয় নিশ্চয় সুসংবাদ দিতে চায় সান্ন্যাল দেখা করবার দিন ওর কাছে যেতে যেতে অমলের মনে হয় সান্ন্যাল নিশ্চয় দেরী করবার জন্যে ক্ষমা চাইবে, লজ্জা পাবে. কিন্তু তাতে কি, অমল কিছুই মনে করে নি।

সান্ন্যাল অবশ্য তার প্রত্যাশার মুখে থাপ্পড় মারল। কাছে বসিয়ে কফভর্তি গলায় স্পেশাল চা এবং টোস্ট আনতে বলে অমলকে এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য জানাল।

অমল ত' আকাশ থেকে পড়ল। প্রথমটা বলল 'ঠাট্টা করছ?' তারপর মনে হ'ল এমন নিদারুণ ঠাট্টাই বা করতে যাবে কেন সান্ন্যাল? সে খুবই ভেঙে পড়ে। বলে 'তুমি আমার কাছে টাকা চাইছ কেন? এক হাজার দূরের কথা একশো টাকার সংস্থানও আমার নেই তা ত' তোমায় বলেছি।'

সান্ন্যাল তার কথা বিশ্বাস করল, অমলের মুখের অভিব্যক্তিতে গলার স্বরে কোনও ভেজাল ছিল না, এবং তখনই, অমলকে সত্যিসত্যি কপর্দকশূন্য জেনে তার মুখের সকল আগ্রহ ফট ফট ক'রে নিভে গেল।

সেদিন থেকে সান্ন্যালের ব্যবহারে একটা নতুনত্ব দেখা গেল। অমলের নেহাৎ প্রয়োজন জেনে সে ইচ্ছে ক'রেই যন্ত্রণার জায়গায় আঘাত দিতে থাকে। অন্যলোককে বলে 'ওর ঠাকুর্দা না ওর বাপের ঠাকুর্দার নামে কলকাতায় ইস্কুল আছে অথচ ক'টা টাকার জন্যে ও কি করছে দেখেছেন? না অমল, তুমি টাকাটাকা ক'রেই গেলে।'

সান্ন্যাল কেন চটেছিল কে জানে! অমল ওকে নিজের সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা দেয়নি। কি দেখে ওর মনে হয়েছিল, অমলদের বেশ পয়সা কড়ি আছে কে জানে। আসল ব্যাপারটা আরো মজার, সে যেন ধরেই নিয়েছিল সে অমলের কাছে কি চায় অমল তা আগেই বুঝেছে। অমল যখন বলত 'আমার বাড়ীর অবস্থা কিছু না, একটি

পয়সা জমাননি বাবা, কিছুই রাখেননি' সান্যাল ধ'রে নিত কথাগুলো বানানো এবং প্রশ্রয় সহকারে শুনত। যেই জানল প্রত্যেকটা কথাই সত্যি, সেই তার মেজাজ নষ্ট হ'য়ে গেল, এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন অমল তাকে ঠকিয়েছে। সান্ন্যাল টাকা পয়সা দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে বেশ ঘোরাতে থাকল অমলকে। অমল তখন-ও জানেনা সংসারে এই হয়। ফর্সা জামাকাপড় হাঁকিয়ে গাড়ী চড়ে এলে মানুষ তাকে সেধে পাওনা টাকা দেয়। আর যার প্রয়োজন, যে দারিদ্রকে, দীনতাকে পোশাকআশাক ও লম্বালম্বা কথার চূণকাম দিয়ে ঢাকতে শেখেনি, তাকে শুধ্ ঘুরেঘুরেই মরতে হয়। পেটের ক্ষিদে কড়া চা ঢেলে নষ্ট ক'রে ন্যায্য পাওনা আদায় করবার জন্যে কেবলই ঘুরতে হয়।

ন্যায্য! হয়ত সে কথাটাও দেনেওয়ালারা মানেনা। অবস্থা এবং ভাগ্য যখন তোমাকে গরীব ক'রেছে, পকেটে বারোআনা পয়সা দিয়ে রাস্তায় বের ক'রে দিয়েছে, তখন আর তোমার ন্যায্য ব'লে কিছু থাকতে পারে না। সব কিছুই তোমায় ভিখিরীর মত চেয়ে নিতে হবে।

সান্ন্যালের কাছে পাওয়া সেই প্রথম টাকাটার কথা অমলের চিরদিন মনে থাকবে। দীর্ঘ কয়েক মাসের কঠোর পরিশ্রম বাবদ তিনশো, মাত্র তিনশো টাকা দিয়েছিল সান্ন্যাল। তা-ও চেকে, শনিবার বিকেলে। সামনে রবিবার, সোমবার কি কারণে ব্যাঙ্ক বন্ধ, ব'লে দিল 'যাওনা যাও, আমার বন্ধুর ব্যাঙ্ক, টাকা দেবে তোমায়।'

বোকার মত তাই অমল বিশ্বাস করে।

ঘুরে ঘুরে, কতক গলি ঘুঁজি কত চোরা রাস্তার পর সে বৌবাজারে অঞ্চলে কাঁচাছানার টক গন্ধ মাখা একটি কানাগলির দেওয়ালে সেই বনেদী কলকাতার ঐতিহ্যমণ্ডিত নামটি খুঁজে পায়, কেমন ক'রে সেই অস্বস্তি ও ঘেন্না লাগানো সরু রাস্তার দু'পাশের থুবড়ে পড়া দেওয়ালের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বারোর-একের-চারের-পাঁচ নম্বরটি দেখতে পায়, এবং কি আশ্চর্য, যদিও এতক্ষণ মাঝেমাঝেই মনে হয়েছে সান্ন্যাল ভাঁওতা মেরেছে তবু সে সংশয় ধুয়েমুছে যায় যখন দেখে ওর মধ্যেই শক্তপোক্ত

এক বনেদী চেহারার বাড়ী ব্যাঙ্কের নামলেখা ফলকের পেঁচপাগড়ী মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ী আছে, ব্যাঙ্ক আছে, কোলাপ্সিব্ল গেটের পেছনে নেপালী শান্ত্রী। নিখুঁত ছবি। শুধু দরজা জানালা বন্ধ।

দেখে অমলের পা-এর তলা শিরশির ক'রে উঠেছিল। বন্ধ, ব্যাঙ্ক বন্ধ। উঁকি মেরে সে কিছু জিগ্যেস করতে টরতে সাহস পায় না। আবার আসতে হ'বে, বাস বদলে, ট্রাম বদলে, পায়ে হেঁটে।

পরে গল্পটি বলতে সান্ন্যালের অফিসে পরিচিত পুলকের সে কি হাসি। হো হো হা হা, গড়িয়ে গড়িয়ে, 'সান্ন্যালদা সত্যি হাসাতে জানে, শনিবারে পাঠিয়ে দিলে পাঁচটার সময়ে' হেসে, দম আটকে থুথু ফেলে টেলে সে এক অস্থির কাণ্ড।

অবশ্যই অমলের হাসি পায়নি। ফেরবার সময়ে হাঁটতে হাঁটতে পায়ের গোড়ালির নিচটা কনকন করছিল। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে, মনের ভেতরে একটা বিশেষ ধরণের যন্ত্রণা, হঠাৎ ভোঁতা অস্ত্রের আঘাতে বা অতর্কিত ভাবে প'ড়েটড়ে গিয়ে থেঁতলে গেলে শরীরে যেমন লাগে, তেমনি। মন কি থেঁতলে যেতে পারে? সান্ন্যাল লোকটা এরকম করল কেন?

সেই চেক ভাঙিয়েই অমল বাড়ীতে রেডিও আনে।

শেষ অবধি আর দোকান টোকানে যাওয়া হয়নি। সরিৎ ব্যবস্থা ক'রে দেয়, নীতার দাদা পটল রেডিওটি তৈরী ক'রে দেয়। ক্যাবিনেটটি বড় সুন্দর, অথবা জীবনে প্রথম যে শৌখীন জিনিসটি আসে তা হয়ত' সকলের চোখেই সুন্দর লাগে। রেডিও, বইয়ের আলমারী অথবা টেবিল ল্যাম্প, সময় বিশেষে সে ভাললাগার প্রতি অন্ধ বিশ্বস্ততা জন্মে যায়। হাজার গুণ দামী রেডিও দেখেও কেন যেন অমলের মনে হ'ত কি সুন্দর, কি সুন্দর, তার ছোট্ট ব্যাটারী সেটটির যেন কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। পরে অবিশ্যি দেখেছে এরকম দুর্বলতা সব মানুষেরই থাকে,

অমলের এক কাকা যেমন স্ত্রী'র নিয়ত খোঁচানিতে অতিষ্ঠ হ'য়ে একটি সেকেণ্ডহ্যাণ্ড নিকেলের ওয়ালক্লক কিনেছিলেন চারটাকা দিয়ে। পরে যখন অবস্থা ফিরিয়ে বাড়ীঘরের ভোল পালটে ফেললেন, তখন আর কাকীমা সেই ঘড়িটিকে কিছুতেই নতুন ঘরে ঢুকতে দিতে রাজী নন। তা ছাড়া দেওয়ালে রাখবার কতরকম সুন্দর সুন্দর ঘড়ি পাওয়া যাচ্ছে তখন, তাঁর ভাইপো কিনে এনেছে একটা। (অধিকাংশ মেয়েদের মত এই কাকীমাটিও স্বামী বা দেওর বা শ্বশুরবাড়ীর লোকদের চেয়ে ভাই, ভাইপোদের রুচি ও মতামদের ওপর নির্ভর ক'রে স্বস্তি পান) কিন্তু অমলের কাকারও জেদ, 'ঐ ঘড়ির মত ঘড়ি কি আছে না কি? কি টাইম দেয়, কি শক্তপোক্ত ঘড়ি।'

এই ঘড়িটি নিয়ে তাঁদের বাড়ীরে কম অশান্তি হয়নি অথচ সেটি এমন পুরনো নয়, কাঠের বড় গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক, যার নিচে পেতলের পেণ্ডুলাম ঝোলে, সে জাতের ঘড়ি নয়। তাকে বনেদী জাতের ঘড়ির পর্যায়ে ফেলা যায় না। অতি সাধারণ ও গেরস্ত ঘরে মানানো ঘড়ি, শেষকালে সেটা কাকার ও সাংসারিক জ্ঞানবুদ্ধির অভাবের সাক্ষ্য হয়ে বাইরের ঘরের দেয়ালেই থেকে যায়।

তিনি অত সংসারী ও ঝানু লোক হয়েও যদি একটা ঘড়ির ব্যাপারে এমন সাধারণ দুর্বলতার পরিচয় দিয়ে থাকেন তবে অমল কি দোষ করল? রেডিওটিকে সে ভালবেসে ফেলে। যাঁর জন্যে, যাঁর কথা মনে ক'রে আনা তিনিও খুব খুসী হন। তবে হাতে সেলাই ক'রে ছিটের ঢাকনা পরিয়েই তাঁর কর্তব্য শেষ হয়। বসে শোনবার সময় বেশী হ'তনা। তবে বাড়ীতে যে এসেছে তাকেই বলতে ভোলেননি 'এই আমার সময় কাটে না ব'লে নিতু এনে দিলে।'

বাবাও সুযোগ পেলেই বাইরের লোকের কাছে বলেছেন 'না কাগজ আর নিত্যি পড়তে পারি কই? ঐ রেডিওটা খুলে খবরটা জেনে নিই। নিতু নিয়ে এল একটা, দিব্যি জিনিসটি, মনে হয় ঘরে ব'সে কথা কইছে।'

এরপরে অমল আর সান্ন্যালের কাছে যায় নি, এবং মনের দুঃখে, রাগে

ছোটখাটো একটি ওষুধ কোম্পানীর মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর কাজ জোগাড় ক'রে নেয়।

সে যে কাজের চেষ্টা করছে তা সরিৎকে বলেনি। সরিতের সঙ্গে কথা ব'লে সুখ হয় না আজকাল। সে কি সরিৎকে হিংসে করে?

বাবা অবশ্য তাকে বলেন 'আর কিছু না, মনটা স্থির ক'রে তুই বি. এ. টা পাশ ক'রে ফেল দেখি। কেমন চাকরী না হয়?'

এ কথার জবাবে অমল বেশ নীরস ও গম্ভীর গলায় বলে 'তার সময় হবে না, পরশু থেকে নতুন চাকরীতে যাচ্ছি।'

'চাকরী, মানে কোনো সার্ভিস টার্ভিস নাকি?'

'সার্ভিস কি গাছ থেকে পড়ে? একটা ওষুধ কোম্পানীর কাজ, নিজের চেষ্টায় ঐ যা হ'ল।'

'আহা, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ এর কাজ ত ভালই রে।'

'ভাল!'

'ভাল নয়? এখন সব কত রকম ফেসিলিটিজ, দিচ্ছে, প্রভিডেন্ট

'হ্যাঁ, প্রভিডেন্টফাণ্ড, গ্র্যাচুয়িটি, স্পেশাল বোনাস! সত্যি, মনে হয় কোনদিকে দুনিয়া যাচ্ছে তোমরা চোখচেয়ে দেখলেও বোঝ না।'

নিরীহ লোকটির সঙ্গে অমন রুক্ষ ব্যবহার কেন করতে গেল অমল কে জানে! বোধহয় বাবা তার সম্পর্কে আরো বেশী ভাবুন, তাই চাইছিল মনেমনে। বাবা যদি বলতেন 'না, তোমায় আর কিছুই করতে দেব না, 'তা হ'লে কি সে খুসী হ'ত? কিন্তু বাবার স্বভাবে যে অমন জোর দিয়ে কিছু বলার অভ্যেস নেই তাও ত সে জানত। তার মানে এই নয় যে বাবার মনের জোর নেই বা স্বকীয় মতামতের অভাব আছে। আসলে শান্তিপ্রিয় লোক তিনি, মানুষকে আঘাত দিয়ে কথা কইতে ভালবাসেন না। কিন্তু যে সব বিষয়ে মন স্থির করেন তার আর নড়চড় হবার জো নেই। মনের জোর না থাকলে কেউ দিনের পর দিন ঘুষের প্রলোভন এড়িয়ে চলতে পারে না।

অমলের বেলা তাঁর মতামত জোর ক'রে খাটালেন না কেন? বোধহয়, জলের দামে জমিটমি বেচবার পর তিনি মনে মনে টের পাচ্ছিলেন তাঁর চেনা পৃথিবী স্বভাব পালটে ভয়ানক ধূর্ত, লোভী এবং নির্মম হ'য়ে যাচ্ছে। তাঁর স্বকীয় জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে জলমাপতে গেলে সুবিধে হবেনা তাও বুঝেছিলেন। তাই নিজের ছেলেকেও ঘাঁটাননি। হয়ত' ভেবেছিলেন আমি ত' ওর কিছুই করতে পারছি না। নিজের চেষ্টায় যা হয় করছে তাতে বাধাদিই কেন? হয়ত' গভীরে ও গোপনে বিশ্বাস ছিল অমল অসৎ কিছু করবে না।

অবশ্য অমল এসব কথা অনেক পরে ভেবেছে। তখন তার মনে সব সময় ক্ষোভ এবং অশান্তি। সরিৎকে বলেনি ইচ্ছে ক'রেই। জানত সরিৎ মাঝেমাঝেই নীতাদের বাড়ী যায়। ইচ্ছে করলেই বলতে পারত, বলেনি।

সরিৎ এল একদিন দুপুরে। অমল চোখে হাত চাপা দিয়ে শুয়েছিল। দরজা খুলল, আবার বন্ধ হ'ল, বুঝল সরিৎ ঢুকেছে।

'আজকাল তোর দেখাই পাওয়া যায় না।'

'ব্যস্ত থাকি।'

'এখনো ব্যস্ত? আমি ত' ভাবলাম সে-সব পালা চুকেবুকে গেছে।'

'না ভাই। কিছু কিছু লোক থাকে ভাবনা তাদের সঙ্গ ছাড়ে না।'

'এবার অন্য ভাবনা ভাবতে চেষ্টা কর'

'যেমন?'

'পরীক্ষা দে।'

'কেন?'

'কেন! কেন কি রে!'

'না, ওসব আমার হবে না।'

'কি হবে?'

'চাকরী, চাকরী নিয়েছি বুঝলি? পঁচাত্তর টাকা মাইনে। আর কিছু জানতে চাস?'

গলার স্বরে যতদূর রুক্ষতা আনা সম্ভব সেটি এনে এবং প্রয়োগ ক'রে অমল খুশী হ'ল। মুখ থেকে হাত সরাল। সরিৎ আস্তে আস্তে ইজিচেয়ারে গিয়ে বসল।

'টাকা, টাকাচাই আমার। পাশক'রে বড়জোর কেরানীগিরি পাব।'

'অন্য কিছুও হতে পারতে।'

'না। কেননা সরিৎ, আমার ধরবার লোকনেই। আমি টাকা চাই।'

'কত টাকা ?' সরিতের গলায় প্রচ্ছন্ন কৌতুক।

' অনেক।'

উঠে পড়ল অমল। ঘরময় ঘনঘন পায়চারী করতে লাগল। তারপর কখনো বাঁহাত দিয়ে ডান হাতের তালুতে কিলমেরে কখনো ডান হাত দিয়ে বাঁহাতের তালুতে কিলমেরে জোরে জোরে কথা বলতে থাকে 'আমি ভালভাবে বাঁচতে চাই। সেজন্যে যদি বলি আমার অনেক অনেক টাকার দরকার ?'

'কেন ?' সরিৎ দু'হাত তুলে মাথার নিচে ভাঁজ ক'রে রেখে তাতে মাথা ঠেস দিল।

'কেননা আমার প্রয়োজনগুলো বড় জরুরী।'

'জরুরী অবস্থা !'

'হ্যাঁ, জরুরী অবস্থা। বাড়ীটা আদ্যোপান্ত সারিয়ে ফেলতে চাই, একটা অংশ ভাড়া দিলে সুখে শান্তিতে বাস করা যায়, বাবা মা-কে একটু আরাম দিতে চাই।'

'তুই নিজে ?'

'আমিও আর এমন টিকিয়ে টিকিয়ে মেপে মেপে চলতে পারছি না। আমার ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে ভাল ভাবে বাঁচতে।'

মনের ভাব সম্যক ভাবে না বোঝাতে পেরে বিরক্ত অমল খাটের বাজুতে ধা ক'রে ঘুষি মারে। ভালভাবে বাঁচা, নতুন বাড়ী, শাদা দেওয়াল, মেঝেতে কার্পেট, কার্পেটের ওপর দিয়ে অমলের ট্রাউজার ও

মোটাসোলের জুতো পরা পা এগিয়ে আসছে, পর্দা সরানো এবং কার্পেটের ঘন সবুজ রঙের ওপর লম্বা হ'য়ে উজ্জ্বল ও বনেদী রোদ বিছিয়ে আছে।

'চাকরীতে প্রসপেক্ট আছে বুঝি ?'

'চাকরীতে প্রসপেক্ট! না রা, সে-সব কিছু নয়। শেফালি স্নো, রিমুভাল ক্রীম, স্কিন অয়েণ্টমেণ্ট, লিভার টনিক, ছোট ফার্ম।'

'তবে ?'

'আহা, ব'সে থাকতে হ'ল না। ব'সে থাকতে পারছি না। এ লোকটা আমায় ঠকাল, ঠকাক। অভিজ্ঞতা হ'ল ত! পরে নিশ্চয় এরকম ভুল করব না।'

'পরে মানে ?'

'আমি কি এটা ধরেই প'ড়ে থাকব ? আজকাল, বুঝলি না, দেশ স্বাধীন হয়েছে। হাজারটা পথ খুলে যাচ্ছে। একটা না একটা কিছু করবই আমি।'

'পারবি না।'

'কি ?'

'পারবে না তুমি। টাকাপয়সা যার নেই তাকে অনেক তুখোড় হ'তে হয়। পারবে তুমি ? দেখলে ত' দিনে তিরিশ পেয়ালা চা খাওয়া, সিগারেট ফোঁকা আর বাজে বাজে লোকের সঙ্গে বস্তা বস্তা কথা বলা তোমার পোষাবে না। আসল কথা, পুঁজি নেই তোমার।'

'তোর ত আছে, ধার দে!'

'হ্যাঁ, টাকায় মরচে ধরছে আমার!'

সরিৎ একটু হাসল।

না, মরচে ধরবার মত টাকা ওর ছিলনা। তবে যেহেতু অমলের বাড়ীর চেয়ে ওর বাড়ীর অবস্থা অনেক ভাল, সেহেতু অমল ওকে চিরদিনই অবস্থাপন্ন মনে করেছে।

অবশ্য পরে বুঝেছে সেভাবে বিচার করতে গেলে সকলকেই ধনী এবং সমৃদ্ধ বলতে হয়. কেননা পৃথিবীর সকলেই কারো না কারো তুলনায় সুখী ও বিত্তবান, এমন কি কোমরের কপনিমাত্র সম্বল ক'রে পেটে চাপড় মেরে দামামা বাজিয়ে যে নিজের দীনহীন চেহারার পুঁজি ভাঙিয়ে পয়সা রোজগার করে, হাজরামোড়ের সে-ভিখিরীটিও ডালহৌসী স্কোয়্যারের উলঙ্গ শীতার্ত সেই রুগ্ন কিশোরটির তুলনায় স্বাস্থ্যে, বস্ত্রে, অবস্থায় বিত্তবান। শীতের হাওয়া থাকতে থাকতেই যে গাছটিতে পলাশ ফোটে, ডালহৌসী স্কোয়্যারের সেই গাছটির তলায় ছেলেটি একটু একটু করে মরেছিল একদা এবং আরো অনেক লোকের সঙ্গে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে অমলও তাকে মরতে দেখেছিল।

তেমন আহামরি নয়, তবু অমলের তুলনায় সরিৎ অবস্থা-পন্ন ঘরের ছেলে। ওর বাবা ভালকাজই করতেন। অনেকদিন আগে ঢোকেন, মার্চেন্ট অফিসের হেডক্লার্ক। 'টাইম ইজ মানি' খোদাইকরা রুপোর ভারী হাতঘড়িটি এখনো ওআর্ডরোবের দেরাজে বিশ্বস্তভাবে সময় দিয়ে যায়। চওড়া ও বিবর্ণ ব্যাণ্ডটি দেখে বোঝাযায় ভদ্রলোকের কব্জি বেশ চওড়া ছিল।

সরিতের দাদা তড়িৎ যখন এম. এ পড়ছে তখন তিনি মারা যান। পুরনো জাতবনেদী মার্চেন্ট অফিসের ধরণ-ধারণই আলাদা, উনি মরে যেতেই তড়িৎকে ওরা অফিসে ঢুকিয়ে নেয়।

'এম. এ. পড়ছিলাম, পড়তে দিলেনা' ব'লে তড়িৎ ক'দিন ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে বেড়ায় বটে, তবে পরে দিব্যি মন দিয়ে চাকরী করতে থাকল। তাড়াতাড়ি বউ ঘরে আনল, ছেলে হয়েছে দুটি। তিরিশ হ'তে না হতে এমন ভারিক্কি হয়ে গেল চালচলন যে দেখলে রীতিমত সম্ভ্রম হয়।

বিশ্বাস করাই কঠিন যে বি. এ. পড়বার সময়ে ঐ ছেলেই চেআরে জামা ঝুলিয়ে রেখে শিবরাত্তিরে সিনেমা দেখতে যেত বালীগঞ্জে, বাস না পেলে হেঁটে ফিরত এবং একবার ভোরবেলা চুপিচুপি ঢুকছিল, ধরা প'ড়ে ভয়-খেয়ে ব'লে ফেলেছিল 'অমলের বেজায় অসুখ, মানে পেটে ফিকব্যথা,

মানে !' হবি তো হ, সেদিনই একটু বাদে গাছের নটেডাঁটা একবোঝা সাইকেলের হাতলে বেঁধে অমল গিয়ে উপস্থিত।

সেই তড়িৎও কি তাড়াতাড়ি বদলে গেল। দাদা ভাল কাজ করে, বনিবনার অভাব নেই, কাজেই সরিতের আর ভাবনা কি ? অমলের মা'র কথায় 'যাদের ঘরে লক্ষ্মী আসে অমনি ক'রেই আসে। যেমন ছেলে দুটো, সংসারে মতি আছে, বউটি পেয়েছে ভাল, সরিতের মা'র হাতে হাতে সর্বদা সাহায্য করছে জোগাড় দিচ্ছে।'

তবু সরিতের কি ভাবনা। যেন সংসারের গুরুভারটি ওরই মাথায়।

অমল বলল 'টাকায় মরচে না পড়ুক, চলে ত' যাচ্ছে। তবু এমন ভাব করছিল যেন তোর দিকে সবাই হা-পিত্যেসে চেয়ে আছে কবে তুই রোজগার করবি।'

সরিৎ একটু হাসল। সুন্দর নিরভিমান হাসি 'সংসারে প্রয়োজন থাক না থাক আমি আমার কর্তব্য কেন করব না বল ?'

'করবি সময় এলে করবি।'

'সময় মনে করলেই সময়। তা ছাড়া এখন ত, আরেকটা দায়িত্ব আছে।'

'হ্যাঁ, আরেকটা পরিবারের দায়িত্ব।'

'নাঃ পরিবার নয়, একজনের দায়িত্ব। নীতাকে আমি বিয়ে করব।'

অমল অন্যমনস্ক ভাবে বলল 'তা ত বটেই।' তার গলায় বেশী উৎসাহ ফুটলনা। কি সাধারণ একটা মেয়ে অথচ তারও তাকেই ভাল লেগেছিল। সরিৎকে বলি বলি ক'রে সময় নিচ্ছিল নিজের কাছেই। যদিও মেয়েটিকে বলা হয়নি।

সে বোকার মত ধরে নিয়েছিল এ সব ব্যাপারে দেরী করলেও চলে। মেয়েটি নিশ্চয় বুঝতে পারছে এবং বললে পরেই লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেবে, মৌনে সম্মতি জানাবে। দেখাগেল অমলের হিসেবে গলদ ছিল। অবশ্য নীতার দিক থেকে ভেবে দেখলে সরিৎকে বিয়ে করলে ও বেঁচে·

যাবে। কিন্তু সরিৎ! শেষ অবধি.পটলমিস্তিরির বোন ও বাড়ির বউ হবে?

সরিৎ যেন তার মনের কথা বুঝেই জবাব দিল 'অবস্থা নেই তবে এমন অমানুষ বলতে পারি না। বোনদুটোকে দেখেশোনে।'

'ওর দিদির কি হবে? কিছু উন্নতি টুন্নতি হ'ল!'

'নাঃ, হবে বলে মনে হয় না'

'বাইরে কোথাও দিনে হয় না?'

'ওরাই দিতে চায়না। বলে বাইরে দিলে কি! প্রচুর পয়সা না ঢালতে পারলে রুগীরা যত্নআত্তি পায় না। বাড়ীতে থাকলে তবু দেখাশোনা হয়, খাওয়াদাওয়া জামাকাপড়ের যত্ন পায়। আর বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া মানে যেন চিরকালের মত ওকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া।'

সে কথা সত্যি, যদিও মানুষ তা ভাবে না। শুভ হোক এই কামনায় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার পরও মানুষ বদলে যায়। যেমন পুলক বদলে গিয়েছিল। অনেক টাকাপয়সা নিয়ে একটি মেয়েকে বিয়ে করে। বিয়ের পর না কি ছ মাস ধ'রে পুলক বউয়ের প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছিল। সেই ভালবাসার মানসীর যখন বুকের দোষ জানাগেল, তখন তাকে যাদবপুরে দেবার সময়েও তার শুভ ইচ্ছার অন্ত ছিলনা। গলদশ্রু হ'য়ে বলেছিল 'যতদিন না তুমি সেরে ওঠ···।'

মানসী পুলকের ধৈর্য অনুযায়ী তাড়াতাড়ি সারেনি। তারপর পুলক খুব তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করল চড়াই-এ ওঠবার মুখে একটি স্ত্রী থাকা একান্ত প্রয়োজন। 'ম্যারেজ ইজ অ্যান ইনস্টটিউশান জানলে অমলদা!' চপ্ চপ্ করে মাছের মুড়ো চিবোবার শব্দে বলেছিল পুলক।

'তোমার প্রথমার কি করলে?'

'বোলনা ভাই. যা ট্রাব্ল দিচ্ছে না!' পুলক নিজের দুঃখে বিগলিত হয়ে বলে 'কি যে করি।'

কিছুই করেনি পুলক। দিব্যি একটি বিয়ে করে সংসার ফেঁদে ব'সে। সম্ভবতঃ সেই দুঃসংবাদেই মানসীর অসুখটা সারতে গিয়েও

সায়ে মা। অমল জানে যাদবপুরে ভাইদের পাঠানো টাকায় রিজার্ভ করা লোহার খাটে শুয়ে শুয়ে মানসী প্রায়ই পুলককে একবারটি দেখতে আসতে অনুরোধ করত, মৃত্যুকাল পর্যন্ত। 'কি করে পুলকের ওপর ওর সেন্টিমেণ্ট টিকেছিল বল্‌দেখি?'

তার প্রশ্নের জবাবে সরিৎ একটু চুপ করে ভেবেছিল। তারপর আস্তে বলে 'ঠিক সে মহিলা ছাড়া অন্যকেউ বোঝা কঠিন। তবে এ ত নতুন নয়। চতুরঙ্গের ননীবালা ত শচীশের দাদাকে ভুলতে পারেনি বলেই মরল।'

অমল সেদিন চুপ করে যায়। কোনদিন চোখে না দেখা মেয়েটি সম্পর্কে তার মনে কোথায় যেন একটি গভীর বেদনার স্থান আছে। পুলক বলেছিল 'প্রথম যখন হাঁসপাতালে দেব স্থির করলাম, তখন, জানলে অমলদা মানসীর সে কি কান্না। বোধহয় বুঝেছিল আর ফিরে আসবে না, সত্যি ভাবলে এক একসময়ে ভারী খারাপ লাগে।'

মানসীর মৃত্যুর পর তার সম্পর্কে পুলক মাঝেমাঝে ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ত বৈ কি! অথচ হাঁসপাতাল থেকে সে যে চিঠিগুলো লিখত তা পুলক সবসময়ে খুলেও দেখেনি, যদি বীজাণু লেগেই থাকে, বলা ত যায় না।

সরিতের কাছে পটলের কথা শুনে তার ভালই লাগল। যাক পটলের মনুষ্যত্ব আছে। হাসিকে হাঁসপাতালে দেয়নি। তেমন বাড়াবাড়ি যখন হচ্ছে না, এমন উৎপাত যখন নেই, তখন বাড়ীতে থাকলেই শান্তি। বাইরে কি কেউ অমন যত্নে হাসির মন বুঝবে?

সরিৎ বলল 'মানুষের সম্পর্কে ভগবানের কি আশ্চর্য খামখেয়ালী দেখ্, ঐ মেয়েটিকেই রূপটুপ দিয়ে গড়েছেন, অথচ ওরই ভাগ্যে ছাই পড়ল।'

একটু চুপ করে কি যেন ভেবে নিয়ে বলল 'জানিস, সেদিন আমায় বলছিল ওর দাদা, হাসি নাকি মাঝেমাঝে সুধোয় হ্যাঁ দাদা, আমার বিয়ে হবে না, আমার বিয়ে দেবে না তুমি?'

'তা আর আশ্চর্য কি !'

'যা হয়, একেবারে শিশুর মত ত' মনের ভাবচেপে রাখতে জানেনা, সাজব গুজব বিয়ে হবে এসব নিয়েই আছে। অথচ এক এক সময়ে দয়াও হয়। সেদিন যেমন ওর বউদির হাত থেকে ঘড়া কেড়ে নিয়ে কল থেকে জল তুলছে, আমার ঠোঁটে হাত রেখে বলল গোল করে না, নীতা পড়াতে বসেছে ছোট গুলোকে। আমি বললাম, বা, আমি বুঝি শুধুই গোল করি ? ও বলল কর না ? তোমার সাড়া পেলেই যে ছোট গুলো ছুটে আসে, নিত্য ওদের জন্যে কি কি আন আমি জানিনা বুঝি ?'

'যাক, বোঝাগেল তুই ওদের নিয়ে খুবই জড়িয়ে পড়েছিস।'

'হ্যাঁ, সে জন্যেই তা আমার পক্ষে কোন চান্স নেওয়া সম্ভব নয়।'

'কিন্তু আমি চান্স নেব।'

বসল অমল, বুকের ওপর হাত আড়াআড়ি করে রাখল 'দৃষ্টিটাকে বড় কর্ সরিৎ, এখন আর সে যুগ নেই। জানিস আমাদের কসবার বাড়ীর পাশে গাঙ্গুলীরা থাকে। তিনটে ছেলে, তিনটেই অজমূর্খ, কি সব হাতের কাজটাজ জানে তাই করেই চালাত। কেমন করে যেন কারখানায় অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে ঢুকল, একটা একটা করে তিনটেই লীডস গ্লাসগো, এডিনবরা ঘুরে এল। এখন দিব্যি হাঁকিয়ে চাকরি করছে জেসপ বার্ণ বড়বড় কোম্পানীতে।'

'তোর কথাও অস্বীকার করা যায় না, যুক্তি আছে।'

'তুমি দেখে নিও সরিৎ' আমি কিছু একটা করবই।'

উৎসাহভরে অমল চেঁচিয়ে উঠল। দরজার ওপাশে লম্বা একটি ছায়া পড়ল, মা উঁকি দিয়ে দেখে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। বন্ধুর দিকে চেয়ে অমল গায়ে জামা চড়াতে থাকল 'চল্ একটু ঘুরে আসা যাক।'

॥ সাত ॥

কয়েকটা বছর মাত্র গেল।

অমল বলেছিল কিছু একটা করবে এবং সে প্রাণপণে চেষ্টা করে। এ কাজ ছেড়ে ও কাজ, এ ব্যবসা থেকে ও ব্যবসা। ক'বছর বাদে সে একটি লোকের সঙ্গে ভিড়ে পড়ে। পুলক তাকে নিয়ে গিয়েছিল। লোকটির সঙ্গে অমল ছাপাকাপড়ের দোকান খোলে। এ কাজের জন্যে পরে ভাবতে কি লজ্জাই পেয়েছে সে, বাবার চেনা একটি লোকের কাছ থেকে টাকা ধারকরে।

এই ক'টা বছর, চার কি পাঁচ, সে কি করেছে ভাবতে গেলে পরে মাথা গুলিয়ে যেত। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ত এখানে একসময়ে দিনের পর দিন এসেছে ছোটখাটো একটি কাঠ চেরাই-এর কারখানা লীজ নেবে বলে। চা-এর দোকানে বসে চেনা চেনা মুখ দেখে অনেক চেষ্টায় তবে মনে পড়ত বোধহয় ইনিই তাকে ইনসিওরেন্সের সেই লোকটির কাছে নিয়ে যান যিনি তাকে বিহারে পাঠাবেন, পেট্রোল পাম্পের ভার দেবেন বলে ঘনঘন প্রলোভন দেখাতেন।

যেন একসময়ে সে নেশার ঘোরে হট্টগোল, হইচই-এ মথিত বহু মানুষের সমাগমে মুখর ও ব্যস্ত একটা মেলার মধ্যে রাতভোর ঘুরেছে, পরে চেষ্টা করলেও সব মনে পড়েনা। মানুষের মাথা, মুখ, পথ, দোকান সব টুকরো টুকরো মনে পড়ে, জোড়া দিয়ে সম্পূর্ণ একটা ছবি আর কিছুতেই করা যায় না।

পুলক এ সময়টা ঘনঘন এসেছে।

মাঝেমাঝেই আসত। পরাজিত ও শ্রান্ত অমল যখন বাড়ীতে বসে আছ তখনই আসত। মাঝে একটি ছেলের সঙ্গে অমল বিলেতী বই-এর

ব্যবসা করতে যায়। ছেলেটিকে ভাল বলতে হবে, ব্যবসা ফেল করবার পর 'ভাই অমল, তোমাকে ত কিছুই দিতে পারলামনা, বইগুলো নাও, বলে শ পাঁচেক টাকার বই রেখে যায়।

অমলও মাঝেমাঝে হাতে টাকাপয়সা পেলেই কখনো পর্দা কিনেছে, আবার ঘর চূণকাম করবার পয়সা থাকে নি, ময়লা ঘরে নতুন পর্দা ঝুলেঝুলে ময়লা হয়েছে। আবার কখনো বেতের মোড়া কিনে এনেছে, হালকা চেআর। একটা বিশ্রী বেটপ আলমারী একসময় কি মনে ক'রে এনেছিল। বইগুলো তাতেই সাজিয়ে ফেলে। মাঝে- মাঝেই মনের দুঃখে সংকল্প নিত আর নয়, যেমন করে হোক সামান্য কিছু মাসান্তে আয়ের ব্যবস্থাকরব, আর ঘরে ব'সে বই পড়ব। খুব উলটেপালটে দেখত বইগুলো। পুলক একদিন এখানেই এসে উপস্থিত 'এই অমলদা' দাওনা, আর্টিকেল লেখে দাও।'

আর্টিকেল লেখে দাও, অমুক লোকটা গান গেতে পারে না. পুঙ্খ্পুঙ্খ বলছি তোমায়, পূর্বত্তী কথা ত' আপনারা শুনলেন, এই ছিল তার মুখের বুলি। কিছুতেই উচ্চারণ শুদ্ধ হবেনা। যেমন ইংরেজী তেমনি বাংলা, কথা কইতে গেলে থুথু ছেটে অথচ বিদ্বান ও শিক্ষিত ব'লে পরিচিত হবার জন্য কি আকুলআকাঙ্ক্ষা।

'ওর স্বভাবের অনেক বিচ্যুতির জন্যে অমলের ভয়ানক রাগ হ'ত কিন্তু করুণ মুখচোখ ক'রে ও যখন ফোঁৎ ফোঁৎ ক'রে চোখের জল ফেলত, বলত 'জানি জানি' আমার কালচার নেই, শিক্ষা দীক্ষা নেই, তাই সবাই আমায় ঘেন্না করে, তুমিও কর। করবেই ত' তুমি হ'লে কত উচ্চশিক্ষিত, থাক ভাই তোমাকে আর বিরক্ত করব না।'

এমন মুক্তকণ্ঠে নিজের সব দৈন্য স্বীকার করবার অভ্যাস অমল আর কারো মধ্যে দেখেনি। তাই ওর বড় বড় দোষত্রুটির কথা জানলেও, ঐ স্বভাবটির জন্যে ওকে ক্ষমা না ক'রে পারেনি। সরিৎ বলত,' কি দেখে ওকে সহ্য কর জানি না।'

'বোকা, অশিক্ষিত' তবে ছেলেটা আমায় খুব ইয়ে করে।'

'ভুল। আমার ত' মনে হয় ওর দরকারে ও তোমার সঙ্গে মিশছে দরকার ফুরলেই হাত ধুয়ে ফেলবে।'

'আমাকে দিয়ে ওর কোন রাজকার্যটা সিদ্ধ হচ্ছে ?'

'কি ক'রে বলব! আমার কিন্তু কেন যেন ওকে ভাললাগে না' বেশ কিছুদিন বাদে সরিৎ যখন পুলকের প্রথম বিয়ে এবং মানসীর মৃত্যুর কথা জানে তখন অমলের ওপর কি চটেই না উঠেছিল।

'জানবার পরও তুই ওকে সহ্য করেছিস ?'

'তখন নিজের দরকারেই যেতাম, টাকাগুলো আদায় করব বলে।'

'আমি যদি বিচারক হতাম' বুঝলি অমল, তবে ওর সঙ্গে সঙ্গে তোকেও শাস্তি দিতাম।'

'কেন ?'

'যে অন্যায় করে তাকে সহ্য করা মানেই পাপের ভাগী হওয়া।'

'কোন আইনে বলে ?'

'কোনো আইনেই যে বলে না, তাই ত' চারদিকে এমন করে ওরা বেড়ে ওঠবার সুযোগ পায়। আমার হাতে ভার থাকলে আমি আইন গড়ে নিতাম।'

'আমি কি আর সবটা বুঝেছি !'

না, অমল বোঝেনি। তবে বোঝা উচিত ছিল। যে সব কথাবার্তা বলত পুলক, তা কানে শুনলে মনে হত বটে, কি সরল ছেলেটি, অথচ, ভেবে দেখবার কথা, তার আড়ালেই কি ওর আসল সত্তা উঁকিঝুঁকি দিত না ?

দাও অমলদা, ট্রাফিকের ভিড় কিভাবে কণ্ট্রোল করা যায় তার ওপর আর্টিকেল লেখে দাও।

অমলও লিখে দিত। জিগ্যেস করত 'কি, করবে কি ?'

'জামাইবাবুর কাগজে ছাপব।'

'তাতে কি হবে ?'

'নাম' নাম করতে হবে বুঝছনা ? যেমন করে হোক নাম চাই।

লোকে শুধু তাকে মনে রাখে যার নাম হু'বেলা শোনা যাচ্ছে।'

'কি রকম ?'

'আহা বুঝছ না কেন ? আমার নামটা মাঝেমাঝেই কাগজে বেরুনো দরকার। বেরুতে বেরুতে দেখবে আমি দাঁড়িয়ে গেছি।'

'তবে নাম করগে যাও। দেখছনা কাগজে কাদের নাম নিত্যি বড় হরফে বেরোয় ?'

'ঠাট্টা করছ ?'

'যেমন তেমন ক'রে নাম করতে হ'লে তাই করগে যাও, কাগজে লেখার নেশা কেন ?'

'আহা তা কি করিনি ?' পুলক রীতিমত মিইয়ে পড়ত 'দেখনা, গোকুল দত্ত আমাকে চাকরী দেবে চাকরী দেবে বলে ইলেকশনের সময়ে কি ভাবে না খাটিয়ে নিল। নিজে ত' দিব্যি অতবড় চেআরটি বাগালে। আমার চাকরী দূরস্থান, কাগজে একটু নামটা দিলে না ? যতবার ছবি বেরুল সব নিজের ?'

'তবে নামের পেছনেই ছুটে বেড়াও, কাগজে লেখবার নেশা কেন ?'
'আহা নামটা বেরুবে, তা ছাড়া জানলে ফিলিম দেখে দেখে রিপোর্টারের কাজের ওপর ভারী ফ্যান্সী এসে গেছে আমার।'

উৎসাহিত হ'য়ে টেবিল চাপড়ে চেঁচিয়ে পুলক বলত 'দেখে নিও। এ যুগে যার পেছনে পাবলিসিটি নেই তার কিছু হবে না। ভাবলে দুঃখ হয় ভাই, নইলে এ কথা ত' মিছে নয় যে একটি ভ্যাকান্সী হলে আমার মত পাঁটা তবু চান্স পাবে কিন্তু তোমার মত বুদ্ধি বিদ্যের জাহাজ কোন পাত্তাই পাবে না।'

'আমি তোমার সঙ্গে হারজিতের লড়াইয়ে নামছি না পুলক।'
'চটে যাচ্ছ ? কিন্তু আমি সত্যি বলছি বলছি, দেশসেবক, পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বান যেই হও না বাবু, মানুষ তোমার নাম দুদিন চোখে না ভুলে বসে থাকবে এ নিশ্চয় জেন।'

পরে অমল দেখেছে পুলক নেহাৎ মিছে কথা বলত না। যথেষ্ট

পাটোয়ারী বুদ্ধি ছিল তার। আরো মূলধন ছিল মোটা চামড়া। নীতি-হীনতা, অশিক্ষা, বর্বরের মত কেড়েকুড়ে নিয়ে সুখভোগ করবার অভ্যাস, আজকাল এসব ভাঙিয়ে দ্রুত ওপরে ওঠা যায়। অবশ্য পুলকের সমগ্র রূপ দেখতে অমলের বেশ সময় লেগেছে। আগে এবং পরেও কতদিন অবধি মনে হত স্থূল প্রকৃতির, একটু ভোগপ্রিয়, নইলে ভয়ঙ্কর কোন দোষ বোধ হয় ওর মধ্যে নেই অথচ পরে দেখল কি ভুলই করেছিল। যাদের দেখলে মনে হয় চেনা এমন সোজা, তাদের চেনা এত কঠিন।

নইলে কিছুদিন বাদে পুলক তার ঘরে অমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা উঁচু করে ঢুকবে কেন?

অমল বই পড়ছিল। পুলক ঢুকল এবং চেআরে বসে বিনা ভূমিকায় বলল 'শুনে হয়ত' আশ্চর্য হবে, কিন্তু চাকরীটা আমি পেয়ে গেলাম।'

অমলের বই-এর আলমারীর দিকে চেয়ে বলল 'নিজের জন্যে ডিক্সনারী গোটাকয়েক কিনব, দরকার হবে।'

'কি ব্যাপার?'

'রাঙা জামাইবাবুদের কাগজেই ঢুকলাম। আমার টুকরো টুকরো লেখাগুলোর অর্থাৎ তোমার লেখাগুলোর খুব প্রশংসা হয়। তুমি খুব হেল্‌প করলে ভাই!'

পুলক একটু ভাবতদ্‌গত হ'য়ে চেয়ে থাকল।

অমল খুসীই হয়। পরে অবশ্য অমলের সামনেই পুলক অন্যদের বলত 'লিখিনি কি! কোন বিষয়টা নিয়ে লিখিনি? টাউন প্ল্যানিং সুবার্বান স্কীম, স্টেডিয়াম, টেগোর মেমোরিয়াল, সব নিয়ে লিখেছি হে। সে একটা সময় গেছে।'

তখন পুলকের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে এক সময়ে সেগুলো ও-ই লিখেছে এবং এ বিশ্বাস এমনই দৃঢ় যে অমল কিছু বললেও লাভ হত না।

প্রথম যেদিন পুলকের মুখে ও শোনে 'আমিইত লিখেছি। একা। কি কষ্ট করে,' সেদিন অমলের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। বেরিয়ে এসে ফুটপাথের লাইটপোস্ট ধরে ও নিজেকে সামলায়। মাথা নিচু ক'রে চোখ বুজে ছিল চোখের সামনে লালনীল রঙের চরকি বাজী পুড়তে পুড়তে ঘুরছিল। তা দেখে পথচারীরা সকৌতুকে তাকায় এবং ওর এক জ্ঞাতিকাকা, বাস থেকে নেমে কি হয়েছে, অসুস্থ না কি, জিগ্যেস না না করা পর্যন্ত অমল জানতেই পারেনি তাকে দেখে কি ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছিল সবায়ের।

চাকরীর পর বিয়ে। বরাত আর কাকে বলে, দ্বিতীয় বিয়ের বেলাতেও টাকাপয়সা শুদ্ধ নির্বোধ একটি সুন্দরী মেয়ে পাওয়া গেল। যে সব মেয়েদের পুলকদের মত ছেলেদের বউ হবে ব'লেই হয়ত বিধাতা সৃষ্টি করেন। তারপর বরাত জোরে আরো উন্নতি। চাকরীর কল্যাণে বাইরে ঘুরেটুরে এল এবং কাগজে ফলাও ক'রে কে ওকে বলেছিল তুমি টাগোরের দেশের লোক, জেনেভার হ্রদ দেখে ওর মনে কি ভাবোচ্ছ্বাস হয়েছিল সব লিখে ফেলল পুলক।

তবু প্রয়োজন হলেই অমলের দ্বারস্থ হ'য়েছে ও। একদিন অমলের কাছে এসে ও হাঁটু জড়িয়ে ধরে আগেকার মত 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে ফোঁৎ ফোঁৎ করে কাঁদে।

তারপর, পুলকের জন্যে জোজো সিংহের সঙ্গে অমলের পরিচয়।

॥ আট ॥

'অমলদা, আমায় বাঁচাও ভাই'। পুলক বলেছিল।

সিগারেটে ঘনঘন টান দিচ্ছিল পুলক। মাঝে আরো ক'টি বছর কেটেছে। পুলকের শরীরে প্রচুর মাংস লেগেছে, বুড়ো কুমোররা যেমন মাটি মেখে ছুঁড়ে ছুঁড়ে একজায়গায় রাখে, তেমনি ক'রে কে যেন থাবা থাবা মাংস ওর শরীরে ছুঁড়ে মেরেছে। অন্য সময়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরে খদ্দরের, কাঁধে রাখে পাড় দেওয়া চাদর। যে হেতু সন্ধেবেলা সে হেতু কাঁচামাংস রঙএর গোলাপী রঙের চকচকে কাপড়ের স্যুট পরণে।

এসব কাপড়ে না কি সহজে ভাঁজ পড়েনা, যাহোক অসভ্যের মত দেখাচ্ছে, মাংসল মুখ থরথর ক'রে কাঁপছে, তেলমাখা চকচকে চুলে কেয়ারি। ঠিক যেন হেআরফুডের বিজ্ঞাপনে পুরুষ মানুষের চেহারা। রুচি জন্মায় রক্তে, প্রতিপালিত হয় প্রতিবেশ ও শিক্ষার প্রভাবে। পুলকের ভালরুচি জন্মাবার কোন কারণই ঘটেনি এবং বিপদে পড়ে তাকে নেহাৎ সিনেমার ভাঁড়ের মত বিশ্রী দেখাচ্ছিল। সস্তা সিনেমা অথবা দেশী সার্কাসের ভাঁড় যেমন, যাকে শরীরের যেখানে মার না কেন, ঠাসঠাস ফটফট শব্দ হয়।

'কি হয়েছে?' অমল ভয় পায়।

তখন অমলের কি করুণ অবস্থা। ছাপাকাপড়ের দোকানে তখনো টিকে থাকতে পেরেছে, মাসে মাসে কিছু টাকা নিয়ে যায়, এটুকুই যেন তার অনেকচেষ্টায় অর্জিত, এবং কোনরকম উলটো বাতাসের ঝাপটা লাগতে দিতে সে নারাজ।

কোনরকম হইচই-এ ভিড়তেও তার বিশেষ আপত্তি। অন্যলোক এসে হুড়মুড়িয়ে পড়বে, নিজেদের সুখ অথবা দুঃখ, আনন্দ অথবা যন্ত্রণার স্রোত বইয়ে দিয়ে ভাসিয়ে দেবে অমলকে আর জলের মুখে

পিঁপড়ের মত অসহায় ভাবে ভেসে চলতে অমল একেবারেই রাজী নয়।

পুলককে দেখেই সে ভয় পেয়ে যায়। হয়ত একটা কাণ্ড বাধিয়ে এসেছে, এখন হয় ওর কথা শোন, নয় ওর সঙ্গে ছুটোছুটি ক'রে মর।

পুলক তার প্রশ্নের জবাবে গড়গড়িয়ে ব'লে যায়। একটি মেয়ে, বয়স আঠারো হতে পারে, কুড়িও হতে পারে 'এক ফ্রেণ্ডের বাড়ীতে দেখে বুঝলে, খুব ভাল লেগে গিয়েছিল।'

'তারপর ?'

'তারপর যা হয়।' পুলক হাতের তালু চিৎ ক'রে ধরল। যেন স্ফীত, লালচে হাতের তালুতে সব লেখা আছে এবং সামুদ্রিক বিদ্যায় পারদর্শী অমল সব প'ড়ে নিক, পুলককে দিয়ে আর পাপ কথাগুলো বলানো কেন ?

জানাগেল একটি স্ত্রীর মৃত্যু, আর একজনের অনুরক্তি, কিছুই পুলকচন্দ্রকে সুখের পেছনে ধেয়ে বেড়াবার অভ্যাস থেকে নিরস্ত করতে পারেনি। ঐ শখের নেশাটির জন্যে তাকে অনেক নাকাল হ'তে হয়েছে বটে ! তবুও !

'অনেক ঠকলাম তবুও শিখলাম না' পুলক ঘাম ভেজা হাত দিয়ে অমলের হাতের তালুতে চাপ দেয়।

'ন্যাকামি না ক'রে বলেই ফেল।'

মাঝেমাঝে আনন্দ করতে ইচ্ছে হ'ত তাই পুলক মেয়েটিকে মিছে কথা বলেছে। ইচ্ছে হ'লেই তাকে চাকরীতে ঢুকিয়ে দিতে পারে হ্যানো ত্যানো।

'বল ত, ভাই আমি কি চাকরী দেবার ক্ষমতা রাখি ?'

'তবে বলতে কেন ?'

'এই লোকে যে রকম বলে আর কি ! বিশেষ ভেবে চিন্তে বলি নি। কে জানত মেয়েটা ঠাট্টা বোঝে না।'

তাকে নিয়ে পুলক এখানে সেখানে ঘুরেছে 'যেমন ঘোরে আর কি, হোটেলে, ময়দানে, থিয়েটার সিনেমায়।'

'তারপর ?'

'তারপর এখন মেয়েটা কোথাথেকে তার দাদাকে হাজির করেছে। গোঁয়ার গোবিন্দ অসভ্য একটা লোক, রাস্তায় গেঞ্জী বিক্রী করে, ছি ছি, অথচ মেয়েটা বলেছিল সে ভদ্রঘরের মেয়ে।'

কিসে পুলক অপমানিত বোধ করেছে বোঝা যায় না। মেয়েটির দাদা যেহেতু গেঞ্জী বিক্রী করে সেহেতু পুলকের সম্মানে ঘা লেগেছে ? খানিকটা সস্তা ফূর্তি করবার জন্যেই যাকে প্রয়োজন তাকেও ভদ্রঘরের মেয়ে হ'তে হবে নইলে পুলকদের সম্মানে ভয়ানক ঘা লাগবে, সাবধান।

'তারপর লোকটা এখন টাকা পয়সা চাইছে। সোজাসুজি ব্ল্যাকমেল, বলছে নইলে আপনার বাড়ীতে গিয়ে হল্লা করব। কি অসভ্য কথাবার্তা, বলে কি মশায়, আজকাল একটা রুমাল কিনলে সাড়ে ছ'আনা পয়সা দিতে হয়। একটা জলজ্যান্ত মেয়েকে নিয়ে এত ঘুরলেন তা দাম দেবেন না ? ছি ছি !'

পুলক আবার ম্রিয়মাণ হয়, বলে 'ছিঃ, তোর বোন হয় না ?'

খুবই আহত ও ক্ষুণ্ণ হয়েছে পুলক 'শেষে বলছে মশায়, আমি ভদ্রতা বুঝি না। জেলপুলিশের ভয়টয় নেই। আপনার অফিসে গিয়ে বলব সবাইকে, শেষে নাকটি কেটে নেব আপনার, চিরদিন মনে থাকবে। রীতিমত গুণ্ডা। তা লোকটা বলে গুণ্ডা, দাঙ্গাবাজ নোংরা লোক ছাড়া আপনাদের শায়েস্তা করবে কে ?'

'তার বোনকে ভাঁওতা দিয়েছ কেন ?'

'আহা লোকে যে রকম বলে···'

'লোকে কি এইরকমই বলছে না কি আজকাল পুলক ? আমার কোন ধারণাই নেই।' অমল আর নিজেকে শাসনে রাখতে পারে না। 'লোকে কি কাজ দেবার ক্ষমতা নেই জেনেশুনেও কাজ দেব বলে ?

একটা মেয়েকে মিথ্যে আশায় ভুলিয়ে তাকে নিয়ে হোটেলে এবং ময়দানে ঘুরবার মানেই বা কি?'

'কে জানে বল মেয়েটা সব কিছু সিরিআসলি নেবে?'

নিজের আচরণের জন্য কোন লজ্জা সঙ্কোচের ভাণ পর্যন্ত নেই। দোষ সেই মেয়েটির, যে একটি চাকরী পাবার আশায় পুলকের সঙ্গে হাটে ঘাটে মাঠে বাটে ঘুরে ঘুরে নিজের দাম কেবল কমাতে থাকে। দোষ সেই ছেলেটির যে পথেঘাটে গেঞ্জী ফিরি করবার অবস্থায় নেমে গেছে কোণঠাসা হ'য়ে জায়গা ছাড়তে ছাড়তে, তবু পুলকের নাককেটে নেবার, অপদস্থ করবার ইচ্ছে ঘোষণা করে চলে।

চোখ থাকলে অমল তখনই পুলকের মাথার চারিপাশে কিরণচ্ছটা দেখতে পেত। বড় হবার লক্ষণ। নিজের সকল অন্যায়কে পতাকার মত উড়িয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে চলে যাও, জাগতিক উন্নতি হবেই হবে।

ঘেন্নার চেয়েও দুঃখ হল বেশী। এ অমলের এক অশেষ দুর্বলতা। মানুষের দুর্বলতা দেখে, বিচ্যুতি দেখে ঘেন্না হবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ হয়। মানুষ কেন এমন ক'রে নীচে নামছে?

সম্ভবতঃ বাবার সেই স্বভাবটির পরিবর্তিত চেহারা অমলের এই দুঃখ বোধ, যে স্বভাবের বশে বাবা পথে পানের পিচ ফেলতেন না, বাঁ পাশ ধরে হাঁটতেন, বাসট্রামে টিকিট ফাঁকি দিতেন না এবং কিউ চালু হলে সবার আগে তিনি গিয়ে কিউ-এ দাঁড়াতেন। বহুজনই এসব করে না। নিজের স্বভাবও অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে না। দেখে দুঃখ পেতেন তিনি, তাই সতর্ক থেকেছেন সর্বদা।

'কই' কিছু বলছ না ত?' পুলক ভীত চোখে তাকাল।

'ছিঃ পুলক, তুমি ভদ্রলোকের ছেলে?'

'যা বলবে সব শুনবরে ভাই, নাকে কানে খৎ দেব দরকার হলে। এখন কিছু টাকা খসিয়ে বাঁচাও দেখি।'

'টাকা? আমার কাছে? আবার টাকা চাইছ?' বলতে যাচ্ছিল অমল, বলল না। মৃদু নিশ্বাস ফেলল। নিজের অবস্থা যত ভালই

হোকনা কেন, বন্ধুবান্ধব চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকুক, পুলক অমলের কাছেই আসবে। কাদারমত লেপটে লেপটে ও অমলের জীবনে জড়িয়েই রইল। মহাজ্বালা, পা ছুঁড়লেই ফেলে দেওয়া যায় না।

'আহা, বাড়ীতে গিন্নী সব হিসেব রাখে জানলে? কি পাই কত পাই সব জানে। তারপর জামাইবাবুর কাগজ, অফিসে ধারধোর চলে না। ওনার প্রেস্টিজ আছে ত? এদিকে কি বলব রে ভাই...'

গলদশ্রুলোচন পুলক নিজের দুঃখের কথা আউড়ে যেতে থাকে। চোখে চিকচিকে জল, মুখে থাবা থাবা মাংস ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, এখন কাঁপছে। কালো ঘেঁষা বাদামী রঙের ওপর চকচকে পালিশ করা চামড়া, গোলাপী স্যুট, অমলের মনে হয় এর ওপর গলায় গাঁদাফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে ওকে একমাত্র মন্দিরের দরজায় মানায়। মাঝেমাঝে সস্তা সিনেমায় যেমন দেখা যায়, নাস্তিক নায়কের হৃদপরিবর্তন।

এরপর ওর কি কি অনিষ্ট হতে পারে সব বলে চলে পুলক। যদি মেয়েটা এসে দাঁড়ায় তবে ঘর সংসারে কি অশান্তি। হোম, হোমলাইফ একটা পবিত্র বস্তু, কি বলব বল!

যুক্তি বলছিল অমলের এসব কথা বিশ্বাস না করাই উচিত। কিন্তু যুক্তির চেয়ে সময়ে সময়ে অনেক বলশালী হয়ে ওঠে আবেগের হাল্কা ও পিচ্ছিল তরঙ্গ। মানুষকে ধাক্কা দেয়। অমল অভিভূত হ'ল, ভেসে যেতে থাকল, সকল শক্তির বিরুদ্ধে মাঝেমাঝে নদীর হাঁটুজল যেমন মানুষকে ভাসিয়ে নেয় নিশ্বাস ফেলে পুলককে সদুপদেশ দিল। আগে যা হয়েছে তা হয়েছে। এখন বিয়ে করা বউ ঘরে, ছেলে আছে একটা, এখন আর এমন বেহিসেবী ভাবে চলা উচিত নয়।

'এই শেষ, এমন আর হবেনা, বিশ্বাস কর,' পুলক বারবার বলে। কিন্তু তার প্রয়োজন দু'শো টাকা, অমল দেয় কোথা থেকে? 'যাক' কপালের ঘামমুছে ক্লান্তস্বরে অমল বলে 'একটা চেষ্টা ক'রে দেখব।'

এরপর পুলকের আর কোন ভূমিকা নেই। সে টুপ ক'রে হারিয়ে গেল, পাথরের নুড়ি যেমন নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির গহ্বরে হারিয়ে যায়

তেমনই হারিয়ে গেল, অথবা গভীর খাদের ওপর থেকে ছুঁড়ে দেওয়া শব্দের মত, যা অনেক নিচে প্রতিধ্বনি হয়ে অনেক সময় অবধি টিকে থাকে। ভয়ঙ্কর কোন অন্ধশক্তির দূত হ'য়ে সে সেদিন অমলের কাছে এসেছিল।

পরে অমল ভালকরেই জেনেছে প্রাণপণে অপরের ভাল ক'রতে যাওয়ার অহমিকাটি কেমন ক'রে খেলো হ'য়ে যায়। যে টাকা এমন ক'রে আদায় করে পুলক, সে টাকা তার তখনি না হ'লেও চলত। গৃহ এবং গৃহিণীর নাম বারবার আউড়ে সে অমলের সেই আজন্ম সংস্কারের দোরে মিনতি জানাচ্ছিল যে সংস্কার বলে 'ম্যারেজ ইজ অ্যান ইনস্টিটিউশান, হোমলাইফ মাস্ট বী প্রিজার্ভড।' এসব সংস্কার মানুষ আদিযুগ থেকে লালন ক'রেছে। চারদিকে নিয়ত তারই জয়জয়কার। এসব ভাঙিয়ে আজও চলছে। অমল ত' সমাজ-ছাড়া জীব নয়, পুলক অসাধারণ পাটোয়ারী বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিল কোন কব্জায় তেল দিলে অমলের মন দ্রব হবে।

অথচ তার গৃহিণী, পরে জানাগেছে এমন বোকা নন, যে নাম হচ্ছে, টাকা হচ্ছে, আজ রাজভবন কাল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ঘরোয়া আলাপের বিবরণ বেরুচ্ছে, তবু স্বামীর একটু আধটু ফূর্তি করবার অভ্যেসকে দোষ দেবেন। দোষ দিতে হ'লে তিনি সেই মেয়েটিকেই দেবেন কেননা মেয়েটি যদি ভাল হ'ত তাহ'লে কি আর। পায়রা ওড়াবার দিন থেকে আজ অবধি চতুরা স্ত্রী-রা স্বামীদের বিলাস- ব্যসনকে অসীম মহিমার সঙ্গে প্রশ্রয় দিতেই অভ্যস্ত।

আর সেই মেয়েটি! অদেখা অজানা সে মেয়েটির কথা ভেবে অমল দুঃখ পেয়েছিল অথচ তারপরেও সে পুলকের সঙ্গে বেরিয়েছে, সিনেমা গেছে। একটু একটু ক'রে আপস করতে করতে অন্তহীন আপসের স্রোতে গা ভাসিয়ে সে কোথায় গেল, তলিয়ে গেল, না কূলঠাঁই পেল তা অমল জানে না। হয়ত মেয়েটিকেও দোষ দেওয়া যায় না। জীবনে এমন পরিস্থিতি হয়ত সত্যিই আসে যখন গেঞ্জীবিক্রেতা

দাদাদের হাজার চেষ্টাতেও আর পতন রোধ করা যায় না। সহরে এ রকম কত মেয়ে রোজ-রোজ পুলকদের শিকার হচ্ছে তার সংখ্যায় আর একটি নাম।

অমল কি এত কথা জানে? টাকা টাকা করতে করতে শেষ অবধি ছুটে গেল তার কাছে, যে লোকটি তাকে না চিনেও অদৃশ্য নিয়ন্ত্রা যেমন পুতুলদের দড়ি টেনে কাছে আনে তেমনি ক'রেই টানছিল। হয়ত, অনেকদিন ধরেই টানছিল। হয়ত, কলেজ ছাড়বার পর থেকে এখানে ওখানে নানাজনের হাত ফেরতা হ'য়ে অমল যতকিছু কাজ ক'রেছে সবকিছুর পেছনেই নিয়তির উদ্দেশ্য ছিল একদিন অমলের পথ সংক্ষিপ্ত হ'য়ে ঐ লোকটির ঠিকানায় পৌঁছবে। কিছুতেই অমল এড়াতে পারবে না তাকে, কিছুতেই না।

নইলে সেদিন দত্ত তার মাছের মত গোল ও পলকহীন চোখ মেলে অমলকে ঘনঘন দেখছিল কেন? শেষে দত্তর গলায় কি উদ্বেগ 'চাটুজ্জে আপনার কি হয়েছে বলুনত?'

অমল একটু শুকনো হাসে। বলে 'দুশো টাকা দরকার' দেবেন?'

দত্ত ঠোঁট সুঁচলো ক'রে খাতায় যেন কিসের হিসেব মিলিয়ে নেয়। তারপর বলে 'আমি কোত্থেকে দেব? তবে হ্যাঁ খোঁজ দিতে পারি।'

'কিসের, টাকার?'

'একটি লোককে আমি জানি। টাকা ধার দেয়টেয়।'

'টাকা ধার দেয়?'

'টাকা ধার দেয়।'

'প্রফেশনাল মানিলেণ্ডার?'

'টাকা ধার দেয়।'

পেশাদার সুদী কারবারী কথাটি ব্যবহার করলনা দত্ত। বারবার বলল 'টাকা ধার দেয়' এবং এমন মুখ ক'রে তাকিয়ে রইল যেন তার যা বলবার সে বলেছে, যথেষ্ট উপকার করেছে।

অমল চটতে থাকল 'না, ঘেন্না করে।'

দত্ত তাহলে তাকে এই পথ দেখিয়ে দিচ্ছে? দুশো টাকার জন্যে অমল একটা সুদীকারবারীর কাছে যাচ্ছে! ছি ছি, ভাবতেও ঘেন্না, ভাবতেও ঘেন্না। নিজের ওপর ধিক্কার এসে গেল। কি এলেমদার পুরুষ! এই ক'টা টাকার জোগাড় নেই, এত বড় বংশ, এমন ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে একটা বাজে ও ঘুঘু লোকের কাছে যাচ্ছে টাকা ধার করতে। বংশের মুখ ভাল করে উজ্জ্বল হোক।

দত্ত বুঝল বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে, সে তাড়াতাড়ি বলল 'না না, আপনাকে ইনসাল্ট করবার জন্যে বলিনি জানলেন? লোকটি আপনাকে নামে চেনে।'

'নামে চেনে! তার মানে?'

'আমি মাঝে মাঝে বলি কি না, আপনার বিদ্যা, আপনার বুদ্ধি, আমার সঙ্গে ভিড়ে আপনার যে কত ক্ষতি হ'ল....'

সরু গলায় দত্ত ব'লে যায়। ছিনে পড়া লম্বাটে গলা, গায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকা সরু শার্ট, সবই অত্যন্ত পাকানো চিমড়ে পড়া কিন্তু কোথায় যেন ব্যাটারী লাগানো আছে, চার্জ দিলেই দত্ত তড়িৎবেগে কথা কইতে, ছুটে বেড়াতে, কাজ করতে পারে।

'আমার কথা ওসব জায়গায় বলবেন না।'

'আপনি ভাবছেন লোকটা সুদ খায়। মোটেই না, মোটেই না চূড়ান্ত খেয়ালী, যখন যে খেয়ালে থাকে। মুঠোমুঠো টাকা ছড়ায় জানলেন? যার ওপর ফ্যান্সী এসে যায় মুঠোমুঠো টাকা ছড়ায়, দত্ত শেষের দিকে গলার স্বরটি লম্বা ও সুরেলা করল যাতে অমল এই অবিশ্বাস্য কথাটি বিশ্বাস করে।

'আমার ওপর ফ্যান্সী আসবে কেন? তা ছাড়া ওসব লোককে বিশ্বাস না-করাই ভাল।'

'না না, যাদের জোগাড় করবার সোর্স আছে তারা এসব কথায় কানই বা দেবে কেন?'

অমল আর কথা বাড়ায়নি। কিন্তু কিছুদিন বাদে সেই তার কাছেই যেতে হ'ল। পুলকের দরকারটা হঠাৎ এমন জরুরী হ'য়ে উঠল যে টাকাটি না পেলে সে জলে পড়বে অথবা আগুনে অর্থাৎ অর্থাভাবে একটি ভয়ঙ্কর পরিণতি তার কপালে নাচছে।

শেষ অবধি কে তাকে নিয়ে গেল দত্ত না অন্যকেউ অথবা সে নিজে তা তার মনে পড়ে না। সময় এলে সর্বনাশের পথ চিনে নিতে দেরী হয় না। নিজে খুঁজে নেওয়া যায়, অথবা কোন পথ দেখিয়ে দেওয়ার লোক পাওয়া যায় কিংবা চোখের সামনে' 'এই যে এইদিকে' সঙ্কেত চিহ্নে আঙ্গুল বাড়ানো কব্জী থেকে কাটা হাতের ছবি নাচতে থাকে।

ছদিন বেশ জ্বর ছিল গায়ে। মুখ তেতো শরীরে শক্তি নেই। নেশাগ্রস্ত লোকের মত ঝিমঝিম করছে সর্ব অঙ্গ। মা বেরুতে দিতে চাননি, তাঁকে চটিয়ে মটিয়ে তবে বেরুতে হ'ল। ট্রামে গা ঢেলে দিয়ে নিজেকে খুব হতভাগ্য মনে হচ্ছিল তার। সেদিনকার অনেক কথাই অমলের মনে নেই, আবার কিছু কিছু খুব স্পষ্ট মনে পড়ে।

লালবাজার মোড়টা ছাড়িয়ে ডালহৌসীর দিক থেকে ট্রামটা ঢুকল। বাঁ'দিকে বেরিয়ে গেল চিৎপুরের রাস্তা, তারপরেই বাঁ'দিকে বড় বাড়ী।

বাড়িটির মলিন, বিরাট ও নানা কোম্পানীর ফলক আঁটা চেহারা দেখে বুকের ভেতরটা দমে আসে। নিচটা কি অন্ধকার। আসবাব-পত্তর রাখবার গোলা, কাঠের বড়বড় পেরেক আঁটা প্যাকিং বাক্স, একসময়ে অমলের বাবা সে-রকম বাক্স কিনে ফিনে না কি কসবার বাড়ীর ঘরেঘরে শেল্‌ফ টেবিল জালআলমারী এসব করিয়ে দেন। বিলিতী মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতির বাক্স, মোটা কাঠ, পোক্ত জিনিষ।

জীর্ণ মচমচে চেহারার একটি কাঠের সিঁড়ি ধরে অমল ওপরে ওঠে। ওপরে, আরো ওপরে। মাথা হালকা, পা ভারী, নাক যেন বুজে আসছে মনে হচ্ছে ভেতর থেকে গলগল করে রক্ত ছুটে নামবে নাক কান দিয়ে সর্দিজ্বরে বড় শরীর খারাপ করে।

ঘর, বারান্দা, প্যাসেজ। ঘরেঘরে অফিস, কত ধরণের লোক, ওপরের প্রতিটি তলায় কি রকম রোদ বাতাস খেলছে। এরই মধ্যে মানুষ বসবাসও করছে। একটি বুড়ী মেম মোটাসোটা একটি কুকুরের চেন ধরে বারান্দায় বেড়াচ্ছে। এককোণে পাতাবাহার গাছের টব। যদিও টবের গায়ে ও গাছের পাতায় পানের পিচ ফেলেছে কেউ।

সবুজ দরজা। দরজায় হাতের চাপ দিতেই ভেতরে খুলে যায়। ঢুকে অবাক হয়ে দাঁড়াতে হয় ঘরটি এত বড়। ঘরের পেছনে দরজা খোলা। চওড়া, রোদ ঝকঝকে ছাদ দেখা যায়, ঘরে রোদের অভাব নেই তবু একটি ঝুলন্ত আলো ঘরের একমাত্র টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে জ্বলছে। টেবিল, তিনচারটি চেআর, এছাড়া আর কোন আসবাব দেখা গেল না।

শাদা গিলেকরা পাঞ্জাবী, শাদা ধপধপে ধুতি, বোম্বাই চটি। ফর্সা রঙ কালো লেন্সের চশমা, ঠোঁট দুটি অত্যন্ত শাদা মনে হয়, পাতলা চুলে ব্যাকব্রাশ। মুখে স্নো-পাউডার। লম্বা, বেশ লম্বা, চোখের দৃষ্টি যেন কত না আবেগে উদ্বেল।

'এস ভাই এস, তোমার জন্যেই বসে আছি।'

গলার স্বরটি অদ্ভুত। ভোজবাড়ীতে গলাতুলে একধরণের লোক শুধুই ভাড়াটে ঠাকুর চাকরকে শাসিয়ে চলে, তাদের গলার মত বহু ব্যবহৃত।

তুমি সম্বোধনে অসন্তুষ্ট অমল চেআরে বসতেই লোকটি চ্যাপটা একটা শিশি বের ক'রে জামার হাতায় ক'ফোঁটা ঢালল, অদ্ভুত দেখতে শিশিটা মুখটা বকের গলার মতো সরু ও বাঁকা। উগ্র একটা সুবাস ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। 'কোলোন থেকে আনাই। একটা সেলার আছে এনে দেয়।'

অমল নীরব।

'প্রথম আলাপেই তুমি বললাম মনে কিছু কর না। আমিই জোজো সিংগি।'

পরে অমলের মনে হয়েছে বই-এ আর কতটুকু লেখা থাকে। ভয়ঙ্কর এবং স্বভাববিরোধী কোন পাপাচার যখন ঘটতে যায় তখন না কি অনেক রকম দুর্লক্ষণ দেখা যায়। যেমনটি হয়েছিল যদুবংশ ধ্বংস হবার সময়ে। মাটি ফেটে রক্তের ফোয়ারা উঠছে, সদ্যোজাত শিশুরা গাধারমত কর্কশ চাৎকার করতে করতে মরে যাচ্ছে। চিতা থেকে শবদেহ উঠে শূন্যে গা মোড় মুড়ি দিচ্ছে। দ্বারকাপুরীর সর্বত্র মুণ্ডিতমস্তক এক পুরুষের ছায়া, রমণীদের কণ্ঠ থেকে মঙ্গলসূত্র ঐ খসে পড়ল।

অমল না হয় মস্ত কেউকেটা নয়, তবু তাকে কি একটু সঙ্কেত দেওয়া চলত না? এদিকে অমলের বাবা চিরকাল নানারকম লক্ষণ মেনে মেনে চলেছেন। বেরুবার মুখে হোঁচট খেলেন, বাড়ী ফিরে এলেন। পরে বললেন 'ভালই করেছিলাম, ঐ বাসে চড়তে গেলে পকেট মারা পড়ত।' সকালে হাত থেকে কাপ পড়ে ভাঙল। বিকেলে ধুতিতে খোঁচা লাগিয়ে এসে বললেন সকালেই জানতে পারছিলাম। দুটি একটি বিষয়ে ঐ মনের ভেতরকার টিকটিকির টিকটিক ঠিকমত সাবধান করে দিয়েছিল বোধহয়, এখন আর ভেবে দেখেন না, অন্ধভাবে মেনে চলেন।

ভবিতব্যের নির্দেশ উনি সারাদিনই পাচ্ছেন। ওঁর সংসারে নিরবচ্ছিন্ন যে সব ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে চলে তার প্রত্যেকটিই তিনি আগে টের পেয়ে যান। এমন কি অমল যে সান্ন্যালের কাছে ঠকবে তাও তিনি জানতেন কেননা এমন শোনা যায় যেদিন অমল দার্জিলিং যায় সেদিন না কি রাস্তার একটা কুকুর এসে অমলের চটি চিবিয়ে ফেলেছিল।

যিনি এত জানতে পারেন, সর্বদাই যাঁর সঙ্গে ভবিতব্যের খবর চালাচালি হয় তিনি কেন অমলকে আগে থেকে কিছু বলেন নি?

আসলে সব মিথ্যে। উনি কোনরকম আঁচই পাননি। সকাল গড়িয়ে দুপুর। ঘরে এসেন্সের গন্ধ ভুরভুর করছে। দু'শো টাকার

বিনিময়ে অমল জোজোসিংগির কাছে নিজেকে বাঁধা রেখে এল। কি অল্প দাম! অথচ ওদেশে যারা শয়তানের কাছে নিজেকে বাঁধা রেখেছে বিনিময়ে কতই সুখ না পেয়েছে। কত ঐশ্বর্য জাঁকজমক, জীবনকে ভোগকরবার কত না আয়োজন।

বুড়ী মেমটি কুকুরটা নিয়ে ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। বেলা তিনটের হেলতে সুরুকরা রোদ বারান্দার এখানে সেখানে ছেটানো।

অমল বেরিয়ে এল।

॥ নয় ॥

জোজো বোধ হয় প্রথম দর্শনেই বুঝেছিল অমল সহ্য ধৈর্য এবং পরিশ্রমের শেষ মাত্রা ছুঁয়ে ফেলেছে।

কিছুদিন বাদে তার নীল গাড়ীটি অমলের দরজায় এসে থামল।

সেই প্রথম দিনের কথাটি অমলের বেশ মনে পড়ে। বাড়ীর এই বুড়ো অন্ধ কুকুরটাকে যতবার দেখে ততবারই মনে পড়ে।

শীতের দুপুরে বাড়ীর সামনে রোদ পোয়াচ্ছিল কুকুরটা। ঐ ওর অভ্যেস, খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলেই নিজেকে রাজাগজা মনে করে, পাখী উড়লে পাতা পড়লে চেঁচাবে, বাসনওয়ালা থালা ঢঙঢঙিয়ে গেলে ভুক ভুক ক'রে ডেকে অস্থির কাণ্ড বাধাবে। ওর ক্ষমতার দৌড় ঐ পর্যন্ত, কারুকে কামড়ানো টামড়ানো ওর ধাতে নেই।

অমল হঠাৎ কুকুরটাকে তীব্র যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠতে শোনে। শরীরটার ভেতরটা অবধি যেন চমকে উঠল।

জোজো সিংহ। কুকুরটাকে দড়াম ক'রে লাথিমেরে পায়ের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে ঘরে ঢোকে। অমল বিস্মিত। লম্বা ফর্সা শরীরটি দিয়ে দরজা জুড়ে থাকল জোজো, হাসিতে মুখটি আলোকিত ক'রে বলল 'তুমি ত' আর গেলে না ভাই, আমাকেই আসতে হ'ল।'

পকেট থেকে শিশি বের ক'রে গায়ে ঢালল দু' ফোঁটা। চেআরে ব'সে বলল 'দত্তর সঙ্গে ক'দিন দেখা নেই ?'

অস্বস্তির ভাবটি কাটিয়ে অমল বলে 'এই মাস খানেক।' বলতে গিয়ে গলাটা তার আপনা থেকেই মৃদু হ'য়ে যায়। এরপর কি? আর কি করবে সে? বছর আষ্টেক আগে, পড়াশোনা ছেড়ে সান্যালের কথায় দার্জিলিং যায় যখন, তখন থেকেই এই দৌড় সুরু হয়েছে। এখন মনে হ'চ্ছে আর দৌড়বার ক্ষমতা নেই। যদিও ঘাসের ওপর শাদা চকের

দাগ এখনো সামনে, বহুদূর অবধি বিস্তৃত, এবং কে জানে শেষ অবধি গেলে লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে কি না, এক সময়ে মনে হ'ত দৌড়ের শেষে কত না পুরস্কার, বিশ্রাম, জয়ধ্বনি। এখন মনে হয় নিশ্চয় এর কোন শেষ নেই, মিথ্যে আশার বশে অমল এতদিন ছুটেছে। অথচ, লোকটির মূল্যবান সাদা জামাকাপড়, আঙুলের আংটি ঘড়ি, সদাসর্বদা জুতো পরা কোমল দর্শন পা সব চোখে পড়ে এবং বুকের নিচে একটা কি যেন খচখচ ক'রে ওঠে। অমল ওর মত স্বস্তিতে সুখে থাকতে চেয়েছিল, এখনো চায়।

'কি ভাবছ ব'সে ব'সে?'

'না, কিছু না।'

হঠাৎ ভয়ঙ্কর সেই সত্যটি মনে প'ড়ে গেছে। নির্ঘাৎ টাকা চাইতে এসেছে জোজো। দু'মাসে দুশো টাকার কত সুদ হয়? ওকি সুদ চাইবে? অমল কোথা থেকে দু'শো টাকা দেবে? এগারো টাকা দামের কলম, হাত ঘড়ি, টেবিলের রেডিও, ঘরের যাবতীয় বিক্রী বা বন্ধকযোগ্য জিনিসপত্তরের উপর চোখ বুলিয়ে গেল অমল। এখন লোকটাকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। মা বা বাবার কানে যদি কথায় বার্তায় এ দুঃসংবাদ ঢুকে পড়ে যে লোকটা পেশাদার সুদকারবারী তাহ'লে বাড়ীতে সর্বনাশ ঘটে যাবে। ওঁদের ভাঙ্গা পাঁজরে আবার ঘা পড়বে।

বোঝাগেল জোজো সিংহ আসলে মানুষ নয়, নিয়তি। অমলের মনের কথাটি বুঝে নিয়ে বলল 'আমি টাকা চাইতে আসিনি, দিতে এসেছি।'

'তার মানে?'

'রেগে চটে চলে ত' এলে। দোকানে বসতে এই মাত্তর, দত্ত কোনদিন খাতাপত্তর দেখিয়েছে?'

'না।'

'দেখনি কেন?

'কি লাভ হত ? চলছেনা যে সে ত' আমিই বুঝতাম। হয় না। বিরাট পুঁজি না থাকলে কাপড়ের ব্যবসা !'

'ভাল, তা ছাড়লে যখন পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে ছাড়বে ত ?'

'পাওনা গণ্ডা !'

'দোকানের আসবাব পত্তর বেচেছে, টেলিফোনটা দিচ্ছে নতুন মালিককে' সে জন্মে টাকা নিচ্ছে ত'। তুমিই এনেছিলে গো ! টেলিফোন।'

কথামৃতে পড়েছে অমন, ঠাকুর কথায় কথায় 'বল না গো' কইতেন, বলতে শোনেনি কারুকে, এই শুনল এবং আবার মনে হ'ল কি অস্বস্তি জাগানো গলা, এমন গলা কাজের বাড়ীতে মানায়।ছ্যাঁচড়া দাও, জলকই এই সব কথা বাড়ী ফাটিয়ে বলবার জন্মে ঐ গলা। ঘরে ব'সে কথা কইবার জন্য নয়।

'কি ভাবছ, আমি কি চেঁচিয়েই না কথা কই ?'

অমল চোখ নামিয়ে নিল।

'হুঁ হুঁ, থট রীডিং করতুম।' আত্মপ্রসাদে জোজো হাসল।

'তাই বুঝি ?'

'নিশ্চয়। করিনি কি, কি করিনি ?' থটরীডিং ম্যাজিসিয়ানের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট।'

যদি অবস্থা বিপাকে ক'রে থাকে তবে অমলের সঙ্গে ওর সাদৃশ্য আছে। যদিও অমল কোনদিনই জাদুকরের চ্যালা হয়নি এখন মনে হ'চ্ছে চা-এর দালালী ছেড়ে চ্যালাগিরি করতে পরত সে হাসি মুখে যদি জানত পরে নীল গাড়ী চড়ে ফর্সা জামাপ'রে জ্ঞানী ও বিবেচক অমলের বুকেও ঈর্ষার ধুকধুকি নাচানো যাবে ! মানুষ ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না।

'একদিন বলব তোমায়।'

জোজো একটু হাসল। ঠোঁটে ধবল হয়েছে ধবল হয়েছে মনে হচ্ছিল, এখন জোজো গালে পান ফেলল এবং অমল বুঝল যাদের পান খাওয়া অভ্যাস তারা অত্যন্ত ফর্সা ক'রে দাঁত ঠোঁট ধুয়ে পান না খেলে ঠোঁটের চেহারা অমনি ধারা বিধবা বিধবা দেখায়।

'দত্তর কাছ থেকে তোমার পাওনা আমি কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে এনেছি।'

ঘরের চারদিকে যতই চায়, জোজোর মুখচোখ ততই উজ্জ্বল হয়। ব্যাপার কি! প্রাচীন পালঙ্ক, আড়ঙে টাঙানো লেপ, মরচে ধরা ট্রাঙ্ক, আলমারীতে ইংরেজী বই, পটলের তৈরী ব্যাটারী সেট রেডিও, ক্যালেণ্ডারে রেডিও শুনে উৎফুল্ল শিশুর ছবি, এ দেখে ওর আনন্দের কি আছে?

মনে হচ্ছে ও যেন নিগূঢ় আনন্দ পাচ্ছে।

কিন্তু অমলের মন কৃতজ্ঞতায় ভেসে যাচ্ছে, অবাক-ও হ'চ্ছে।

'ব্যাপার কি বলুন ত?'

'ব্যাপার! দত্ত আমার অনেক, অনেক দিনের পরিচিত। ভাল ছেলে আমি কোনদিনই নই, ভাল হবার সুযোগই পাই নি। তবু তোমায় বলছি অমল, যে যখন এসে দাঁড়িয়েছে উপকার করতে ছাড়িনি কারুকে। সাধ্যমত দিয়েছি। কেন ঐ দত্ত চোদ্দ বছর আগে পাকিস্তান হবার পর থেকে সেদিন অবধি জমির এজেন্ট ছিল না? ওখানকার লোকরা এখানকার সঙ্গে সম্পত্তি বদলাবদলী করত, দালালী করত না? মালদ'তে সেবার টাকা দিয়ে কে ওকে বাঁচায়? কে?'

জোজো হঠাৎ নিজের বুকে চাপড় মারে 'আমি, আমি বাঁচাই বুঝলে?'

'ও, তাই বুঝি'······ইচ্ছের বিরুদ্ধে অমল আকৃষ্ট হচ্ছে।

'তোমার কথা ওর কাছে শুনে আমি বহুদিন থেকে লক্ষ্য রেখেছি জানলে? আর সব সইতে পারি, অবিচার সইতে পারি না। তুমি ত' জান না আমি লোকের কাছে কত অপদস্থ হয়েছি! নিরীহ, ভদ্দরলোকের ছেলের কষ্ট দেখলে আমার রক্তটা একেবারে···'

জোজো পাঞ্জাবী হাতা সরিয়ে কব্জী বের করে। সাংঘাতিক চওড়া, আর, আর ঐ ফর্সা লম্বা হাত দু'খানি কি সুন্দর। অমল মুগ্ধ হ'ল।

এরপর পকেট থেকে টাকাপয়সা বের ক'রে দিয়ে উঠে পড়ল জোজো। 'বসা সম্ভব নয়, বসা সম্ভব নয়, দারুণ কাজ আছে।' সে বেরুল, অমলও সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে বেরুল। 'আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাই', জোজো তার হাত চেপে ধরল 'ধন্যবাদের কি আছে ভাই? অমল বলল 'এ থেকে কিছু টাকা যদি কেটে রাখতেন' জোজো মর্মাহত 'ছিঃ, তুমি আমাকে কি ভাবছ?'

গাড়ীর কাছে গেল। কি আশ্চর্য, গাড়ীতে একটি মেয়ে বসে। গালে পানের টোপলা, ঘন ভুরু, খসখসে গলা 'পুকুরটি কেমন দেখতে!'

অমল অপ্রস্তুত 'ছি ছি, ওঁকে গাড়ীতে বসিয়ে...'

জোজো সে কথাকে আমল দেয় না। মেয়েটির পরিচয় দেবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না, উঠে পড়ে এবং স্টার্ট দেয়।

ফিরে এসে অমল মা'র সম্মুখীন 'কে এসেছিল রে?'

'একটি লোক।'

'কেন?'

'এমনি।'

মা'র কাছে সব কথা ভাঙেনা অমল, সম্ভব নয়। বুঝবেন না, এখনই চেয়ে বসবেন। ঘরে এসে অমল ঘাড় না ফিরিয়েই বলে 'বাবাকে ব'লো দোকানে যেতে, ম্যুনিসিপ্যাল অফিসেও যেন যান!'

'টাকা পেয়েছিস?'

'কিছু।'

যে টাকা প্রত্যাশিত ছিল না সে টাকা পেলে এখন আর মনে আলগা ফূর্তি আসবার কথা নয় তবু অমল আনন্দের বাষ্পে যেন ফুলে উঠল। বিকেলে সরিতের বাড়ী গেল। অফিস থেকে ফিরে সরিৎ জামাকাপড় ছাড়ছিল, ওর মা অমলকে ডাকলেন রান্নাঘরে।

'অনেকদিন আসনি।'

'সময় পাই না মাসী মা।'

'এই ত' তুমি ও ছেলে, কেমন রোজগার পাতি করছ, সংসার দেখছ, এদিকে তোমার বন্ধু···!'

মহিলা মুখটি দুঃখে ক্লিষ্ট করলেন।

'কি হয়েছে ?'

'আচ্ছা, সত্যিই কি সরিৎ ঐ মেয়েটাকে বিয়ে করবে ?'

অমল কি বলবে।

'ভাইটা মিস্তিরী, বোনটা পাগল, একেবারে এপাড়া ওপাড়ার মধ্যে! ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তুমি একটু ঠিক করতে পার না ?'

'বলে দেখব।'

'দেখ। বড়টা ত' অবাধ্য ছিল না, ও যে কেমন এক ধারা। কোন কথাই শোনে না।'

সরিৎকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে অমল বলে 'মাসীমা দুঃখ করছিলেন।'

'কেন মা'র দুঃখ কি ?'

'তোর জন্যে।'

'কেন, বিয়েত' মা করছেন না, আমি করছি।'

'কবে করবি ?'

'দেখি।' সরিতের মুখের উপর দিয়ে ছোট ছোট মেঘ ভেসে চলে গেল 'কবে করব পটল-ও ত' সেই কথা জানতে চায়।'

'করছিস না কেন ?

'মা দাদা সবাই যে একবগ্‌গা হ'য়ে ঘাড় ফিরিয়ে আছে। এখন বিয়ে করলে হইচই বাধাবে।'

'বিয়ে কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'না, কোনদিন কারুকে আঘাত দিলাম না, এমন একটা কাজ করব, তাতে কারো আশীর্বাদ পাব না, ভাল লাগে!'

'সেজন্যেই এগোচ্ছিস না বুঝি ?'

'তাই বা বলি কি ক'রে।'

'আর কি ?'

'হাসি বেশ কিছুদিন ভাল আছে। ডাক্তার বলছিলেন···'

'কি, সেরে যাবে ?'

'তা বলেননি। তবে একটানা বছর দুই ভাল থাকলে একটা আশা আসে।'

'এই যে ঝুলিয়ে রেখেছিস, নীতা কিছু বলে না ?'

'কি বলবে ?'

'রাগ করে না ? বসে বসে থুবড়ো হচ্ছে ত!'

'কে বললে ?' সরিতের চোখে কূলে কূলে হাসি 'রীতিমত টেলারিং পড়ছে, উষাকোম্পানীতে চাকরী করবে, সে আমার ভারী পরোয়া করে কি না!'

'ওর দাদার না ঘোর আপত্তি ছিল ?'

'গোঁয়ারের মত আপত্তি করলেই হল ? এখন সে-ও বুঝছে দিনকাল পালটাচ্ছে। হাসিকে দেখলে তুই অবাক হ'য়ে যাবি।'

অমল সরিতের সঙ্গে ও বাড়ীতে গেল। মিনিট পাঁচেক মাত্র ছিল। হাসি খুব হাসি হাসি মুখে এসে দাঁড়াল। সত্যিই রূপসী মেয়ে। বলল 'কত দিন আসনি বল দিখি ? নীতা-ও এল। অমলের সামনে লজ্জা পাচ্ছে ব'লে মনে হ'ল। অমল দেখল ঘরদোরের ছিরি ছাঁদ একটু ফিরেছে। হাসি তাদের লক্ষীপুজোর প্রসাদী ফলমূল এনে দেয়।

নীতা লণ্ঠন হাতে দরজা অবধি এল।

'তুই কি রে ? নীতার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা বললি না!'

'ওই ত বলেছি।'

'ওকে নিয়ে বেড়াস টেড়াস!'

'পাগল! তুই আমাকে কি ভাবিস বলত!'

অনেকদিন পর বন্ধুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে গাঙ্গুলীদের মাঠটাকে আর চিনতে পারছে না অমল। কত বাড়ী হচ্ছে, সরু সরু পায়ে চলা রাস্তা।

'যাই বল্ ·জায়গাটা খুব বদলে যাচ্ছে।' অমল অন্যমনস্ক ভাবে বলে। বলাইদের শ্বেতচাঁপা গাছটায় প্রায় বারোমাস ফুল ফোটে এখন তার ক্ষীণ মিষ্টি সুবাস আসছে।

আবার ক'দিন বাদে এল জোজো সিংগি। বলল 'কি বাড়ীতে ব'সে আছ, চল বেরুই।'

একদিন নয়, মাঝেমাঝেই।

গঙ্গার ধারে নিয়ে যায়, কখনো তার অফিসে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অমলের জীবনের কথা জানে, নিজের কথা বলে।

'জান অমল, একসময় হাফপ্যাণ্ট পরে ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে হ্যাণ্ডবিলের তাড়া বগলে কলকাতার সর্বত্র ঘুরেছি। কোথায় গেছি আর কোথায় যাইনি। তবে হ্যাঁ, এখন জোর গলায় বলতে পারি কষ্ট করলে তবেই উন্নতি করা যায়।'

অমল সে কথা বিশ্বাস করে না। যদিও এর কাছে তার যুক্তিগুলো দাঁড় করিয়ে দিয়ে লাভ নেই, বুঝবে না।

তোমার সঙ্গে একেকজন এক একরকম ব্যাভার করেছে। ভাবলে পরে আমার রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে, মনে হয়…!'

দুর্বৃত্তদের হাতের কাছে না পেয়ে কাটলেট থেকে চিংড়ি মাছের ল্যাজটি টেনে ছিঁড়ে ফেলে জোজো।

'তুমি জাননা তোমাকে দেখে থেকে আমার মাথায় কতরকম প্ল্যান ঘুরছে।'

অমলের জীবনে এ এক অদ্ভুত ভানুমতীর খেলা। তাকে দেখলেই লোকের মাথায় পরিকল্পনা গজায়। কেউ কাগজ বের করতে চায়, কেউ টেণ্ডার বাগাতে ছোটে, কেউ কাপড়ের ব্যবসা করতে চায়।

অমল সে কথা বলতে দ্বিধা করেনি 'দেখুন, এসব কথা আমি অনেক অনেক শুনেছি। আমি কারুকেই বঞ্চনা করিনি, সাধ্যমত শ্রম দিয়েছি, সর্বদা ভেবেছি যা হবে হোক, এ কথা যেন কেউ বলতে না পারে

আমার আন্তরিকতায় কোন ত্রুটি ছিল। এখন আমার আর অন্যের চরকায় তেল দিয়ে প্রাণপাত করতে ইচ্ছে করে না।'

রূঢ়, রুক্ষ কথা। বিশেষ ক'রে যে লোক কিছুদিন থেকে সহসা তার সঙ্গ পাবার জন্যে ব্যস্ত, বাড়ী ব'য়ে এসে অপরের কাছে পাওনা টাকা উদ্ধার ক'রে দিয়ে যাচ্ছে তাকে এমন কথা বলা উচিত নয়।

কথায় বলে মনের মধ্যে মন, প্রাণের মধ্যে প্রাণ। অমল ঠিকই টের পাচ্ছে জোজোর এ আসাযাওয়া নিঃস্বার্থ নয়। আজকাল কেউ কা'রো কাছে স্বার্থবিনা যাওয়া আসা করে না। এখন সবাই ভীষণ কাজের মানুষ হয়ে গেছে, বিনে কাজে শুধু দেখতে এলাম একটুখানি সে সব এখন হয় না। বিশেষ ক'রে অমল ত' ঘরপোড়া গরু। বেশ কয়েকবার ছ্যাঁকাপোড়া খেয়ে খেয়ে জ্বলেছে। চেহারায় ছাপ পড়েনা এ তার দুর্ভাগ্য। ভগবান এমন সুকুমার কোমল মুখখানি কেন সঙ্গে দিয়েছিলেন তিনিই জানেন। অমলের ইচ্ছে হ'ল জোজোকে বলে আমার মুখ দেখে ভাবছ সংসারে জ্বালাযন্ত্রণা আমি কিছু কম পেয়েছি, তা নয়। আমার মনের চেহারা ত' দেখনি। শাপগ্রস্ত নলরাজার মত। বলল না, কেননা বললে জোজো বুঝত না।

জোজো তার নীরব চিন্তা লক্ষ্য করল। বলল 'জানি, আমি তোমায় দোষ দিই না।'

এইভাবে আরো কিছুদিন গেল।

একদিন জোজো বলল 'কিছু করছ না কি ? ঠিক করলে ?'

'নাঃ পাচ্ছি কোথায়! কর্পোরেশনের মাস্টারী যা এক সময়ে চাইলেই পেতাম তা পর্যন্ত দুর্লভ হ'য়ে গেল, অ্যাঁ ?' গভীর ক্ষোভের সঙ্গে সে হাসল। কর্পোরেশন স্কুলের কাজটির জন্য তার বাবা চেষ্টা করতে গিয়েছিলেন। অমলের বাবা ঘুষটুষ না নিয়ে, নিজের জন্যে কোনদিন কোন সুবিধে না চেয়ে যে কত শত্রু সৃষ্টি করেছিলেন তা নিজেই জানতেন না। অনেকের রাগ ছিল তাঁর ওপর। সংস্পর্শে যারা আসেনি তাদেরও এমন লোকের নাম শুনলেই রাগ হয়। ঐ

লোকটির এবং ওঁরমত আর ক'জন লোকের বিবেক বড়ই ধবধবে শাদা ছিল, ওঁদের পাশে অন্যদের মিছেমিছি কালো দেখতে। ইচ্ছে করলেই এঁদের সরিয়ে দেওয়া যায় না এই যা মুস্কিল। এখনো এঁদের মত লোক এসে চেআরে বসেন, অন্যরা তারমধ্যে যেমন করে হোক মানিয়ে টানিয়ে নেয়।

কোনদিন কিছু বলেননি যিনি তিনিই মুখটি নিচু ক'রে গিয়ে দাঁড়ালেন। ছেলের জন্যে কর্পোরেশান স্কুলের মাস্টারী! যারা শুনল তারা তাজ্জব। কেননা সকলেই জেনে ফেলেছিল ভদ্রলোক এই ছেলের সম্পর্কে বিবিধ আশা পোষণ ক'রে থাকেন। তিনি বললেন 'এডুকেশন লাইনটাই ওর পছন্দ' তাই ভাবছিলাম······।' যারা শুনল তারা তাঁর শার্টের সুতো ওঠা কফ, কলারের ভেতরে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া টাঙাবার হুক দেখল এবং বুঝে নিতে দেরী হ'লনা সবকটি গ্যাসবেলুন ফুটো হয়ে গেছে একটি একটি ক'রে তার ফলেই তাঁর এইভাবে এ লালবাড়ীতে প্রবেশ।

বিধ্বস্ত ব্যক্তিকে দেখলেই লোকে নানাবিধ উপদেশ দিয়ে মজা পায়। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। চেআরে উপবিষ্ট ভদ্রলোক অমলের বাবাকে আরেকটি চেআরে বসালেন, জল পান, চা দিয়ে ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখালেন তারপর স্মিত ও সুন্দর হাসিটি মুখে অক্ষুন্ন রেখে তাঁর যা বলবার তা বলে গেলেন। এখন নাকি কাউন্সিলার ধ'রে ইস্কুলে ঢোকবার চেষ্টা করা অসম্ভব।

'আমি তা করতে বলছি না।' অমলের বাবা বলেন। তখন ভদ্রলোক পরিসংখ্যান গেয়ে যান, কত কত ছেলেমেয়ে গ্র্যাজুয়েট হ'চ্ছে ম্যাট্রিক দরকার যেখানে, সেখানে লোকে গ্র্যাজুয়েট পাচ্ছে এম. এ. রাও ধর্ণা দিচ্ছে। এখানে অমলের কিউ-এ দাঁড়িয়ে লাভ নেই, তবে হ্যাঁ, চেষ্টা করবেন তিনি, কি না হয় চেষ্টায়, পথ নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

আসল অন্ধিসন্ধিগুলো অমলের বাবা কোনদিনই চেনেননি, এই লোকটিকে কিছু খোসামুদে কথা কইলেই কাজ হ'ত তা এখন বুঝলেন না। মনেপ্রাণে ক্ষুদ্র ডেয়োপিপঁড়ের মত দম্ভ স্ফীতপুচ্ছ মানুষদের

কাছে কাজ আদায় করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের অহমিকায় সুড়সুড়ি দেওয়া। বিশেষতঃ যারা কড়া নীতিবাদী, ঘাড় নোয়াতে জানেনা, তাদের চেহারায় ও কণ্ঠে দীন আকুতি দেখলে এসব লোক ভারী খুশী হয়। অমলের বাবা সেসব কিছু জানেন না, বুঝলেন না, সোজাসুজি ব'লে বসলেন 'তাহ'লে আর কি হবে ? ন্যায়মত যা পার কোর, অন্যায় করতে আমি তোমায় বলব না।' যাঁকে বললেন তাঁর নাম আজকাল ঘুষ ও নোংরামির জন্যে ঘনঘন কাউন্সিলের মিটিংএ শোনা যায় তা তাঁর কথা বলার সময়ে মনে পড়ল না।

'কাউন্সিলার তো আপনার চেনা চাটুজ্জে মশায়।'

'কাউন্সিলার ?'

অমলের বাবা চশমামুছে সোজা হ'য়ে বসে বললেন 'যারা সর্বদা নোংরা গালাগালি করে, শহরটাকে জাহান্নামে দিচ্ছে, আমি যাব তাদের একজনকে বলতে ?'

'আহা, সবাই সে-রকম নয়, ইনি ভাল লোক।'

'তাহ'লে আরো যাবনা। অন্যায় সুবিধে নেব কেন ! প্রত্যেকে দিন নেই রাত নেই অন্যায় সুবিধে নিচ্ছে। এই ক'রে ক'রে ত' দেশ জাহান্নমে গেল। আমি তোমায় বলে যাচ্ছি এ ক'রে কিচ্ছু হবেনা, সব উচ্ছন্নে যাচ্ছে।'

কোঁচার খুঁট বাতাসে ঝেড়ে, দৃপ্তপদে তিনি বেরিয়ে এলেন। ফিরে এসে অমলকে বললেন 'মনে হচ্ছে না সুবিধে হবে। লোকজন সবাই ভয়ানক নোংরা হয়ে গেছে।' এখন অমলের সে কথা মনে পড়ল। আস্তে আস্তে বলল 'সবাই নোংরা। ওপর থেকে নীচ অবধি। যাঁরা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তাঁরা অবধি যে রকম আচরণ করেন, কথা বলেন, শুনলে রসাতলে যেতে ইচ্ছে করে। সাধ্য থাকলে ···'

'কি করতে ?' জোজোর চোখে হাসি।

'ব'লে লাভ নেই।'

'একটা কিছু ত' করবে ?'

'ভাবছি,' যেহেতু সত্যি সত্যিই কথাটি ভাবছে সেহেতু গলা গম্ভীর হ'ল 'ভাবছি লাজলজ্জা ইচ্ছে টিচ্ছে বিসর্জন দিয়ে ছোট একটা স্টেশনারীর দোকান দেব। এদিকে এ ধরণের দোকান বেশ চলবে। একপাশে স্টেশনারী, অন্যদিকে তরিতরকারী, ফল, ডিম, পেঁয়াজ।'

'হ্যাঃ!'

'সত্যি বলছি। এধরণের দোকান কম পয়সায় হয়। কাল সে জন্যেই শেয়ালদ'র বাজার দিয়ে হাঁটছিলাম।'

'কেন?'

'গিয়েছিলাম খোঁজ খবর নিতে কিন্তু মনে হচ্ছিল পচা তরকারীর গন্ধ কি ভয়ানক।'

'বিশ্রী। আমি মাছের ব্যবসা করেছি।'

'ও।'

'আমার একটা কথা বলবার আছে।'

অমল হাসল। বলল 'বলে ফেল। একটা কিছু বলবে ব'লেই এতদিন ধ'রে এত ঘোরাঘুরি, মাঝেমাঝেই ভাবি কি চাইতে পার তুমি আমার কাছে, কি বলতে পার?'

'ভেবে বার করতে পেরেছ কিছু?'

'না। তুমি আমার চেয়ে অনেক অনেক বুদ্ধি রাখ।'

'তুমিও নির্বুদ্ধি নও।'

ইতি গৌর চন্দ্রিকা। তারপরেই জোজো সিংহ টোপ ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে অমলের হৃৎপিণ্ড নেচে উঠল, শরীরের ভিতরে রক্ত চলাচল বেড়ে যাচ্ছে, ভেতরে গোলমাল, ছুটোছুটি, ঢং ঢং ঘণ্টা বাজছে, অমল আর স্ববশে থাকছে না।

'ঠাট্টা করছ?' অমল অনেক চেষ্টায় শুকনো গলায় বলে।

'হাঃ!' অদ্ভুত এই শব্দটি ক'রে জোজো সিংগি চেয়ারে হেলান দেয়।

'আমি দোকানটোকান যা হয় করব ঠিক ক'রেছি'।

'হবেনা।'

'হবেনা!'

'না। তোমার এখন পয়সার দরকার।'

'তোমার তাতে কি?'

'স্বার্থ আছে।'

'তোমায় বিশ্বাস কি?'

'চল লেখাপড়া ক'রে দিচ্ছি।'

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি…'অমল বিড়বিড় ক'রে বলল।

'কি?'

'এ হয়না।'

'রিস্ক্ নাও ঝক্কি নাও। আমি তোমায় রাজা করে দিতে চাচ্ছি না।'

'কিন্তু প্রেসের আমি বুঝি কি?'

'দেখ, আমি যা বুঝি তাতেই চলবে। তুমি শুধু এখানে থাকবে, দেখবে ঠিকমত কাজ উঠছে কি না। অর্ডার-ও তুমি আনছ না।'

'বইয়ের প্রেস?'

'বই?'

জোজো সিংগি তারপর হা হা ক'রে হাসল, বুকের ফর্সা পাঞ্জাবীর ওপর হাত ঠুকে দামামা বাজাল, বলল 'হাসিও না।'

'তবে কি?'

'দেখতে পাবে।'

'রিস্ক আছে।'

'যত তোমার ততই আমার। বলতে পার ঝুঁকি না নিলে কোন বড় কাজ করা যায়?' জোজো ঝুঁকে পড়ে এবং নির্মম শ্লেষে বলে সামান্য কাজ করব! নির্লিপ্ত থাকব! আকাঙ্ক্ষা যার মেটেনি সে আবার যোগী সাজবে কি হে? বাপ তাড়িয়ে দিয়েছিল আমিও সন্নেসী হতে গিয়েছিলাম। সন্নেসী হব বললেই সন্নেসী হওয়া যায় না।

তাতে পিঠের শিরদাঁড়ায় জোর লাগে। তোমার কোন আকাঙ্ক্ষাই মেটেনি। তুমি চাওনা ভাল জামাকাপড় পরি, গায়ে এসেন্স ঢালি, ভাল গাড়ী চালিয়ে কলকাতা শহরের বুকে জাঁক ক'রে বেড়াই? সব চাও, আমি জানি। তোমার দেখেই বুঝে নিয়েছি, হ্যাঁ, মিছে অস্বীকার ক'র না।'

অমল চোখ ঢাকল শিউরে উঠে। অস্ফুটে বলল 'দাও, আমায় ভেবে দেখতে সময় দাও।'

'নিতে চাচ্ছ, নাও সময়। তবে জেন তুমি আমার কাছেই আসবে। আরে ভাবনা কিসের? বাপ মা! বাপ মা ক'দিন থাকে? তোমার ইচ্ছে করে না যে ক'দিন আছে তাদের সুখে যত্নে রাখ?'

অমলের আসল দুর্বলতার জায়গা ছুরি খুঁচিয়ে এমনি ক'রে ঘা দিয়ে জোজো হাসতে লাগল। নিঃশব্দ এবং ভীষণ হাসি। হেসে, মুখমুছে, রেস্টুরেণ্টের টেবিলে দশটাকার নোট রেখে উঠে প'ড়ে বলল 'তিনদিনের জীবন এমনি ক'রে ভোগ করবে, হ্যাঁ ছিটিয়ে দেবে টাকা। নইলে মানুষ কিসের, হ্যাঁ?'

অমল ঢোঁপ গিলল।

উত্তর কলকাতা ছাড়িয়ে দমদমের রাস্তায়, যশোর রোডের উপরে দোতলা বাড়ী। বিরাট পাঁচিলে ঘেরা, মাঝে অনেকটা জমি, বড় বড় বিলিতী পাম গাছের বীথি, নারকেল গাছ, শুকনো ফোয়ারা এবং চারিদিকে ইতস্ততঃ গড়াগড়ি যাচ্ছে দেবদূতের মূর্তি, ভাঙা, পঙ্গু, শ্যাওলা ঢাকা। একদিন তাদের নিরঞ্জন শুভ্র সৌন্দর্য ছিল আজ তারা কার করুণাপ্রার্থী কে জানে। সম্ভবত জোজোর।

গাড়ীবারান্দা পেরিয়ে বেশ সাজান গোছান একটি ঘর। ঘন সবুজ পর্দা সরিয়ে অমল ঢোকে। মেঝেতে কার্পেট, সোফাসেটি, চেআর, টেবিল, হ্যাটর্যাক, অতীত দিনের ডিজাইন। দেওয়ালে দামী দামী অয়েলপেণ্টিং সার সার ঝুলছে, লণ্ডনের হাইড পার্কে অশ্বপৃষ্ঠে ডাচেস,

শিকারের বেশে দেবী ডায়না, কাঁচের পাত্রে আপেল ও আঙুর, অষ্টাদশী ভিক্টোরিয়া দাঁড়িয়ে মন্ত্রী ও বিশপের কাছে রাণী হবার সংবাদ শুনছেন। দরজার ওপরে হরিণের মাথা, সোফাতে মুণ্ড সমেত বাঘছাল, কোণে কাচের আলমারিতে কুমীরের শরীর স্টাফ করা, সর্বত্র একটা ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে ভাব, নিচু পাওআরের একটি বাল্‌ব জ্বলছে।

একটি লোক তাকে বসিয়ে ভেতরে চলে যায়। জোজো আসে।

'বস অমল, এ কি ?'

এতক্ষণে দেখা যায় ঘরের কোণে একটি মেয়ে ব'সে আছে। পিয়ানোর সামনে। বয়স ছাব্বিশ অথবা ছত্রিশ দুই-ই হ'তে পারে। প্রশ্নটি তাকেই।

'তুমি এখানে কেন ?'

মেয়েটি জোজোর দিকে তাকায় না। পিয়ানোর ঢাকনী তুলে ফেলে। আঁচল দিয়ে সযত্নে ধূলো মোছে। একটি বই রাখে সামনে। অমল অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে।

'যূথী !'

মেয়েটি যেন জীবিত নয়, মৃত কোন রমণীর আত্মা, এ ঘরের সঙ্গে পূর্বস্মৃতি জড়িত তাই এসেছে। জোজোর একটি কথাও তার কানে যায়নি। এখন ধীরে ধীরে সে পিয়ানোর চাবিতে সুর তোলে। সুর নয়, সুরের প্রেত, ক্ষীণ অতিক্ষীণ আওয়াজ এবং বিলেতী কোন সুর।

'না, তোমার যন্ত্রণায় দেখছি···'

জোজো দরজার কাছে এগিয়ে যায় এবং লোকটিকে বলে 'নিয়ে যা।'

লোকটি ভাবলেশহীন মুখে কাছে এসে দাঁড়ায়। মেয়েটি পিয়ানো থামায়। ওঠে, অন্যদিক দিয়ে ঘুরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এখন অমলের মনে হয় সম্ভবতঃ একদিন মেয়েটি সুন্দরী ছিল, যদিও এখন তার মুখ সহস্র বছরের প্রাচীন কোন মূর্তির মত প্রাণহীন, এবং নিরতিশয় ক্লান্ত। বাইরের ঐ মূর্তিগুলির মতই ও বিলয়প্রাপ্ত হয়েছে

অনেকদিন আগে। সম্ভবতঃ জোজোর সান্নিধ্যে বেঁচে থাকা কঠিন। অমল কতদিন অটুট থাকতে পারবে?

'এস ভেতরে এস।'

গভীর অস্বস্তি বুকে নিয়ে অমল উঠে দাঁড়ায়। ঘরের ভেতরের দরজা পেরিয়ে প্যাসেজ, কাঠের মেঝে, ঢবঢব শব্দ। আর একটি ঘর। চাবি দিয়ে দোর খোলে জোজো 'এস।'

প্রেস।

প্রেস, মেশিন, ছাপার কাজ চলছে। বিরাট ঘর, এদিক থেকে ওদিক চোখ চলে না, দুটি অবাঙালী চেহারার লোক মেঝেতে বসে গোছাগোছা কাগজ প্যাকিংবাক্সে তুলতে ব্যস্ত। টেবিল থেকে কয়েকটি কাগজ তুলে নেয় জোজো। অমলকে দেখতে দেয়।

'দেখ, ভাল ক'রে দেখ।'

'বুঝতে পারছি না।'

'পারবে, মাথাটা খাটাও বুঝতে পারবে।'

চেনা লেবেল। বিখ্যাত একটি ওষুধ কোম্পানীর তৈরী পেনিসিলিন, এবং ক্লোরিওমাইসিন, দু'টি অতি বিখ্যাত জনপ্রিয় চা-এর প্যাকেটের লেবেল। নিখুঁৎ ও সুন্দর ছাপা, ভুল ধরবার উপায় নেই।

অমল কপালের ঘাম মুছল।

'তুমি এদের লেবেল ছাপ?'

জোজো মাথা দু'দিকে নাড়ল।

অমল একটি তুলে নিয়ে নিরীক্ষণ করে। আশ্চর্য, ওষুধের নাম, কোম্পানীর নাম, কতদিন অবধি মেয়াদ, সরকারী ছাপ সবই নিখুঁৎ।

'ঐ একটি কাজই শিখেছিলাম' জোজোর মুখে গর্বের হাসি।

অমল পেনিসিলিনের লেবেলটি নামিয়ে রাখল। বুকের ভেতরে ভয়ানক গোলমাল। হৃৎপিণ্ড বাজছে ঢং ঢং ঢং! কয়েদী পালিয়েছে অথবা কোন নৃশংস খুনে উন্মাদ বেরিয়ে পড়েছে সুপ্তিমগ্ন নগরে, সাবধান হও, সাবধান হও! সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

'তুমি শুধু চেআরে বসে থাকবে অমল।'

'আমি একাজ করব জোজো! তুমি আমায় দিয়ে শেষ অবধি?'

'বিবেকে বাধছে?' শ্লেষ ও ক্রোধ। চাপা রাগ।

'এ যে ভয়ানক অন্যায়, খারাপ কাজ!'

'আমি তোমায় আগেই বলেছিলাম জোজো?' ঘরের এককোণ থেকে শোনা গেল। মার্জিত, শিক্ষিত, সুন্দর ভারী গলাটি শুনে অমল চমকে তাকাল।

টেবিলের ওপর জুতো সমেত পা, ইজিচেআরে শরীর ঢালা, মুখ থেকে মস্তবড় ঢাউস বিলেতী ম্যাগাজিনটি সরাল লোকটি 'বেশী বিবেকের বালাই যাদের থাকে তারা মনের যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যায়।'

'হ্যা,' জোজো আবার সেই অদ্ভুত শব্দটি দ্বারা অধৈর্য ও অবিশ্বাস জ্ঞাপন করল।

'বলেছিলাম প্যাটেলকে নাও।'

চিনেছে অমল চিনেছে। হঠাৎ বুকের ভেতরে সব গোলমাল থেমে গেল। শরীরের তাপ নেমে যাচ্ছে। তাপ নেমে কি পায়ে চলে যায়? হাত ঘামছে। ভয় পেলে এমন হয়?

লোকটিকে অমল চেনে। মস্ত বড় ঘরের ছেলে, অসাধারণ রূপ ছিল। একদা নিজের এরোপ্লেন ছিল, টোকিও, রেঙ্গুন, কলকাতায় জাহাজ চলাচল করত ওদের। এখনও ফিরে ফিরে তাকাবার মত চেহারা। সিল্কের শার্ট, ধুতি, পায়ে শু জুতো, মাথায় টুপী (শোনা যায় জুতোর সোলে ছোট পিস্তল রাখে, মাথায় একটা মস্ত ক্ষত চিহ্ন আছে) তোতামিত্তিরকে সবই মানিয়ে যায়। সবাই তাকে ভয় পায়। পুলিশ তাকে ক্বচিৎ ধরতে পেরেছে। রাজনীতি করত এবং স্বাধীনতার পর পরই কয়েকটি খুনসমেত রাহাজানির ব্যাপারে ওর নাম ঘনঘন শোনা গিয়েছিল।

নাম! নামের অপার মহিমার কথা বলত পুলক। নামের ক্ষমতাই বা কি সাংঘাতিক। তোতামিত্তিরকে চিনে ফেলতেই অমলের মুখে

চোখে যে পরিবর্তন ঘটে তা দেখেই জোজো বুঝে নেয়, অমল বেদম ভয় পেয়েছে। বলে 'চল পাশের ঘরে চল।'

'না না, আমি পারব না' অমল হাঁপাতে হাঁপাতে বলে। জোজো। হাসল। বলল 'তুমি এখনো কি শিশুই আছ।

পরে অমল বোঝে জোজো সিংগি কতবড় মনস্তত্ত্ববিদ। তোতা-মিত্তিরের সঙ্গে জোজোসিংগির ছাপাখানার কোন যোগাযোগই নেই। ও লোকটার ওখানে উপস্থিত থাকা একটা নেহাৎই একটা ঘটনামাত্র। অমলের মনে হয়েছিল এর পেছনে গভীর ও গোপন ষড়যন্ত্র আছে। সে রাজী না হলে তোতামিত্তির হয়তো তাকে—! পরে সে বুঝেছে দেশটা কিছু মগের মুলুক নয়, তবু চিরকালই অমল দুর্জনের সঙ্গকে ভয় করেছে। অমলের মনের ঐ অব্যবস্থিত অবস্থাটির সুযোগ জোজো ছাড়ল না।

পরে বলেছিল 'তোমার কি, আমার কি? যারা চা-পাতার বদলে চামড়ার কুচি চালায়, যারা জাল ওষুধ তৈরী করে পাপ তাদের হচ্ছে। আমি অর্ডার পাচ্ছি, লেবেল ছাপছি, বাস্ ফুরিয়ে গেল!'

'যদি ধরা পড়!'

'হ্যা।'

'ওষুধ বিশ্বাস ক'রে লোকে ব্যবহার করবে, চা লোকে ব্যবহার করে!'

'ওহে এ-সব কি এখানে তৈরী হচ্ছে? অন্যস্টেটে হচ্ছে, আরো দূরে দূরে যাচ্ছে।'

'তবু!'

'মরবে এই কথা? মরুক!' জোজো গলাটা উঁচু করে তুলে নিঃশব্দে হাসল, মনে হ'ল সে সর্বশক্তিমান, ভারতবর্ষের মানুষদের মরতে বলছে। আমার কাছে ওসব কথার কোন দাম নেই। ভেজাল সর্বত্র, জালিয়াতি চতুর্দিকে, দেশটা এখন কারো হাতে নেই এবং যার যা খুশী তাই করছে।

মানুষ এমনিতেই মরবে, এই দামে চালডাল কিনতে পারবে না, চাকরী পাবে না। যারা কাজ করছে তাদের মাইনে বাড়বে না, সমস্ত কেটে নেবে, সব, সব। মানুষ একটু একটু ক'রে মরবে, তার নাম স্লো ডেথ স্যাংশনড বাই ল। ওদিকে বর্ডারে নোংরামি, এদিকে খোদ কলকাতায় বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। জাল পেনিসিলিন নিয়ে! আরে, এ ওষুধে যত লোক মরবে তার চারগুণ মরবে না খেয়ে। আরো কিছু মরবে অসুখে, মড়কে, তবে ঐ যা বললাম' বেশী মরবে আস্তে আস্তে, আইন বাঁচিয়ে খুন! ঐ ত কতলোক নিত্যি মারা যাচ্ছে করতে পারছ কিছু?'

আরো কাছে এল জোজো 'যত মরে ততই ভাল। যখন হাফপ্যাণ্ট পরে পথে পথে ঘুরতাম, পেচ্ছাবখানার দেওয়ালে হ্যাণ্ডবিল সাঁটতাম, তখন কার্জন পার্কে বসে আমিও সৎকথা ভাবতাম হে। বেলুড়ে গিয়ে পড়ে থেকেছি। এখন আর কিসসু মনে হয় না, দিনঅন্তে একটি সৎকথা স্মরণ করি না।'

অমল চুপ!

'সৎকথা! বইয়ের কথা!' ঘেন্নায় মুখ বাঁকাল জোজো থুথু ফেলল 'যারা বই লেখে তাদের দেখা আছে। আছে একটা লোক সদা-সর্বদা পায়ে মোজা পরে নোংরা ঘা ঢেকে রাখে, বদমায়েশী আর বেলেল্লাগিরি ক'রে বেড়ায়। এক সময়ে হাসির ছড়া লিখত এখন সর্বত্তর দালালী মারে। লম্বা কালো সিড়িঙ্গে চেহারা রূপার ছব্বা কি! আগে নোংরা বই লিখত, পুলিশের হাঙ্গামায় পড়ত আর আমার হাঁটু ধরে কেঁই কেঁই করত। সে লোক এমন চরিত্রের যে তাকে আমি একটা বাঁশ দিয়ে ছুঁতেও রাজী নই, কাছে যাওয়া দূরের কথা।'

'একটি লোককে দেখে জগৎকে বিচার করা উচিত নয়।

জোজো এসেন্সের শিশিটি খুলে ঘনঘন শুঁকল 'ভাল কথার দিন নেই, ভাল মানুষের দিন নেই। আসল কথা কি জান? বাঁচতে হ'লে রোজ একটি ধোপদোরস্ত জামাকাপড় চাই, পায়ে চল্লিশ টাকার জুতো পরব, ভোগেরাগে জীবন, ভোগেরাগে জীবন। শার্ট আর ধুতি পরে

ত কম ঘুরলে না কলকাতার শহরে, পেলে কিছু ? ঐ ত' রিপোর্টার বন্ধুর জন্য জানপ্রাণ কবুল ক'রে টাকা নিয়ে গেলে, সে অর্ধপয়সা ঠেকিয়েছে ?'

'তুমি পুলকের কথা কেমন ক'রে জানলে ?'

'যেমন করেই হোক। তোমার বিপদে আপদে ও এগোবে ভেবেছ ? ভুল, ভুল ! বিপদে তোমায় দেখব আমি !' বিপদবারণ জোজো বুকে দামামার মত শব্দ করল হাত ঠুকে, শুনতে শুনতে অমল মাথার দু'পাশের রগ টিপে ধরল।

'তবে হ্যাঁ। একটি জিনিষ চাইব তোমার কাছে' জোজো হাসল এবং নিচুগলায় বলল 'সিক্রেট। কারুকে কিছু ব'ল না। কাজটা ত' ভাই ভাল না !'

অমল বুঝেছিল জোজোর সঙ্গে জড়িয়ে পড়া মানে নিজেকেই নষ্ট করা। সে জানত, যখন ব্যর্থতায় লোভে, মোহে তার মন দুর্বল তখনই ছিদ্রপথে প্রলোভনের ছলে সর্বনাশ ঢুকে পড়ে। জেনেও কিছুতেই নিজেকে বাঁচাতে পারল না। বাঁচানো যায় না, নিয়তি। নিয়তিকে কে এড়াতে পারে ? কেউ না। অথচ তার শক্তিতে মানুষ বিশ্বাস করে না।

অমলের মনে 'নিয়তি' কথাটি শুধু যাত্রাদলের আসরে দেখা সেই পুরুষটির ছবিই বারবার এনে দিয়েছে, যে পুরুষটি রমণী বেশে বিলম্বিত জটাজাল ও গেরুয়াবসনে ত্রিশূল হাতে শুধু পথভ্রষ্ট রাজারাণীদের সাবধান ক'রে বেড়ায় অথচ হিরণ্যকশিপু থামে পদাঘাত করেন, সীতা রাবণকে ভিক্ষা দিতে যান, উত্তানপাদ কদাপি ধ্রুবকে কোলে নেন না।

অমল নিয়তিকে এড়াবে কি করে ? শনি সুযোগ খুঁজছে জেনেও নলরাজা কেন পা ধুতে ভুলে গেলেন ? বড়বড় মহারথীরা পর্যন্ত নিয়তির করাল মুষ্টিতে মৃত বিষধর সাপের মত নির্জীব হ'য়ে ঝুলতে থাকেন। অমল ত' কীটের অধিক কীট, ধূলোর কণা স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ পর্যন্ত

পারেননি। প্রৌঢ় শ্রান্ত পুরুষ যত্নবংশের আসন্ন সর্বনাশের কথা চিন্তা করছিলেন, অথবা ভারতভূমির কথা? যে মহাভূখণ্ড তিনি রক্তে নিষিক্ত করেছেন? কি ভাবছিলেন তা আর জানা গেলনা, কেননা তখনই জরাব্যাধ তাঁর গোড়ালিতে বাণ মারল। দেবদেহে রক্তকমল সদৃশ গোড়ালিটি ছিল অরক্ষিত এবং নিয়তির দিকে সেই পা প্রসারিত ক'রে ভগবান বিশ্রাম করছিলেন।

॥ দশ ॥

'যাক, শেষ অবধি ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।'

জোজোর সঙ্গে অমল কাজ করছে জেনে বাবা খুব খুশী হ'য়েছিলেন। মাকে বললেন 'একবার পুজো দিয়ে এলে হয়', অমলের আপত্তি বা বিরক্তি গ্রাহ্যই করলেন না। যেন এটুকু করেননি ব'লেই ভগবান মুখ তুলে চাননি।

সন্ধ্যের দিকে পিসীমা বেড়াতে এলেন।

সব শুনেটুনে মহাখুশী। পানের পিচ ফেলে বললেন 'হুঁঃ, বউ ত' সকলকে বলত নিতেটার কিচ্ছু হ'ল না।' শুনেই অমলের মনেহ'ল কথাটি যথেষ্ট বিশ্বাস যোগ্য নয় কেননা গত বহুদিনের মধ্যে তাদের বাড়ীতে এমন কোন আত্মীয় সমাগম হয়নি। কেউ এলেও মা'র পক্ষে অমন কথা বলা সম্ভব নয়। বাইরের কারু কাছে নিজের সংসারের গল্প করবার স্বভাব তাঁর নেই।

মা কিছু বললেন না। বাবাকে ডেকে জলখাবার আনতে বললেন। পিসীমা, পিসতুতো বোন দু'টি পিসীমা'র ছেলে। এঁর স্বামীর লোহার দোকানেই ব'সে ব'সে অমল ধর্ণা দিত একসময়। এই পিসেমশাইটি অমলের বাবা সম্পর্কে কোনদিনই উচ্চ ধারণা পোষণ করেননি। অমল ভাল করেই জানে পিসীমা ও স্বামীর সঙ্গে একমত। এত জানা সত্ত্বেও এ বাড়ীতে ওঁদের সঙ্গে খুব ভালব্যবহার করা হয়। আদর যত্ন আতিথেয়তার কোন ত্রুটি থাকে না। দামী চা আনা হয়, বাক্সের তলাথেকে তোলা পেয়ালা প্লেট বেরোয়, বড়বড় সন্দেশ, মিষ্টিপান, তা ছাড়া পিসীমা'র নানারকম আবদার আছে 'তোমাদের এদিকে কি চমৎকার তেলেভাজা পাওয়া যায়, মচমচে মুড়ি। তাই খাব গরম গরম, সন্দেশ খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে বাপু।'

নিজের অবস্থার কথা অমন ঘনঘন শোনাতে ভালবাসেন। এই

সেদিন জামাই এসেছিল মেয়েকে নিতে, সঙ্গে মিষ্টি দেওয়াহ'ল, 'তুমিই বলনা বউ, পঁচিশটাকার কমে কি মিষ্টি হয়?' কি একরকম নতুন কাপড় উঠেছে সেদিন বাড়ীশুদ্ধ সবাই কিনল 'ভারী সস্তা, কে জানত বল আজকাল এতরকমও হয়েছে, বিশবাইশ টাকায় দিব্যি বাইরে বেরুবার মত কাপড় হয়, মেয়ের বন্ধু এসেছিল তাকে কিনেদিতে হ'ল।'

পিসীমার কথা শুনে অমলের খারাপ লেগেছে।' আশ্চর্য, যাঁকে কথাগুলো বলাহচ্ছে তার কাছে এ কথাগুলো বলা একধরণের নির্বোধ নিষ্ঠুরতা তা পিসীমা বোঝেননা কেন? মা'র কাছে বিশ বাইশ টাকা অনেক টাকা, শৌখীন কাপড় কিনে ফেলে ছড়িয়ে দেওয়ার চেয়ে সে টাকা এ বাড়ীতে অনেক দরকারী কাজে ব্যবহার করা যায়। খারাপ লেগেছে তার, সঙ্গে সঙ্গে করুণা হয়েছে পিসীমার ওপর। মা'র এই চুপ ক'রে শুনে যাওয়াটা তিনি সহ্য করতে পারেন না। ঈর্ষ্যায় অমলের মা চিড়বিড় করছেন দেখলেই তিনি খুশী হবেন। পিসীমা স্বভাবে বড়ই স্থূল, নিজের ঢাক নিজে পেটাতে চান এবং সে বাদ্যি শুনে সবাই অভিভূত না হ'লে তাঁর রাগ হয়।

মাঝেমাঝে অকারণে তিনি মিথ্যেকথা ব'লে থাকেন 'বুঝলি নিতু তোর পিসেমশায় ত তোর বাবাকে ব্যবসা করবার জন্যে টাকা দিতে চাইলে, দাদা রাজী হ'ল না।' একবার কি কারণে চটে গিয়ে তিনি কসবার বাড়ীতে আত্মীয়দের বলেছিলেন 'নিতু কি ছেলে তৈরী হয়েছে জাননা, যতরাজ্যের জোচ্চোরদের সঙ্গে মেশে।'

অমল অবাক হ'য়ে ভেবেছে অনেক টাকা থাকলে কি আশ্চর্য ক্ষমতা পয়ে যায় মানুষ, মিছে মিছি বাজে কথা বলে অপরকে ছোট করে অনায়াসে।

আজও পিসীমা মা-কে খোঁচাদিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন 'আশীর্বাদ করনা ছেলেকে, কথায় বলে মা-র আশীর্বাদ। ওর মাথায় ঠোকনা মেরে যাচ্ছ কোথায়?' বিরক্ত হ'য়ে অমল ও ঘরে চলে গেল।

পিসীমা আর কি বললেন শোনালেন না, কিন্তু মা'র গলা দিব্যি স্পষ্ট

কানে এল 'আগবাড়িয়ে আশীর্বাদ করিনি, ইচ্ছে করেই যাইনি। চিরটাকাল জেনে আসছি যে কাজে আমি এগিয়ে যাই সেটিই পণ্ড ক'রে বসি। তোমাদের বাড়ীর যত সর্বনাশ সব আমার জন্যেই হয়েছে এ কথা ত' তুমিই কতবার বলেছ। তাই ভাবলাম শুভকাজটা আর নষ্ট করি কেন? কারবার ব্যবসার কথা ত' বলা যায়না, যদি এমন তেমন কিছু হয় তখন তুমিই সবার আগে বলবে বউ যখন আগবাড়িয়ে আশীর্বাদ করতে ছুটেছ তখনই জানি এর ফল ভাল হবে না।'

পষ্টকথায় কষ্ট নেই এ-সব নেহাতই মেয়েলীবুলি। গরীবের মুখের স্পষ্টকথা কেউ সহ্য করে না এ অমল কতবার দেখেছে। পিসীমা রেগে, কেঁদেকেটে এক কাণ্ড বাধালেন। পরে অমলের বাবা মা সবাই তাঁর হাত ধ'রে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেন।

সত্যিকথা বলা না কি খুব ভাল। সত্যিকথা স্পষ্ট গলায় যে বলে তাকে দশজনে মানে, শ্রদ্ধা করে এ শুধু শোনা যায়। ব্যবহারিক জীবনে এসবের কোন দাম নেই। বিশেষ ক'রে পকেটে পয়সা না থাকলে সত্যনিষ্ঠা, স্পষ্ট ভাষণ এগুলো লোকসমাজে পাত্তা পায় না। পুলক বলত 'নাম কর দেখি আগে? নামকরাটা সবচেয়ে আগে দরকার। যারা কোনমতে নাম ক'রে ফেলেছে তারা যা করবে তাই ভাল, নাম না থাকলেই সবই ফাঁকা। মা'র অসুখের সময়ে তুমি জলঝড় ঠেলে নদী সাঁতরে বদ্যি ডাকতে যাও দেখি? কেউ বলবে একবার? বলবে না, কেননা তোমার নাম নেই।'

কে জানে পুলকের কথা সত্যি কি না! তবে সর্বদা নির্ভীক ভাবে স্পষ্ট ও সত্যি কথা ব'লে ব'লে মা আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কতটা অপ্রিয় হয়েছিলেন তা অমল দেখেছে।

জোজোর ওখানে কয়েকদিন যাওয়া আসা করতে করতে অমলের কাছে কাজটি বেশ সহজ হ'য়ে এল। সবচেয়ে বড় স্বস্তির কারণ জোজোর সঙ্গে বলতে গেলে দেখা হয় না তার, যদিও বুঝতে দেরী

হয়নি, জোজো অনেক সময়ে বাড়ীতেই থাকে। অমলের সামনে কচিৎ আসে সে, মাঝেমাঝে পাশের ঘরে তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়, তোতামিত্তির এবং আরো দু একটি লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে।

আসল অস্বস্তির কারণ হচ্ছে সেই মেয়েটি।

প্রায়ই অমল তাকে দেখতে পায়। একা বাইরের পোড়ো জমিতে ঘুরছে, চুপ ক'রে বসে আছে গাড়ীবারান্দায়। পাশের ঘরের জানলা খুলে পর্দা সরিয়ে দিতে দেখেনি অমল কোনদিন, মাঝে মাঝে দরজার ওপরের কাচটা নীলচে সাদা আলোয় উদ্ভাসিত হ'তে দেখলে বোঝা যায় মেয়েটি ঘরে ঢুকেছে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই ও পাশের ঘরে এসেছে বুঝলেই অমল মনেমনে মৃদু একটি কৌতূহলের উত্তেজনা টের পায়।

কখনো কখনো পিআনোতে টুং টুং শব্দ শোনা যায়। ধৈর্য ধরে দশমিনিট-ও বাজায় না কোনদিন। যাওয়া আসা করতে গেলে বসবার ঘরের দরজাটি পেরোতে হয়, দেখা যায় মেয়েটি চুপ ক'রে বসে আছে। সদাই অবসন্ন চেহারা তার, ক্লান্ত, অতি ক্লান্ত, হাতদুটি পাশে নামানো, যেন হাত তুলে বিশ্রামের বা আরামের ভঙ্গীতে এলিয়ে বসবার পরিশ্রমটুকুও ও স্বীকার করতে রাজী নয়। চোখ তুলে মাঝেমাঝে চেয়ে থাকে। অমলের মনে হয়েছে ওর চোখ দুটো খোলা থাকলে কি হয়, কি দেখছে না দেখছে তা' বোঝবার ক্ষমতা ওর দ্রুত কমে আসছে।

একদিন, অমল চুপ ক'রে কাজ ক'রে যাচ্ছে, হঠাৎ চোখ তুলে দেখে মেয়েটি তার দিকে চেয়ে আছে। অমল চেয়ে আছে, সেও চেয়ে রইল। মনে হ'ল চোখ ত' দেখেনা, আসলে দেখে মস্তিষ্ক। যে স্নায়ুগুলো মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, সেগুলো বোধহয় অনেকদিন আগেই মরে গেছে।

গভীর অস্বস্তি। অমল দু'একবার ভাবল কথা বলাটা উচিত হবে না, তারপর দাঁড়িয়ে বলল 'আমায় কিছু বলবেন?'

মেয়েটি চেয়ে রইল। তারপর আস্তে বলল 'দেখলে মনে হয় না।'

কি মনে হয় না? অমল বুঝতে পারল ঘাড় ও কান গরম হ'য়ে যাচ্ছে, এবং কি অস্বস্তি, তখনি তোতামিত্তির ঢুকল।

বহুদিন ধ'রে অভিনয় হ'তে থাকা কোন নাটকের মাঝখান থেকে ছেঁড়া ছেঁড়া দৃশ্য দেখল অমল, সংলাপ শুনল। সে বহিরাগত, ঘটনাচক্রে দর্শক, পাত্রপাত্রী পরস্পরের বহু চেনা।

নাটক বই কি, নইলে তোতামিত্তিরের ব্যবহারে এক আশ্চর্য সৌজন্য দেখা গেল, যার অর্থ বোঝা অমলের সাধ্যের বাইরে।

'কি, যূথী এখানে যে?'

'দেখলে মনে হয়না তাই না তোতা?'

'কি মনে হয়না যূথী?'

'দেখনা ছেলেটি কি নিরীহ, ভদ্রলোকের মত দেখতে।'

'কে, অমলবাবুর কথা বলছ?'

'কিন্তু নিশ্চয় আসলে ভাললোক নন।'

কে বললে? খুব ভাল লোক। চল, বাইরের ঘরে বসি।'

তোতামিত্তির মেয়েটির হাত ধ'রে চলতে থাকল। মেয়েটির আপত্তি করল না। যেতে যেতে আবার বলল 'ভাল লোক হ'লে কখনো জোজোর সঙ্গে আসেন?'

তোতামিত্তির কি বলল বোঝা গেল না। অমল ব'সে পড়ল। নিশ্চয় পাগল, কিন্তু পাগল বলে ত' মনে হয় না। হঠাৎ এমন ভাবে কথাবার্তা বলার মানে কি? মেয়েটি কে?

মেয়েটি কে মনে করতে গিয়ে অমলের হঠাৎ মনে হ'ল জোজোর সামনে তোতামিত্তির ওর সঙ্গে কথা বলে না, অথচ এখন হাত ধ'রে বাইরে নিয়ে গেল। যদিও এ বাড়ীতেই থাকে, সম্ভবত জোজোর স্ত্রী, তবুও ওর কথাবার্তা ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয় ওর জন্ম এবং বড় হওয়া অন্য পরিবেশে। তা ছাড়া, বুঝতে দেরী হয়না ভেতর থেকে ও একেবারে নিঃশেষিত, সম্ভবত মৃত। কেননা কোন সময়েই অমলের ওকে স্বাভাবিক মনে হয়নি।

অমলকে আরো অবাক করল তোতামিত্তির। ঘণ্টাখানেক বাদে এসে কাছে দাঁড়াল। উসখুস ক'রে বলল 'যূথীর কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'না', অমল চোখ তুলে চাইতে ভয় পাচ্ছে। চিরকাল যার নামে এত গল্পগুজব শুনে এসেছে সে-লোকের কাছে দাঁড়াতে ভয় হবারই কথা।

'জোজোকে কিছু বলবেন না'। সংক্ষিপ্ত কথা, স্বরটি আদেশের !·

'না, বলব না।'

সেদিনই সন্ধে থেকে কি দুর্যোগ, বাড়ী ফিরতে দেরী হ'ল। ফিরে শোনে জোজো এসেছিল। তার অনুপস্থিতিতে এসেছিল এবং একটি খাম রেখে গেছে।

মুখ আঁটা পেটফোলা খামটি খুলে ফেলে অমলের ভাল লেগেছিল। এত টাকা সে রোজগার করেছে ? পাঁচশো টাকা হাতে পেয়ে মনে হয়েছিল রাজ্যজয় করতে পারে সে, অনেক ক্ষমতা তার। কিছুক্ষণ নানারকম কল্পনার বাষ্পে মনটা বেশ হালকা হ'য়ে ভেসে রইল, তারপরই পুরোনো চিন্তার খচখচানি সুরু হল। কি করছে সে, ন্যায় কি অন্যায়। জোজোর যতটা পাপ হচ্ছে তার চেয়ে তার পাপের ওজনটা কিছু কম কি না !

এ সময়টা সরিৎকে পর্যন্ত ভাল লাগত না অমলের। ভাল লাগবে কি করে, সরিৎ যে অত্যন্ত প্রাচীন এবং সকলের জানা ধারণাগুলোই আঁকড়ে বসে থাকল। হয়ত ব'লে বসল সব অপরাধের ক্ষমা আছে কিন্তু ওষুধ নিয়ে, খাবার জিনিস নিয়ে যারা ভেজালের কারবার করে তাদের ক্ষমা নেই।

'তাদের কি করা দরকার ?'

সরিৎ জটিল চিন্তার ধার ধারে না। অমায়িক এবং মিষ্টি হেসে বিধান দিল "দেওয়ালের দিকে মুখ, পিঠে একটি গুলী।"

'সব সময়ে ত' তা হ'চ্ছে না।'

'হচ্ছে না বলেই ত' এত ভাবনা।' রীতিমত ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়ল সরিৎ 'এখন বোঝা যাচ্ছে না, কুড়ি বছর বাদে বোঝা যাবে।'

'কি বোঝা যাবে?' না, সরিতের স্বভাব আর পাল্টাবে না। নিজের ও পরের হাজার রকম ভাবনা ভেবে তার পরেও ও এত কথা চিন্তা করে কেন অমল জানে না। রাগ হয় এক একসময়ে কিন্তু মনে মনে সরিৎকে ভালবাসে, শ্রদ্ধাসমীহ করে সে ঐ বেখাপ্পা স্বভাবেরই জন্যে।

'আজ যারা ছোট তারা যা খাবে তাতে ভেজাল, অসুখ হ'লে খাঁটি ওষুধ পাবে না। কুড়িবছর বাদে এ দেশের যুবকদের শরীরে মনে শক্তি সামর্থ্য থাকবে না, কাজ করতে পারবে না, ভাবতে পারিস, শরীর রোগের ডিপো, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, ভাবলে মনে হয়, কি মনে হয় বল্‌ত?'

সরিতের কথা শুনে অমলের বুকে অস্বস্তি চেপে ধরে। এ-সব ত ভাসা ভাসা কথা। অমল তার পাশে ব'সে আছে। অমলের জ্ঞাতসারে সপ্তাহে হাজার হাজার লেবেল ছাপা হয়, জাল পেনিসিলিন, চামড়ার কুচি মেশানো চা বিক্রী হয় এবং ঐ ইঞ্জেকশান নিয়ে যখন একটি মরে, ঐ চা খেয়ে যখন শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ে তখন অমলেরও পাপ হয় একথা জানলে সরিৎ কি বলবে? দেওয়ালের দিকে মুখ এবং পিঠে একটি গুলী?

বন্ধুকেও সেই বিধান দেবে না কি? প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্যে অমল বল্‌ল 'নীতার খবর কী? তোরা বিয়ে করছিস না কেন?'

সরিৎ একটু হাসল। বলল 'জানিস, হাসিটার একটু একটু ক'রে উন্নতি হচ্ছে।' আঙুল গুণে বলল 'তিনমাস হ'য়ে গেল কোনরকম বাড়াবাড়ি হয়নি। মনে হয় কবরেজের ওষুধে কাজ হয়েছে।'

'ভাল আছে মন্দ হ'তে কতক্ষণ?'

'ভাল হচ্ছে বলেই মনে হয়। তা ছাড়া বিয়ে করব, সংসার করব সে-সব দিকে যে ভারী ঝোঁক। নীতা বলে ওর ভাল হবার মুখটায়

ওরই চোখের ওপর দিয়ে বিয়ে করলে সেই ধাক্কায় যদি রোগটা আবার চেপে ধরে ?'

'তবে কি অনির্দিষ্টকাল দেরী করবি না কি ?'

'যাঃ, তবে আমাদের সময় ত' পড়েই আছে, যদি ও মেয়েটার একটু উপকার হয় সেজন্য কষ্ট করলেও পুণ্য হবে।'

'এক এক সময়ে মনে হয় তুই যেন আদ্যিকালের সন্ন্যেসী বা সাধু।'

'সাধু কিসের ? এই ত' দিব্যি মজায় আছি।'

'কি মজা ! আমি আর জানিনা এখন নীতাদের সকলের ভাবনা ভেবে মরছ তুমি।'

'হাসির মুখটা যদি দেখতিস !'

মনে পড়ল। বিধাতার পরিহাস। যে দেখতে অত সুন্দর তাকেই করলেন উন্মাদ। হাসির তুলনায় নীতা ত' কিছুই না। স্বাস্থ্য নেই, দেখতেও তেমন নয়, চেহারাটা কি মিয়োনো, দেখলেই মনে হয় কে দু'গালে চড় মেরে চুপ ক'রে থাকতে বলেছে।

'নীতা মেয়েটা কিন্তু খুব ভাল।'

সরিতের কথা শুনে অমল হেসে ফেলল 'নীতার কথা ভাবছিলাম বুঝলি কি ক'রে ?'

'বোঝা যায়। হাসির কথা উঠলেই ওর কথা মনে পড়বে।'

'ভাল হ'লেই ত' ভাল।'

হঠাৎ কি মনে হ'ত সরিৎ হাসল। বলল 'দৈবদ্বিজে ভক্তি খুব। আজ এটা কাল ওটা লেগেই আছে। পটের নিচে মাথা ঠুকে ঠুকে কপাল ফুলিয়ে ফেলল।'

'করলেই না, তোর তাতে কি ?'

'আমার আর কি ! যাই ত' কালে ভদ্রে, সে-ও ওর দাদা বাড়ী ফিরলে তারপর। বলি ওসব ক'রে কোন লাভ হবে না, আমাদের বাড়ীর লোকরা ওতে নরম হবে না।'

'যাঃ !'

'সত্যিই বলি। আরো যা যা বলি শুনে এক সময়ে নীতা কাঁদতে বসে।'

'না বললেই পারিস।'

'না না, সত্যি কথাই জানতে দেওয়া ভাল। ও যদি মনে ক'রে থাকে এ বাড়ীতে মা বউদি সবাই ওর পথ চেয়ে আছে তাহ'লে ভুল করবে।'

'ওঁরা পরে ঠিকই বুঝবেন।'

'বুঝুন না বুঝুন তাতে কি ভাই। আমি ওর ওপর যে কর্তব্য করবার তা ঠিকই করব, বাস!'

'তড়িৎদা কি বলে ?'

'উপদেশ দেয়। শেষমেশ অবিশ্যি নিজেই নিজের কথার ফাঁদে পড়েছিল।'

'কি রকম ?'

'ক'দিন খুব বলত এই, ওদের বাড়ী ঘনঘন যাসনি, পাড়ায় কথা হয়, আমাদের বাড়ীর একটা সম্মান আছে, এইসব! দিলাম হুম্ ক'রে যাওয়া আসা বন্ধ ক'রে। আড়াইমাস বাদে একদিন পটল সাইকেল চেপে এসে উপস্থিত। বাড়ীতে ঢুকতে সাহস পায়নি বাইরে দাদাকে ডেকে কি জিগ্যেস করেছে। আমি বাড়ী ফিরতে দাদা ত' আমায ব'কে শেষ করলে। যেতে বারণ করেছি ব'লে অভদ্র হ'তে বলিনি।'

সরিৎ একটু হাসল 'দাদা একটু মুস্কিলে পড়ে গেছে, আমায় কিছু বলতে পারেনা অথচ মা-ও দাদাকে খোঁচাতে ছাড়ে না।'

অমল তার বাবার কথা ভাবছিল। বাবারও মুস্কিল হয়েছিল। বাড়ীর কর্তা হবার অনেক জ্বালা। তাঁকে কেউই মানত না। সরিৎদের বাড়ীতে ও'রকম লোক দেখানো মানামানি নেই। তড়িৎ পারতপক্ষে সরিৎকে ঘাঁটায়না। তড়িতের বউ অথবা মা-ও বেশী কথা বলেন না ওর সাথে। সবাই জানে সরিৎ যা করে বুঝেশুনেই করে। সুন্দর একটা সামঞ্জস্যজ্ঞান আছে ওর। যার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করা

দরকার, যাকে যেমন সম্মান দেখানো উচিত তা'তে সরিতের ত্রুটি হয় না কিন্তু তার বাইরে সবার উপরে হ'ল ওর নিজের স্বাধীনতা। অনেক লোকের নানা ঝামেলায় ঘাড় পাতবে, দায়িত্ব নেবে, তা নিয়ে কেউ কিছু বললেও শুনবে না।

অমলের ধারণা তড়িৎ মনে মনে ছোট ভাইকে ভয় পায়। হঠাৎ, সরিতের ওপর ঈর্ষ্যা হ'ল তার, রাগ। নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত জীবন, নিজে নিজে ভালমন্দ সৎ-অসৎ সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তাই নিয়েই আছে। অমলের মত এতরকম অশান্তি, জ্বালা, যন্ত্রনা কিছুই ও জানে না। বিয়ে করবে, অনুগত স্ত্রী পাবে। ছকবাঁধা জীবন, এ চৌখুপির পর ও চৌখুপিতে পা রেখে নিয়ম মেনে চলতে চলতেই ও সব কিছু পেয়ে যাবে।

'বাড়ীর লোকদের দোষ দিতে পার না তুমি, তারা তোমার চোখে নীতাকে দেখবে না, সেইটাই স্বাভাবিক।'

বন্ধুকে এটুকু খোঁচা না দিয়ে অমল স্বস্তি পাচ্ছিল না।

॥ এগারো ॥

একদিন, খুব বিশ্রী একটা ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে অমলের সঙ্গে যূথীর পরিচয় হ'ল।

কিছুদিন থেকেই দেখা যাচ্ছিল জোজো সদাই ব্যস্ত। বিকেলে ঘনঘন এ বাড়ীতে আসে। সঙ্গে ক'জন লোক থাকে। বাইরের ঘরে অনেক রাত অবধি কথা হয় নিশ্চয়, কেননা সকালে এসে অমল দেখতে পায় চাকর ওঘর থেকে চা-এর পেয়ালা, সিগারেটের টুকরো বোঝাই ছাইদানী বের করছে।

নিজের টেবিলে ব'সে অমলের সময় কাটে না।

আশ্চর্য জায়গা, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। বিরাট ঘরে মেশিন চলছে। দরজা এবং জানালায় মোটা ফেল্‌ট কাপড়ের লাইনিং। চেপে বন্ধ ক'রে দিলে বাইরে থেকে শব্দ আসে না, ভেতরের শব্দটাও চাপা পড়ে যায়। যারা কাজ করে, মেশিন চালায়, যে গুজরাটি প্রৌঢ় লোকটি আসে তারা কেউ অমলের সঙ্গে কথা বলে না। অর্ডার অনুযায়ী কাজ উঠছে কি না দেখে অমল, সই ক'রে টাকা দেয় লোকদের, মাল প্যাকেট বোঝাই হবার আগে চেক ক'রে সই দেয়।

আগে ওর জায়গায় যে বসত, সে-ও বোধহয় সময় এবং অবসরের ভারে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ত। তার সময় কাটাবার জন্যেই, সম্ভবত অনেক গুলো ফিল্‌মের ছবিতে ছড়াছড়ি পত্রপত্রিকা দরকার হ'ত। নিরুপায় অমল বাড়ী থেকে বই নিয়ে আসত একখানা ক'রে।

সেদিন বই মুখে ব'সে আছে।

বিরক্ত হ'য়ে মাঝেমাঝে বাইরে তাকাচ্ছে। বিষ্টি আর বিষ্টি। ভাদ্রমাসের আকাশ একবার সুরু করলে আর থামতে চায় না। ব'সে ব'সে বিষ্টি দেখাটাই ত' সব নয়। এরপর ফিরবার প্রশ্ন আছে।

কলকাতার যা হাল হয়েছে, একটু বিষ্টি হলেই রাস্তা বন্ধ, একটি পটকা ফাটলেই বাসট্রাম বন্ধ, কেমন ক'রে যে বাড়ী ফিরবে অমল জানে না। হলঘর আর বাইরের ঘরের মাঝের দরজাটিব মাথার কাচটি অন্ধকার। বোঝা যায় ও ঘরে কেউ নেই।

ওপরের দিকে চাইল।

ওপরে একটাও আলো দেখা যায় না। আলো নেই, লোকজন নেই, এক একা মেয়েটি থাকে কি করে? সে ত' কিছুক্ষণের জন্যে আসে এবং চলে যায়। তবু, এক একা এক এক সময়ে নিজেকে বড় বিপন্ন মনে হয়। কেউ তার সঙ্গে কথা বলেনা, নিশ্চয় জোজোর নিষেধ আছে। মাঝেমাঝে দেখে শুধু তোতামিত্তিরকে, যে কখনো কখনো কথা বলে। ওকে দেখলেই অমলের হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করে, অরক্ষিত অসহায় ভাবটা বেড়ে যায়। যা শোনা যায় তার একাংশও যদি সত্যি হয়? কি অসাধারণ চেহারা, বংশের আভিজাত্য কপালে, বসবার ভঙ্গীতে, ভারী ও নিচু গলায় কথা কইবার ধরণে। অথচ এই লোকটিই খুনে। সবাই ওকে ভয় পায়। শোনা যায় স্বাধীনতার ঠিক পরে পরেই ও রীতিমত রাজনীতিক গুণ্ডামি করত এবং বউবাজারের সেই নীল বাড়ীটার ভেতরে ঢুকে স্টেনগান চালাবার সময়ে ডান হাতের তর্জনীটি খুইয়ে বসে। কে জানে সত্যি কি না, তবে ডানহাতটি প্রায়ই ট্রাউজার্সের পকেটে থাকে।

তোতা ছাড়া আর কেউই অমলের সঙ্গে কথা বলে না।

আজ, বিষ্টিঝরা ভসভসে গরম সন্ধ্যেয় ব'সে ব'সে অমল নিজের নিঃসঙ্গতা অনেক বেশী উপলব্ধি করতে পারল। বন্‌বন্ ক'রে পাখা ঘুরছে, গায়ে বাতাস লাগছেনা এতটুকু। জামা গেঞ্জী দুটোই ঘামে এমন ভিজেছে যে গেঞ্জীর সুতোগুলো বুঝি গলেই গেল। তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে গেঞ্জীটা কেচে শুকিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু আকাশের যা মেজাজ আজ সময়মত বাড়ী ফিরবার আশা দুরাশা মাত্র।

অবশ্য তাড়াতাড়ি ফিরতে খুব ইচ্ছে করে না। বাবা যেন ব্যস্ত হয়ে বসে থাকেন, অমল ফিরলেই সঙ্গে সঙ্গে জিগ্যেস করবেন কি

রকম ব্যবস্থা হচ্ছে, অর্ডার পাওয়া যাচ্ছে নাকি, জোজো মাসে মাসে টাকা দিচ্ছে, আবার লাভের অংশ দেবে ত ?

ভাল লাগেনা অমলের। কি বলতে কি বলে ফেলবে, বাবা যদি জানতে পারেন ছেলে একটি জাত ক্রুকের সঙ্গে মিশছে, জাল ওষুধের লেবেল এবং ভেজাল চা এর প্যাকেট ছাপাই যার পেশা ? হাত নোংরা ক'রে ফেলেছে অমল, সৎসাহস হারিয়ে ফেলেছে নইলে কবেই সব কিছু প্রকাশ করে দিতে পারত, নিজেও শান্তি পেত।

কিছুতেই পারে না।

রাতের পর রাত বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজের বিবেককে নিজেই খোঁচাতে থাকে। অন্যায় হ'চ্ছে, অন্যায় হ'চ্ছে, অন্যায় করছ। তোমার নিজের দায়িত্ব কিছু কমে যায় না যদিও তুমি টাকা নিয়ে কাজ করছ। সময় থাকতে থাকতে নিজেকে পরিষ্কার ক'রে ফেল হাজার হলেও পকেটের হাজার টাকার চেয়ে অপাপবিদ্ধ মুক্ত বিবেক হাজার গুণ দামী জিনিষ। দেখতে পাচ্ছ জোজোসিংহ লোকটা কি রকম। তোতামিত্তিরের বন্ধু, নোংরা এবং ধোঁয়াটে ব্যবসায়ে লিপ্ত, হ'ল বা ছাপাখানার কাজ সম্পর্কে অমন ওয়াকিবহাল ব্যক্তি। ভেতরটা নোংরা ব'লেই নোংরা জামাকাপড়ে ওর অত আপত্তি। ফর্সা এবং ধবল হওয়া গোছের চেহারাটাকে গিলেকরা পাঞ্জাবী ধোয়ানো ধুতিতে সাজায় জোজো, ঘনঘন এসেন্স ঢালে গায়ে।

যেই এসব কথা মনে হয় অমনি বাছাবাছা পালটা যুক্তি দিয়ে নিজেই নিজের গলা চাপা দেয়। যখন জেগে ওঠা দরকার তখনো জেগে উঠতে অমলের চিরদিনই আপত্তি, ছাত্রজীবনে পরীক্ষার সময়ে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে শুত। বাড়ীতে কুককোম্পানীর কলাই ওঠা একটি স্টিলের ঘড়ি ছিল। এমন আশ্চর্য ব্যাপার, অ্যালার্ম বাজতে না বাজতেই অমল হাত বাড়িয়ে থরথর ক'রে কাঁপা উত্তেজিত ব্যস্তসমস্ত চাবিটি বন্ধ ক'রে দিত, তারপর আর একটি ঘুম।

এখনো তাই হয়। রাতে শুয়ে ছেলেমানুষের মত বড়বড় সংকল্প নেয় অমল। সকাল হ'তে না হ'তে ঘুম ভাঙে, ওপরে চেয়ে দেখে ছাতের ভেতরের দিকের আস্তর দুধের সরের মত কুঁচকে নেমে এসেছে, খোঁচা দিলেই খসে পড়বে। উড়ন্ত মাকড়শা ক্ষিপ্রগতিতে উড়ে উড়ে বাতাসে জালবুনছে, মশারির গায়ে বড় বড় তালি। তখন মনে হয় কি ভাবছিলাম রাতে, কি হবে মিছেমিছি লাফালাফি ক'রে, পাপমুক্ত নিষ্কলুষ বিবেকের চেয়ে পকেটে হাজার টাকা হাজার গুণ দামী। সে ত' কাজ পেয়েছে কাজ করছে, তার আর কি দায়িত্ব থাকতে পারে। হাঙ্গামা হ'লে বললেই হবে আমি কিছু জানতাম না।

এ নিয়ে আকাশ পাতাল ভাবনা করার কোন মানেই হয় না। অমলের কষ্ট হ'লে কি হয়, বাবা মা-র মুখে একটু একটু ক'রে নিরুদ্বেগের স্বস্তি দেখা যাচ্ছে। বাবা এবার বাড়ী মেরামতে হাত দেবেন, একটু একটু ক'রে সারিয়ে সুরিয়ে নেওয়া যাবে। ওঁদের দু'জনের শরীরই এ বাড়ীর মত জীর্ণ। এঁর দাঁতের গোড়া কনকন করে উনি অম্বলের ব্যথায় ভোগেন, এঁর ব্লাডপ্রেসার সুযোগ পেলেই লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে ওঠে উনি রান্নার ধোঁয়ায় চোখে ঝাপসা দেখেন। এবার সেগুলোও দেখিয়ে দেওয়া যাবে। আসলে অনেক টাকার দরকার। পকেটে হাজার টাকা থাকলে······কেমন লাগে তা অমল জানে না, আজও জানে না, যখন মনকে বলে পকেটের হাজার টাকা···সেটা নেহাতই কথার কথা।

মুখে কিছু বলেনা বটে, কিন্তু মনে মনে স্বস্তি পায় কই? সেজন্যেই এখন সরিতের সঙ্গে বেশী কথা বলতে ভাল লাগেনা তার, বাবার আন্তরিকতাটুকু অসহ্য ঠেকে। এক মনে হয় মা যেন বোঝেন। চোখে ঝাপসা দেখলে কি হয়, ওঁর চোখ এড়িয়ে অমল কচিৎ যেতে পেরেছে। তার ঘরে মা বিশেষ ঢোকেন না। দিনে এবং রাতে দু'বার তাঁর সামনে ব'সে খেতে হয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তিনি, এই সেদিনই

গরম ভাতে বাতাস করতে করতে হঠাৎ বললেন 'কে জানে কি করছ, মনে তোমার স্বস্তি নেই নিতু।'

'কে বলল ?'

'কে আবার বলবে, আমার কি চোখ নেই ?'

'বাজে ব'কনা মেলা।'

এই একবার, দেখা গেল মা ফোঁস করলেন না। সাদাজিরে শুকনো লঙ্কা তেজপাতা সম্বরার সুগন্ধ তুলে মাছের ঝোল ঢেলে দিলেন। খুন্তি নাড়তে নাড়তে বললেন 'আমি কি আর দেখতে পাই না তুমি সর্বদা ভয়ে ভয়ে আছ !'

'ভয় ?'

'হ্যাঁ। কেউ এসে হঠাৎ কড়ানাড়লে, একটা গাড়ী দাঁড়ালে চমকে চমকে ওঠ। কেন, আগে ত' তোমার এত ভয় ছিল না ?'

বর্ষার সন্ধ্যায়, জোজোর পাইকপাড়ার প্রায়ান্ধকার আধাভুতুড়ে বাড়ীতে বসে বসে অমল এসবই ভাবছিল। হঠাৎ, চোখে আলো পড়তে চমকে উঠল।

'এই যে, একা একা ব'সে আছেন ত ? যা ভেবেছি !'

যূথী। সদ্য স্নান করা চেহারা, সাদা মটমটে শাড়ীর আঁচল অবহেলায় মাটিতে লুটোচ্ছে। দুচোখ ফোলা ফোলা দেখলে মনে হয় ঘুম থেকে উঠেছে।

অমলের উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না। বলল 'এদের মা আক্কেল হয়েছে খাবার টাবার দেয়নি বোধহয়, তাই না ?'

এদিকে ওদিকে লম্বা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল টেবিলের ঘণ্টাটা জোরে টিপল। চারিদিক নিঝুম নিঝুম লাগছিল, ঘণ্টারতীব্র শব্দে বাতাস ছিঁড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে দুপদাপ পায়ের শব্দ, সেই লোকটি ছুটে এল, জোজোর পেছনে পেছনে পোর্টফোলিও বয়ে নিয়ে যে মাঝে মাঝে আসে, অমলদের চা, জল ইত্যাদি দেয়, যার অতি কুৎসিত চেহারা দেখলে

অমলের গা ঘিনঘিন করে। ওদিক থেকে সার্টপ্যাণ্ট পরা গুজরাটি ছেলেটাও এল। অমল বিব্রত, ভীত, যূথীর মাথাটা নিশ্চয় খারাপ, এখন সবাই মিলে একটা গণ্ডগোল পাকাবে।

যূথী চাকরটিকে বলল 'এখানে চা দাও না কেন ?'

চাকরটি কি বলতে যেতেই তাকে এক ধমক এবং একপ্রস্থ গালাগালি। লোকটা পালিয়ে বাঁচল।

গুজরাটি ছেলেটার বিনীত প্রশ্ন, কি হয়েছে।

তারদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে অতি সুন্দর ইংরেজী উচ্চারণে যূথী বলে গেল 'অত্যন্ত দুঃখের কথা তুমি তোমার কর্তব্য কর না। মিস্টার সিংহ জানতে পারলে দুঃখ পাবেন রাগ করবেন। আমি লক্ষ্য করছি ইনি মেটার মত চেঁচামিচি করেন না তাই তুমি এঁকে অবহেলা দেখাও।

'আমি ? আমি অবহেলা দেখাই ম্যাডাম ?' ছেলেটি মূর্ছা যায় আর কি। অমলের মনে হল ছেলেটি যূথীর কথায় ভয়পাবার ভাণ করছে আসলে মনে মনে হাসছে।

দেখা গেল তার ধারণা ভুল। যূথী বলল 'আমি মিস্টার সিংহকে জানাতে বাধ্য হব।'

'না না, তার দরকার হবেনা, আমি দেখছি কি করতে পারি।' কুৎসিত চেহারার লোকটি একটি ট্রে বয়ে আনল।

'খান' যূথী ম্যাগাজিনগুলো উলটে দেখতে থাকে। অমল বিব্রত 'আমার জন্যে আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?

জবাব না দিয়ে যূথী ঘণ্টা টিপল। আবার সেই লোকটি। 'এগুলো সরিয়ে নিয়ে যাও। ওপর থেকে কাগজপত্র এনে এখানে রেখে যাবে।'

চেআরে বসল 'কই আপনি খান।'

অমল খেতে থাকে। যূথী তার মুখের দিকে চেয়েছিল।

'আমার জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

'ব্যস্ত ?' হঠাৎ যূথী হাসল। নিরানন্দ হাসি, চোখের নিচে গাঢ় কালি, চোখে ক্লান্তি, বেদনা, হতাশা।

'ব্যস্ত হওয়াই যে আমার কাজ। আপনার সুবিধে অসুবিধে দেখবার কথা আমারই' গলার স্বর এবং কথা বলবার ভঙ্গীতে আভিজাত্য আছে। কাছ থেকে দেখলে জোজোর ঘনিষ্ঠ কেউ, ভাবতে একটু অসুবিধে হয়।

'খুব বিষ্টি পড়ছে, কথা খুঁজে না পেয়ে অমল বলল। যূথী আকাশের দিকে একটু তাকাল। তারপর বলল 'আপনি বই পড়তে ভালবাসেন, পাঠিয়ে দেব।'

একটুক্ষণ চুপ ক'রে কি ভেবে নিয়ে বলল 'মেটা পেশেন্স খেলত, আপনারও কিছু একটা চাই ত! চুপ ক'রে বসে থাকতে মানুষের ভাল লাগে?'

কি বলবে ভেবে পেলনা অমল। কিছু বলা কি তার উচিত? যূথীর সম্পর্কে ভাববার কি অধিকার আছে তার? পিআনোর সামনে যূথী, তোতামিত্তিরের হাত ধরে হেঁটে যাওয়া যূথী, না, অমল কিছুতেই সামঞ্জস্য খুঁজে পায় না। সে যে সব মেয়েদের দেখেছে তাদের চেয়ে যূথী বড়ই অন্যরকম।

'আপনার বাড়ীতে কেউ নেই?'

'আছেন। বাবা, মা।'

'ভাই বোন?'

'আমি একা।'

'আগে কি করছিলেন?'

'এই এটাসেটা টুকটাক ক'রে চালাচ্ছিলাম আর কি।'

'দেশ কোথায়?'

'এখানেই।'

'কোথায়?'

'বলতে পারেন কসবা, যদিও আমরা আরো দক্ষিণে থাকি।'

'কসবা?'

'হ্যাঁ।' অমল তার প্রপিতামহের নামটি করল, করেই লজ্জা পেল। অহঙ্কার, ফুটো বনেদীয়ানার অহঙ্কার। পরিচয় দেবার সময়ে বিখ্যাত

লোকটির নামই মুখে আসে যদিও সব সময়ে মনে সংকল্প রাখে ও-সব নামটাম বলব না।

'ও!' যূথীর মুখে চোখে বেশ একটি আগ্রহ ফুটে ওঠে।

'বিষ্টি থেমেছে, আমি উঠি।'

অমল উঠল, যূথীও উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় এল, এবং যেই বাইরে আসা অমনি আবার বিষ্টি নামল।

'একটু ব'সে যান।'

বাইরের ঘরে এসে অমল বসল। যূথী পাখাটা খুলে দেয়, সামনে বসে।

'আপনাকে দেখে ত' খুব খারাপ লোক মনে হয় না, আপনি এখানে এলেন কেন?' একনিশ্বাসে কথাটা বলেই যূথী বলে 'অবশ্য চেহারা টেহারা দেখে কিছু বোঝা যায় না মানুষকে।'

অমল আশ্চর্য, কিছুটা সন্ত্রস্ত। কি জবাব দেবে? একটু আগে মনে হচ্ছিল ও খুব স্বাভাবিক। এখন আবার ওর চোখে সেই চঞ্চল, উত্তেজিত, অশান্ত ভাব দেখা যাচ্ছে যা দেখে ওকে স্বাভাবিক মনে হয় না। তোতামিত্তির ওকে কথা বলতে দেয়নি, টেনে নিয়ে গিয়েছিল, জোজোকে জানাতে বারণ ক'রেছিল।

'নিশ্চয় আপনি বিপদে পড়েছিলেন, তখন জোজোর সঙ্গে দেখা?'

অমল চমকে উঠেছে। ছবির পর ছবি, চিন্তার পর চিন্তা, ফিল্মের রোল টেনেটেনে লম্বা করছে কে যেন, এবং সে ফিল্মের সর্বত্র অমলের মুখ। নিজের অবস্থায় বিরক্ত অমল, সান্ন্যালের কথায় চা-এর ব্যবসায়ে মার খাওয়া অমল, দত্তর সঙ্গে ছাপা কাপড়ের দোকানে অমল, শেষ পর্যন্ত পুলক, পুলকের প্রয়োজনে টাকার জন্যে ছুটে যাওয়া অমল, 'আপনাকে কে বলল?' অমলের গলায় রাগ, ভয়, বিদ্বেষ।

'বুঝতে দেরী হবে কেন? বিপন্ন না হ'লে ওর কাছে কেউ যায় না, আর ও ঠিকই টের পায় লোকটা বিপদে পড়েছে।'

যুথী মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ব'লল টের পায়, জানতে পারে কে কোথায় মুখ লুকোবার চেষ্টা করছে, কার অবস্থা একেবারে চরম দুর্দশায় ঠেকেছে।'

'টের পায়!'

'টেরপায়, জানতে পারে। এই যে আমি আপনি বসে কথা কইছি···

'জানতে পারে!'

'সব। সব জানে ও, আসলে ও মানুষ নয়, তাই লালবাজারে নিজের ঘরে ব'সে জানতে পারে এখানে আপনি কি করছেন, আমি কি করছি।'

'আমি যাই।'

'কোথায় যাবেন, বিষ্টি পড়ছে।'

'বিষ্টির মধ্যেই যাব।'

'আপনি আমায় ভয় পাবেন না, আমি আপনার কোন অনিষ্ট করব না।'

'আমার সঙ্গে ব'সে···আপনি ভেতরে যান...' কি বিব্রত অবস্থা। আজ তোতামিত্তির নেই কেন? অমল কি অসহায়। যুথীকে কে ভেতরে নিয়ে যাবে?

'আপনার নামটা কি যেন? শুনি, ভুলে যাই।'

'অমল চ্যাটার্জি।

'অমল!' যুথীর মুখ সাদা হয়ে গেল, 'অমল!' অস্ফুটে বলল, শক্ত ক'রে ধরল চেয়ারের হাতল। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল যুথী। চোখ তুলল, চোখ মুছল। বলল 'যান! বাইরে যান!'

কিছুই বলনা অমল, শুধু এ টুকু বুঝল অন্য কোন অমলের স্মরণে ওর ভাবান্তর। খুব বিব্রত, খুব বিপন্ন লাগল তার। যুথীর চোখে গভীর বেদনা, কি হাহাকার, অমলের বুকটা যেন কেমন ক'রে উঠল।

সেদিন বাড়ী ফিরতে কি কষ্টই না হ'ল।

রাস্তায় জল জমে গেছে, ট্রাম বন্ধ। খানিকটা পথ এ বাসে, খানিকটা

পথ ও বাস, শেষ অবধি ট্যাক্সি, বাড়ী পেঁছিতে পৌঁছতে রাত সাড়ে এগারটা। পরদিন জ্বর এল এবং ভারী স্বস্তি পেল অমল। নইলে ওখানে গিয়ে যূথীর সামনে দাঁড়াতে ভাল লাগত না। সন্ধ্যেবেলা সরিৎ এল, অনেকক্ষণ বসে রইল। অন্যান্য অনেক কথার মত যূথীর কথাটাও সরিৎকে বলিবলি করেও বলা হ'লনা। এ ভাবনাটি শুধু অমলের। যূথীকে জানার অভিজ্ঞতাটি বেদনার, কিন্তু সে বেদনা ভাগ ক'রে নেবার নয়।

সেরে উঠে যেদিন গেল, সেদিনই অমল দেখতে পেল যূথীর ঝকাঝকায় কাজ হয়েছে। টেবিলে নতুন-পুরনো ভালভাল বিলিতী পত্র-পত্রিকা, আশ্চর্য, এসব কাগজ এখনো এদেশে আসে বলে অমল জানেনা। অবশ্য এ-সব তার জানার কথাও নয়।

জোজোর তল্পীবাহক লোকটি ঠিকঠিক সময়ে চা, জল পেঁছে দিয়ে গেল সেই ছেলেটি জিগ্যেস ক'রে গেল কোন অসুবিধে হচ্ছে না কি!

যূথীকে দেখা গেল না। খুব আশ্বস্ত হবার কথা কিন্তু কেন যেন অমলের মনে হল যূথী এলেও পারত।

কয়েকদিন কেটে গেল। বাবার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। মা বলছিলেন 'জড়িবুটি খেয়ে খেয়ে শরীরের বারোটা বাজাচ্ছেন।'

বাবার ঐ এক বাতিক, বোধ হয় ওঁর ছোটবেলা কথায় কথায় ডাক্তার দেখাবার তেমন চল ছিল না, নিজেও পারতপক্ষে ডাক্তার দেখাতে চান না। নিজেই নিজের চিকিৎসা করেন, পুরনো লিলি-বিস্কুটের কৌটায় তুলো, আইডিন, মলম, কয়েকরকম ট্যাবলেট রেখে দেন। তাঁর ডাক্তারী বাক্সের দরকার মা'রই বেশী হয়, মাছের কাঁটা আঙুলে ফোটে, হাত কাটে, তেলের ছিটের ফোস্কা পড়ে। বাবার দুঃখের বিষয় হ'ল, মা তাঁর চিকিৎসা নেন না, যদিও বাবা সর্বদাই তুলোয় আইডিন ভিজিয়ে অথবা মলম নিয়ে তৈরী।

মা হ'চ্ছেন ভাগ্যবাদী। ওষুধ দিয়ে কিছু হয় না বাপু, যখন

বিষিয়ে উঠবার তখন উঠবেই। পুড়লে একটু আলু ছেঁচে দেব, ফোস্কা পড়বেনা। নেহাৎ বড়রকম কিছু না হলে তিনি বাবার ওযুধের বাক্সের দ্বারস্থ হন না। অগত্যা বাবা নিজেই নিজের চিকিৎসা চালান। কখনো শিউলিপাতার রস খাচ্ছেন, কখনো একগোছা শুষনি কলমী শাক এনে হেসে বলেন 'সেদ্ধ ক'রে দিও ত, রাতে ঘুম হয়নি।' মাঝেমাঝেই নিষ্ঠাভরে ত্রিফলা অথবা চিরতা জলে ভেজান।

মা বলেন 'শরীরটাকে জড়িবুটি দিয়ে বোঝাই কোর না, অসুখ বাধাবে।'

বাবা চটে যান। অসুখ সারাবার জন্যে যে সব জিনিস খাওয়া, তাতেই অসুখ হবে বললে রাগ হবারই কথা। বলেন 'না, তোমার সঙ্গে কথা বলাই বৃথা।'

'ওগুলো খেয়ে তোমার কি উপকার হচ্ছে শুনি?'

'জান, কোনটায় আয়রণ থাকে কোনটায় ক্যালসিয়াম, ফসফরাস?'

'জানি না বাপু, যে চাকায় জুড়ে দিয়েছ, টানতে টানতেই মারা গেলাম, অন্য কিছু জানতে সময় পাচ্ছি কোথায়?'

মাঝেমাঝে, ক্বচিৎ কখনো মা বসেবসে বাবার কথা শোনেন, তখনই বাবার উৎসাহ বেড়ে যায়।

এবার দেখা যাচ্ছে গৃহচিকিৎসায় বাগ মানানো যাচ্ছেনা। ডাক্তার বলছেন ভাল ক'রে দেখিয়ে শুনিয়ে নেওয়া দরকার। অমল ভাবছে জোজোর কাছে কিছু টাকা চাইবে।

হঠাৎ যূথী ঢুকল, চিন্তায় ছেদ পড়ল, 'একদিন আসেননি কেন?' প্রশ্নটা মনে লাফিয়ে উঠতেই অমল লজ্জা পেল।

খুব উস্কো খুস্কো চুল, সম্ভবত চিরুণী পড়েনি, মুখের চেহারা শুকনো। যদিও মটমটে দামী সাদা সাড়ীর আঁচল লুটিয়ে পড়ছে, কাঁধের এবং গলার গড়নটি সুন্দর দেখায় এমনি একটি জামা পরেছে যূথী। দেখলেই মনে হয় যে জিনিষগুলো পরে সেগুলো খুব দামী, যদিও যূথী ওগুলো খুব যত্ন ক'রে পরে না। খুব দামী জিনিষ অবহেলে পরার মধ্যে একটি আভিজাত্য আছে, সেই আভিজাত্যটি যূথীকে বেশ মানায়।

'একটু দরকার আছে, ও ঘরে আসবেন ?'

অমল উঠে দাঁড়াল। বোকামি হচ্ছে, সেদিন যূথী ওকে বিপদে ফেলতে পারত, তবু অমল যাবে।

পাশের ঘরে ঢুকে যূথী দেওয়ালের কাছে গেল। বড় একটি ছবি ঠেলল। ছবিটি দরজার মত ভেতরে খুলে গেল, একটি ঘর। ছোট চেয়ার, একটি ইজিচেয়ার, 'ভেতরে আসুন।'

অমল দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল, 'বলুন, কি বলবেন।'

'ভেতরে আসুন,' যূথী ওর হাত ধ'রে টানল।

আশ্চর্য, এই ঘরে টেলিফোন, দেওয়ালে ঢোকানো সার সার দেরাজ। বোঝা গেল ঘরটিতে এআর কুলার বসানো আছে।

'শুনুন' এ বাড়ীতে নিরিবিলি কথা বলবার বড়ই অসুবিধে। এ ঘরে এসেছি তা যেন জোজোকে জানাবেন না।'

'কিন্তু কেন ? জোজো জানলে আমার ওপর কি অসন্তুষ্ট হবে আপনি জানেন না।'

'না না, ও ত' বলেছিল আপনার সঙ্গে ভাল ক'রে মিশতে, যাতে··· না বলবনা। বললে আপনি চলে যাবেন। আপনাকে দিয়ে একটা দরকার আছে।

'কি ?'

যূথী হঠাৎ কাছে এল। অমলের কাছে এসে নিচু এবং বিপন্ন গলায় মিনতির সুরে বলল 'একবারটি একডালিয়া রোডে যেতে হবে আপনাকে, ঘড়িঅলা বাড়িটায় যাবেন' নম্বরটা বলল।

অমল কি বলতে চাইছে তা না শুনেই বলল 'সামনে দুটো ঝাউগাছ আছে একটা হেলানো, দেখেই চিনবেন, ভেতরে ঢুকে যাবেন। দ্বিজেশ রায়ের সঙ্গে দেখা করবেন, বাড়ীর কর্তা।'

'কি বলব···'

'বলবেন···'

হঠাৎ তার মুখ সাদা হ'য়ে গেল। ভয়ে বড় বড় চোখে চাইল।

অমলকে ধাক্কা দিল এবং দরজা খুলে ফেলল। অমলের হাত ধরে টানল 'বাইরে আসুন।'

বাইরে বেরিয়ে এল অমল। বুক ধড়াস ধড়াস করছে তার, 'বসুন' ঠেলা দিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিল যূথী।

মশমশ জুতোর শব্দ। তোতামিত্তির এবং জোজো হাসতে হাসতে ঢুকল।

যূথী পিআনোতে গিয়ে বসল। চমৎকার দৃশ্য। যূথী পিআনো বাজাচ্ছে, অমল শুনছে। অমল এখানে ব'সে আছে মুখটি চিন্তিত, বিপন্ন, তা কি জোজো এবং তোতামিত্তির দেখতে পাচ্ছেনা? জোজো কি ছবিখানার দিকে তাকাবে না? যূথীর কি মনের জোর। অবহেলে ওদের দিকে পেছন ফিরে পিআনোর চাবি টিপছে। হালকা হালকা সুরের ছোট ছোট টুকরো উঠছে পড়ছে।

'অমল এখানে বসেছ যে আজ?' জোজোকে খুব খুশী খুশী দেখাল 'যূথী একটা কাণ্ডই করেছে দেখছি।'

যূথী জোজোর কথা শুনতে পেল ব'লে মনে হয় না। জোজো অবশ্য হতোদ্যম হ'লনা 'এই ত' আমি চাই, একটু কাজ করবে একটু আরাম করবে, মাঝে মাঝে এখানে এসেও বসবে, যূথীর পিআনোর হাত খুব ভাল।'

জোজোর গলা শুনতে শুনতে অমলের আবার মনে হল অদ্ভুত গলার আওয়াজ। এ রকম গলা বিয়েবাড়ীতে প্রায়ই শোনা যায়। বিশেষ এক ধরণের লোক আছে যারা গলাতুলে ব্যাপারবাড়ীতে চাকর-ঠাকুরদের ধমকায়, তাদের গলা প্রায়ই এরকম হয়।

যূথী তৎক্ষণাৎ পিআনো থামাল। ঘাড় ঘু'রয়ে সামনে চাইল, 'দেখেছ ত অমল? আমি কাছে গেলেই তুমি বিব্রত বোধ কর, আমার কর্তব্য হচ্ছে তোমায় মাঝেমাঝে সঙ্গ দেওয়া।'

'বস তোমরা' জোজো ভেতরে গেল 'আমি স্নান করেই আসছি।'

'যূথী, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।' তোতামিত্তির পিআনোর কাছে এসে দাঁড়াল 'এ ভদ্রলোক কিছু জানেন না' এঁকে নিয়ে কেন তুমি ছোটঘরে গিয়েছিলে ?'

'কে বলল ?'

'জোজো বুঝতে পেরেছে মনে হয়।'

'গিয়েছিলাম।'

'কেন ?'

'ওঁকে একডালিয়া যেতে বলছিলাম,' অমলের দিকে চেয়ে বলল তোতা সব জানে।'

'কিন্তু কেন যূথী ?'

'কেন তা তুমি জাননা ?'

তোতার মুখটা লাল এবং থমথমে। ঈশ্বর জানেন এদের কার সঙ্গে কার কি সম্পর্ক আছে, অমল পালাতে পারলে বাঁচে।

'ভুল করছ যূথী, ঠিক হচ্ছে না।'

'ঠিকই হচ্ছে। আমি চাই জোজো সব জানুক। আমি চাই জোজো আমাকে শাস্তি দিক, মেরে ফেলুক। মেরে ফেললে ত' ওর ফাঁসী হবে তাই না! তুমি বল ত ? অমল, তোমায় বলছি।'

যূথীর কথা এবং গলার স্বর সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ কিনা, অমলের সন্দেহ হ'ল।

একবার দাঁড়াল যূথী, ধপ্ করে বসল। জোজো ঢুকছে।

'এই যে জোজো, আমি তোমার কথাই বলছিলাম। বলছিলাম সব কিছুই করেছ এখন আমাকে মেরে ফাঁসী গেলেই ল্যাঠা চুকে যায়। আমিও বাঁচি, তুমিও বাঁচ।'

'বলছিলে বুঝি ?' জোজো মিষ্টি ক'রে হাসল। বলল

'কি যে কর যূথী, দেখ, ছোটঘরের দরজাটা একটু ফাঁক রেখে দিয়েছ, পাগল!'

দরজাটা খুলে ধরল। বলল 'এস অমল, এখানেই বসি। যূথীর সঙ্গে ত' মোটে একটু সময় ছিলে।'

অমল তার দিকে তাকাল। বলল 'না। আমি বাড়ী যাব।'

'বাড়ী ত' যাবেই। তুমি সৌভাগ্যবান ছেলে হে! আজকালকার দিনে মা বাবার সঙ্গে বসবাস কর, মা বসে থাকেন। একটু বাদে যাবে, আমি এগিয়ে দেব।'

'এগিয়ে দিতে হবে না।'

'আহা একটা জিনিস দেখেই যাও।' জোজো একটি বিজ্ঞাপনের ছবি মেলে ধরল।

সুন্দর সহাস্য একটি স্বাস্থ্যবান শিশুর ছবি। অধুনা বহুল প্রচলিত একটি টিনের গুঁড়ো দুধের বিজ্ঞাপন।

'কেমন, সুন্দর ছবি না?'

জোজো ছবিটি ব্যাগে রাখল। একটু হেসে বলল 'চল, এগিয়ে দিই।'

ঘরটির দিকে তাকাল। বলল 'সব মানুষেরই একটা নিরিবিলি জায়গা দরকার হয় হে, আমি এখানে চলে আসি।'

গাড়ীতে যেতে যেতে অমল কেবলই অস্বস্তিতে কষ্ট পেতে থাকল। জোজো বুঝেছে যূথী তাকে ওঘরে নিয়ে গিয়েছিল। কি বলেছে তাও কি জানে জোজো? জানলে তাকে কিছু বলছে না কেন?

'কি বলছিল যূথী? আমার নিন্দে করছিল?'

'না।' অমল একটু হাসল। যূথী একবারও জোজোর নিন্দে করে নি। নিন্দে করা বলতে জোজো কি বোঝে?

'দেখ, ও বড় ছেলেমানুষ।'

অমল নীরব।

'কি বলতে কি বলে ঠিক নেই তার।'

'তুমি অযথা উদ্বিগ্ন হয়ো না। আমাকে উনি এমন কিছুই বলেন নি।'

'কিছুই না?' জোজোর দু' চোখে হাসি উছলে পড়ছে।

'না'

'ভাল। আমিত' দেখে খুশীই হচ্ছি ও তোমাকে বেশ পছন্দ করেছে।'

'তার মানে?'

'মানে?' জোজো একটি লরীর পাশ কাটাল, জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ড্রাইভারের উদ্দেশে একটি গালাগালি ছুঁড়ল।

'মানে আর কি, তোমার নামটার ওপর ওর একটা দুর্বলতা আছে।'

'ভুল করছ। আমার নামটা উনি সেদিন অবধি জানতেন না।'

'জানত। শোনে আর ভুলে যায়, শোনে আর ভুলে যায়।' সব কিছু কি ভোলে? অমল জানে তার নামের একটি মানুষকে যুথী ভোলেনি।

'আমার মনে হয় কাজকর্ম না থাকলে ওর সঙ্গে মাঝেমাঝে একটু গল্প করলে পার। ওর মনটা ভাল থাকে।'

'তুমি নিশ্চয় আশা করতে পার না তোমার এ ধরণের অসঙ্গত কথা শুনে আমি আনন্দ দেখাব।'

'আহা, বড্ড কেমন যেন তুমি মানুষটা। কথায় কথায় অমন নীতি-বাগীশের মত ধমক মার কেন?'

'আমার এখানে ভাল লাগছে না।'

জোজোর চোখে সতর্ক এবং ধূর্ত একটি সাবধানতা ছায়া ফেলে গেল।

'কেন, তোমার অসুবিধে হচ্ছে?'

'ভাল লাগছে না।'

'বল না, বল না কি অসুবিধে হচ্ছে।

অসুবিধে! অমল বাইরের দিকে তাকাল। সন্ধ্যার মহানগরী। ডানদিকে ময়দান, দূরে দূরে আলো ভেসে আছে, পথ, লোকজন গাড়ী, ট্রামের আলো, অমলরা এই সন্ধ্যার বুকে সাঁতার কেটে চলে যাচ্ছে।

'আমার মনে হয় তোমার টাকাপয়সার দরকার, বলতে পারছনা।' লোকটা অন্তর্যামী। ওর কথা খানিকটা সত্যি, সবটা নয়

'বাবা অসুস্থ, সে জন্যে দরকার অবশ্য...'

'তোমার বোধ হয় মনে মনে অসৎকাজ করছি বলে একটা বাজে ধারণা আছে, তাই না অমল ?'

'ধারণাটা কি বাজে এবং মিথ্যে ?'

'ওসব ছাড়ো। কাকে তোমরা বাজে বল, কোন্‌টা ভাল ?' পথের দিকে চোখ রেখে জোজো একটি বড় বক্তৃতা দিয়ে গেল। উপসংহারে বলল 'নাম চাই, টাকা চাই। করলে ত' অনেক রকম, হাতে পেয়েছ কিছু ? কে তোমায় কি দিয়েছে ? আজ ভাল জামাকাপড় পরছ, মা-বাপকে দুটো পয়সার মুখ দেখাতে পারছ, টাকা কর, গাড়ী চড়, দেখবে তোমাকে সবাই এসে হুজুর হুজুর করছে। ভালভাল কথা আমিও ভাবতাম হে, হাফপ্যান্ট পরে বগলে হ্যাণ্ডবিল নিয়ে তিনপয়সার টিকেট কেটে ট্রামে চড়ে ঘুরতাম। দেখলাম ও সব কিছুই না।'

'এখন শান্তি পেয়েছ ?'

'শান্তি ? শান্তি ত' আমি চাইনি। আমি যা যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি। ভালভাল কথা যারা ভাববার তারা ভাবুক, আমি চেয়েছিলাম জীবনটা ফুর্তি ক'রে বাঁচব, তা পেয়েছি। তবে হ্যাঁ, আমাকেও কষ্ট করতে হয়েছে।'

জোজো গম্ভীর হয়েগেল। বল 'চোখ খুলে রাখলে দেখতে পাবে সবাই টাকার জন্যে যা নয় তাই করছে। ঘুষ, ফাটকা, জোচ্চুরি, বাটপাড়ি, সে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সমানে চলেছে, দেশশুদ্ধ লোক কেন গুণ্ডা-বদমায়েস হয়ে যায় না তাই ভাবি।'

'তবু ত' হয় না।' অমল একটা আশ্চর্য উল্লাস অনুভব করল। কেউই না সে। অতি তুচ্ছ একটা লোক। তবু জোজো বলছে সব লোক নীতি হারিয়ে কামড়াকামড়ি করছে না, সে কথা শুনে গভীর স্বস্তি। আবার সেই সঙ্গে বুকে একটি গোপন এবং নিষিদ্ধ উত্তেজনা।

চায়, সে-ও চায়। অনেকটাকা চায়। ঝকঝকে বাড়ী, অমলের মনের মত ক'রে সাজানো, নতুন, সাদা, উদ্ধত চেহারার গাড়ী, সব চাই, সব চাই।

'দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা কেউ ভেবেছে না কি? প্রত্যেকেই সাধ্যমত লুটে নিয়েছে। এ অবস্থায় পড়ে পড়ে মার খাওয়াকে আমি বলি বোকামি।'

অমল মাথাটা হেলিয়ে পেছনে রাখল।

'যূথীর আর সব ভাল, কিন্তু সব যেন বুঝতে চায় না। অমল ওর মাথাটি বিগড়ে দিয়ে গেছে।'

'কে?'

'অমলপ্রতিম। ওর অল্প বয়সের বন্ধু। লম্বা লম্বা কথা ব'লে ওকে তাতিয়েছিল। বুঝতাম সব, বলতাম না কিছুই, তখনো সম্পর্ক হয়নি ত!'

'আমি শুনতে চাই না।'

'আহা শোনই না, অভিজ্ঞতা বাড়বে, অভিজ্ঞতা হওয়া ভাল। বালিগঞ্জের রয়্যাল ব্যাঙ্কের ছেলে। ব্যাঙ্ক ফেল করতে বাবাকে দায়ী করে আত্মহত্যা করলে।'

গড়িয়াহাটা এসে যাচ্ছে। নেমে যাবে মনে করে অমল স্বস্তি পেল।

'যূথীর ধারণা হচ্ছে সে মরেনি, এবং খুঁজলে তাকে পাওয়া যাবে।'

লাল আলো। পথের লাল আলোয় ট্রাফিক জমে যায়, দেরী হয়, বিরক্তি বাড়ে। আজ অমল যেন স্বস্তি পেল। গাড়ী থামল। অমল দরজা খুলল।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জোজো গলা তুলে হেসে বলল, 'তোমার বন্ধু সেই পুলকচন্দ্রের খবর জান ত?' বেদম মার খেয়েছে রাস্তায়। হাসপাতালে পড়ে আছে। বাঁচে কি না বাঁচে শুনলাম।'

হলদে এবং সবুজ আলো জ্বলল। গাড়ীর শোভাযাত্রাটি চলতে সুরু করল।

সন্ধ্যার গড়িয়াহাট। গাড়ী, বাস ট্রাম, রিক্শা, অফিস-ফেরতা মানুষের ক্লান্ত চেহারার ভিড়। এদিকে কাপড়ের দোকানে দোকানে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। প্লাষ্টিকের চাদর, চুড়ি, ব্যাগ, পুঁতির মালা, ফুলের সম্ভার, সুন্দর সুবেশ নরনারী শিশু। সব আনন্দ পথে, তাই সবাই পথে বেরিয়ে পড়েছে।

মানুষের ভিড়ে গা ভাসিয়ে চলতে চলতে অমল যূথীর কথা ভাবছিল। যাকে সে চেনে না জানে না সেই অমলপ্রতিমের কথাও মনে হচ্ছিল। সে নেই, অথচ যূথী তাকেই খুঁজে বেড়ায়। যূথীকে সেদিন অবধি জানত না। এখন দেখা যাচ্ছে তার চিন্তার অনেকটাই সে অধিকার ক'রে বসে আছে।

জলের স্রোত যেদিকে যায় সেদিকে গা ভাসিয়ে দেবার একটা বিশেষ আনন্দ আছে। আপন মনে পথ চলতে অমল সে ধরণের একটা আরাম পেতে থাকে। এক সময়ে ভিড় কমে গেল, আলো কম। পাশে ছোট পার্ক, একডালিয়া ঘুরতে লাগল অমল, খুঁজতে লাগল।

ছাতের গম্বুজে ঘড়ি, সামনে ছুটি ঝাউ গাছ। কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অথচ নম্বর অনুযায়ী এখানেই থাকার কথা। যে বাড়ীটার সামনে নম্বর লেখা আছে, তার চেহারায় মেলে না। গাছটাছ নেই, গম্বুজে ঘড়ি, নেই। ঝকঝকে একটি বড় বাড়ী, ধূসর এবং লালচে রঙে চৌখুপী কাটা বাইরেটা, জানলায় জানলায় চওড়া কার্ণিশ, কাচের সার্শি আলোয় ঝলমল করছে, একতলায় টিউটোরিয়াল কলেজের বোর্ড আঁটা, দোতলায় একটি সংগীত-নৃত্য-বাদ্য ইস্কুল। গেটের বাইরে সাদা ফলকে নাম লেখা।

'কার বাড়ী খুঁজছেন ?' পানের দোকানের লোকটির কৌতূহলহীন প্রশ্ন।

জবাব দিল না অমল। দেখে নিয়েছে সে। গেটের বাইরের নামটি পড়তে পেরেছে। ঝাউগাছ নেই, ঘড়ি নেই, দ্বিজেশ রায় কেন

কোন বাঙালীর হাতেই নেই বাড়ীটি। ওপরে মাড়োয়ারী মালিকের নামের নিচে একটি কয়লাখনির নাম। কয়লাখনিটি ঝরিয়ায়।

অমল একটি নিঃশ্বাস ফেলল, হাঁটতে থাকল। যূথীকে কথাটা বলবে না। ওর সঙ্গে কথা বলা উচিত হবে না। জোজোর কথার মধ্যে অনেক রকম ইঙ্গিত ছিল ব'লে মনে হচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে আবার গড়িয়াহাটার মোড়। বাস স্টপে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ছেলে এবং একটি বয়স্ক লোক আড্ডা দিচ্ছে। তাদের গা নাড়িয়ে কথা বলা, মুখ অত্যন্ত ফাঁক করে হ্যা হ্যা হাসি এবং মাঝে মাঝে চঞ্চল চোখে তাকাতে তাকাতে সশব্দে থুথু ফেলা দেখে পুলকের কথা মনে পড়ল। পুলকের খবরটা নিতে হবে, যদিও অমল ভাল করেই জানে তার খবর নেবার অনেক লোক আছে এখন।

॥ বারো ॥

পুলকের খুব উন্নতি হয়েছে।

কেবিনে শুয়ে আছে ব'লে নয়, লোকজন ফল এবং ফুল হাতে এসেছে, টেবিলে দেশী বিলেতী রঙচঙে বই। বেশ কিছু লোকজন বসে আছে এবং পুলককে দেখে সবিশেষ ক্লিষ্ট মনে হ'ল না, যদিও তার মুখের হাসিটি শহীদের মত।

'এস, অমল এস।'

অমল বসল। অন্য লোকজন কিছুক্ষণ বাদে উঠে পড়ল। কথাবার্তা শুনে মনে হ'ল পুলক মস্ত একটা বীরত্ব করেছে।

'কি, ব্যাপার কি?'

'বল কেন, ভারী বিচ্ছিরি ব্যাপার।'

'শুনলাম খুব চোট খেয়েছ।'

'কে বললে? ব'লেই পুলক প্রসঙ্গান্তরে গেল। অমলের জবাব শুনতে চায়না, নিজে কথা বলতে চায়। ভালই, অমলের জোজোর নামটি করবার ইচ্ছে নেই।

'মানুষ আজকাল কি বদলে গেছে, ভাবতে পারবে না।'

'তোমার বেশী লাগেনি ত?'

'না না, একটা সত্তর বছরের বুড়ো কতইবা তার গায়ের জোর।'

'বল কি! বৃদ্ধদের সঙ্গে মারামারি করছ না কি আজকাল?'

'আমার একটু ভুল হ'য়ে গেছল, জানলে?'

পুলক ঘটনাটি বলল, 'সত্যি নাম বলব না, যখন বুঝতে পারছি তুমি লক্ষ্য করনি।'

ছোট একটি কাগজে ছোট একটি খবর। মফঃস্বলের মহকুমা শহরের হাঁসপাতাল থেকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় একটি মেয়েকে কলকাতায় আনা

হয় এবং সে মারা যায়। খবর বেরুল শ্বশুরালয়ের অত্যাচারে হতভাগিনী বিধবা আত্মহত্যা করেছে।

কিছুদিন পর মেয়েটির শ্বশুরের ঘনঘন চিঠি। ভয়ানক ভুল হয়েছে পুলকদের। একান্তই দুর্ঘটনা। বিশ্বাস না হ'লে রিপোর্ট দেখলেই হয়। চিঠিটি ছাপিয়ে দিতে হবে নইলে হতভাগা বৃদ্ধকে নানারকম অপ্রীতিকর কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে।

আরো ক'দিন পরে ভদ্রলোক নিজেই এলেন। লম্বা রোগা মানুষটি। গলায় কাঠের কণ্ঠি থাকলে কি হয়, মেজাজটি তেমন মোলায়েম নয়।

গ্যাঁট হ'য়ে চেয়ারে বসলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে জানতে চাইলেন তাঁর চিঠি ছাপা হয়নি কেন?

পুলক বলল 'আস্পর্ধা! একটা গেঁয়ো অসভ্যলোক জানে না কোথায় কি ভাবে কথা বলতে হয়।'

অমল যেন ভদ্রলোকের উষ্মার কারণ বুঝতে পারছিল। আস্তে বলল

'কেন জোর দিচ্ছিলেন চিঠিটা প্রকাশের ওপর শুনেছিলে?'

'বলছি।'

ভদ্রলোক চাষী গেরস্থ। সম্মানিত লোক, ছেলেদের ত বটেই মেয়েকেও ইস্কুলে পড়াচ্ছেন। গ্রামের নানাকাজে তাঁর দান ধ্যান আছে, সবাই শ্রদ্ধা করে। বিধবা পুত্রবধূটি তাঁদের স্নেহভালবাসার পাত্রী ছিল, আঁচল দিয়ে দুধের কড়া নামাতে গিয়ে এই কাণ্ড।

'জানলে অমল, ভদ্রলোক বললে মহকুমার হাঁসপাতাল ত' আশা ছেড়েই দেয়, খরচপত্র ক'রে কলকাতায় আনা হ'ল বউকে স্নেহ না করলে কেউ তা করে?'

একে বউয়ের শোক, তার রেখে যাওয়া ছোট ছোট শিশুদের শান্ত করবার দায়িত্ব তারপর এই খবর পড়ে লোকের নিন্দে করবার মুখ খুলেছে। বউকে আদর ক'রে কাছে রেখেছিলেন মৃতপুত্রের শোক

ভুলবেন বলে। এখন বউএর বাপের বাড়ীর লোকেরা এসে শাসাচ্ছে মামলা করবে, তারা বলে বেয়াই এমন চামার তা জানিনা ত ?

সবচেয়ে বড় কথা, আত্মসম্মানী বৃদ্ধ তিনি, গৃহবিগ্রহের পুজো না ক'রে জল খান না, এমন একটি মিথ্যে অভিযোগ যদি তাঁর নামকে কলঙ্কিত করে তা হ'লে শেষ জীবনে সুখ শান্তি সব গেল।

মাঠে ঘাটে, খোলা জায়গায় বাস করে যারা, তারা যেমন চেঁচিয়ে এবং গলাতুলে কথা বলে, হাসে, কাঁদে তেমনি সুউচ্চ গলায়, কণ্ঠের হাড় কাঁপিয়ে ভদ্রলোক শুকনো কান্নায় বিলাপ করেছিলেন। তাঁর নিবারণ যেদিন গেছে সেদিনই সুখ শান্তি গেছে। এমন শান্ত, লক্ষ্মী বউমাটি সেও মরল মর্মন্তুদ ভাবে।

'যা হবার তা হয়েছে, আপনারা আমার নামটা পরিষ্কার ক'রে দিন।' বোঝা গেল এমন লোক লাঞ্ছিত হতই, পুলকদের হাতে না হোক অন্য কোথাও, অন্যত্র। সৎ এবং সম্মানিতভাবে যাপিত জীবন তাঁকে বাঁচাতে পারত না, কেননা, তিনি একটি অন্যায়ের প্রতিকার চেয়েছিলেন। হলো বা ছোট অন্যায়। প্রতিকার চাইলেই আঘাত এসে পড়ে। তখন আর মনুষ্যত্ব, ভদ্রতা, শোভনতা এসব মনে রাখে না কেউ।

নাম পরিষ্কার আবার কি ? পুলক ভদ্রলোকের কথা বোঝেনি। স্বাভাবিক, সেটাই স্বাভাবিক। মানুষের থেকে দূরে সরে থাকলে মানুষের কথা বোঝা যায় না। কান দিয়ে শুনলেই হয় না, মন-প্রাণ, হৃদয়ের প্রশ্নটাই আসল। সেগুলো থাকলে ভাষার আড়াল টাড়াল আপনা থেকেই ঘুচে যায়। কথাগুলো হয়ত খুবই পুরনো, কিন্তু, অমলের এখন মনে হয় পুরনো হ'লেও অপরিহার্য। বহুব্যবহৃত হলেও এখনো আরো অনেকদিন ব্যবহার করতে হবে এই সব কথা, এইসব বিশ্বাস, যতদিন জল, বাতাস, আলোর প্রয়োজন থাকবে ততদিনই, ততদিন।

ভদ্রলোক আশ্চর্য এবং ব্যথিত হয়ে বলেন 'কথাটা ত' মিথ্যে। সত্যিই ত' আমি আমার বউমাকে নির্যাতন করি নি।'

বোধহয় সকাল থেকে না খেয়ে দেয়ে ক্লান্ত ছিলেন, তার এই ছোট্ট সহজ কথাটি পুলক বুঝছে না দেখে বৃদ্ধ ক্ষেপে যান। বলেন 'আমাকে আপনাদের বড়বাবুর কাছে নিয়ে চলুন। বুড়োমানুষের দুঃখ তিনি বুঝবেন। আমাদের সম্প্রদায়ে মেয়ের বড় আদর। পণ দিয়ে মেয়ে আনতে হয়, এরপর আর আমার ছেলেদের হাতে কেউ মেয়ে দেবে না।'

এই কথাগুলোই তিনি তাঁর দেশজভাষায় বিশেষ সুরে বলেন, হয়ত' আগবাড়িয়ে ভাবছিলেন, হয়ত' অত চিন্তিত হবার সত্যিই কোন কারণ ছিল না।

'খবরটুকু কি ছাপিয়ে দেওয়া যেত না?'

'সেটাই ভুল হয়েছে।'

নিশ্চয়ই যেত। এককোণায় ছোট একটি খবর। একটি পরিবারের কৃতজ্ঞতা পাওয়া যেত। একটি গ্রামবাসী বৃদ্ধের অন্তরে বিশ্বাস থাকত নামটি পরিষ্কার আছে তাঁর, কেউ তাঁকে অত্যাচারী মনে করছে না।

কিন্তু পুলকের ধৈর্য থাকেনি। শেষ অবধি ঝগড়া বেধে যায়। লোকটিকে চলে যেতে বলা হয়। বৃদ্ধ যখন সাদা ও বড় ছাতাটি তুলে শাসান 'আদালতে যাব, বিচার চাইব, মান হানি হয়েছে আমার' তখন পুলক হাসি চেপে রাখতে পারেনি! বোকা বৃদ্ধ জানতনা কার সঙ্গে কথা বলছে।

'আদালতে যাবে!' পুলক কতকগুলো কথাবলে যা সে কেন কোন ভদ্রলোকের পক্ষেই বলা অনুচিত। 'যান যান, আপনার মত মাতব্বর অনেক দেখছি। মিছেমিছি কাজের সময় নষ্ট করছেন আমাদের, কাগজে নিত্যি নিত্যি এরকম অনেক খবর ছাপা হয়। মুরোদ থাকে মামলা করুন গিয়ে। আমরা কারো কাছে অ্যাপোলজি চাই না।'

তখনই ভদ্রলোক সহসা পুলককে মারতে থাকেন। পুলক ধারণায় আনতে পারেনি সত্যি সত্যি তাকে উনি মারবেন। ক'ঘা বেশ জুত ক'রে মারেন, নিজেও দু'ঘা খান।

'তারপর?

'আমি কেবিনে, তিনি নিমতলায়।'

'কেন?'

'বুড়োবয়সে হার্টফেল ক'রে বসল।'

'তখনই?'

'না। হাজতে।'

অমল একটু চুপ ক'রে থেকে বলল 'ভদ্রলোক যা চেয়েছিলেন সেটুকু কি করা যেত না?'

'যেত।'

পুলকের জামাইবাবু এবং অন্যরা পুলকের ওপরেই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। বলেছেন ভবিষ্যতে যেন এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।

পুলক বলল 'এরা খুব নোবেল ত? তাই লোকটা মারাগেছে জেনেই ছেড়ে দিলে।'

'নইলে?'

'এদের বারফট্টাই পিঁপড়ের মত টিপে শেষ করে দেওয়া যায়। যদিও আমরা সবাই খুব নোবেল, তা করি না। হ্যাঃ, মানহানির মামলার ভয় দেখায়!'

পুলকের ভাবভঙ্গীতে মনে হ'ল তার জামাইবাবুরা যদি এত ভদ্রতা না দেখাতেন তাহ'লেই সে খুসী হত। বলল 'জামাইবাবু ত' চটে গেছে। বলছে নিজের দায়িত্বে অফিসঘরে বসে হ্যাংগামা বাধানো উচিত হয়নি।'

অমল আর শুনতে চাইল না। বলল 'থাক ভাই, আমি উঠি। তোমার বেশী লাগেনি ত?'

'আমাদের জীবনে এসব ত' থাকবেই ভাই' পুলকের মুখ দেখে মনে হ'ল হবু শহীদ কথা বলছে।

'এরপর একটু বিশ্রাম নিও।'

'ভাবছি কিছুদিন বাইরে যাব।'

'তাহ'লে ত' ভালই হয়।

একটি মেয়ে ঢুকল, বেশে সেজেগুজে এসেছে। বুকের ওপর শক্ত ক'রে একতোড়া ফুলচেপে ধরে আছে, ছবিতে যেমনটি দেখা যায়। অমল উঠে পড়ল। পুলক হঠাৎ মেয়েটির উপস্থিতি ভুলে গিয়ে, অথবা মেয়েটি ঘরে ঢুকেছে বলেই উৎসাহের আতিশয্যে, এমন একটা কথা বলে বসল যা শুনে অমলের নাক কান গরম হয়ে গেল। 'এই যে অমল, চলে যাচ্ছ, কি করছ না করছ জিগ্যেসকরা হ'লনা, চেহারাটা অবশ্য ভালই দেখলাম, যাক সেরকম অবস্থাটা এখন আর নেই। দেখে খুব আনন্দ হ'ল, যে হতভাগা অবস্থা দেখেছিলাম !'

অপ্রত্যাশিত এই অসভ্যতায় অমল নির্বাক। অসহ্য রাগের জ্বালাটা দপ করে জ্বলে উঠল, সেটাকে একটু প্রশমিত হ'তে দিয়ে অমল বলল 'মনে নেই তখন আমার অবস্থা বিশেষ ক'রে খারাপ ছিল কিনা। মনে আছে তুমি আমার কাছে টাকা ধার করতে এসেছিলে, তোমার সে কথাটা মনে আছে ত ? আমার যে অবস্থা ছিল সেদিন সে অবস্থাতেই টাকা চাইতে পেরেছিলে।'

পুলক কি বলল সেটা শোনা গেলনা। বেরিয়ে এল অমল। রেগে পথ চলতে চলতে মনে হ'ল নোংরা এবং জঘন্য চরিত্রের ওই লোকটা তার জীবনে এঁটেল কাদার মত লেপটে আছে। কেন ওকে অমল সহ্যকরে কে জানে ! মনে হ'ল আরো ক'টা কথা শুনিয়ে দিলে পারত, কিন্তু অত নিচে যে নামা যায় না। রক্তের অনুশাসন কি অমোঘ। যেখানে রূঢ় হওয়া প্রয়োজন সেখানেও সংকোচ এসে বাধা দেয়।

বাড়ী ফিরল খুব তাড়াতাড়ি।

সে ফিরেছে বাবা মা বোঝেননি। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে অমল অনেকদিন বাদে বাবা মার কথা শুনল।

বাবা মোড়ায় বসে আছেন, মা আটা মাখছেন। পেতলের থালা মেঝেতে ঘষে কিঁচ কিঁচ শব্দ হচ্ছে।

'আমাদের কর্তব্য ওকে সংসারী করা। ও যা ছেলে, নিজের সুখ সুবিধের কথা মুখ ফুটে বলবে না।' বাবার গলাটা মৃদু।

'সরিতের মত ছেলে নিজের বিয়ে নিজে ঠিক করছে, নিতু কবে কি বলে বসে তার ঠিক কি ?'

বাবা হাসলেন। ভারী প্রসন্ন এবং তৃপ্ত তাঁর কণ্ঠ 'কি যে বল ! নিজের ছেলেকে চেন না ?'

'বিয়ের কথা তুললে আমল দেয় না। আজকাল ও যে কি বদলে গেছে ! দেখে দেখে আমার চিন্তা হয়।'

'চিন্তা কর কেন ? ওই তোমার এক অভ্যেস, খালি খালি দুশ্চিন্তা কর।'

'ব্যবসা করছে, টাকাপয়সা পাচ্ছে না এমন নয়, চেহারা তবে দুশ্চিন্তায় কালীবর্ণ হচ্ছে কেন ?'

'কি হয়েছে জিগ্যেস করনা কেন ?

'সেদিন সরিৎ বলছিল ও প্রেস দেখতে যেতে চাইতে নিতু নাকি রেগেমেগে দশকথা শুনিয়ে দেয়। কই, কথায় কথায় ওকে কি দূরছাই করত ?'

একটু থেমে বললেন 'সরিৎকে ত' আমি আজ থেকে দেখছিনা। নিতুর জন্যে প্রাণ দিতে পারে, অমন মন, অমন ভালবাসা, ও বেচারা অবধি কত চিন্তা করে।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে। পুরুষ মানুষ, কাজকারবার করছে, চিন্তা ভাবনা ত' থাকবেই। ভালক'রে খেতেটেতে দি'ও।'

'জানিনা, ওর শুকনো মুখ দেখলে আমার বুকটা যেন শুকিয়ে যায়।'

বাবা বললেন 'নাও, এবার হাত ধুয়ে গুড়ের বাটিটা দাও। দোকান থেকে ঘুরে আসি।'

বাবা মা'র কথা শুনে অমল বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। লুকোন যায় না, মার কাছ থেকে বেশীদিন সে কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারেনি।

মা বোধহয় সবচেয়ে আগে বুঝেছেন তারমনে শান্তি নেই। একটু ভালভাবে বাঁচবার জন্যে, একটু সচ্ছলতার স্বাদ পাবার জন্যে সে শান্তি স্বস্তি বিক্রী করেছে। জোজোর সংস্রবত্যাগ না করলে সে স্বস্তি পাবেনা। কিন্তু কেমন ক'রে ত্যাগ করবে ?

বাবা যদি কোনদিন জানেন কি কাজ করেছে অমল, কত নীচ একটি লোকের সঙ্গে ঘৃণিত একটি কাজে লিপ্ত হয়েছে তাহ'লে হয়ত' হার্টফেল ক'রেই মারা যাবেন। বিশ্বাস করতে পারবেন না। এমনিতে ভীরু-স্বভাবের লোক হ'লে কি হয়, আসলে মোটেই রত্নাকরের পিতা নন। কোনদিনই বলবেন না পাপ করেছ তুমি, তাতে আমার কি ? বলে বসবেন আমার যা ছিল সব এক কথায় ছেড়ে দিয়ে এখানে এসেছিলাম, অধর্ম করিনি। তুমি অধর্মের অন্ন আমায় খাওয়ালে কেন ?

বহুবার মনে হয়েছেও, আবার অমলের মনে হ'ল তার বাবা মা ঠিক এখনকার দিনকালের উপযোগী লোক নন। সে নিজেও হয়ত' নয়। অথচ মানিয়ে নিতেই হয়। নইলে টেকা যায় না। পৃথিবীতে বহু দেশের বহু উপজাতি না কি এমনি ক'রে লুপ্ত হ'য়ে গেছে, প্রত্যহই যাচ্ছে, এসব অবলুপ্তি নীরবে ও অলক্ষ্যে ঘটে। কেউ জানতে পারে না।

জোজো অন্তর্যামী।

সেদিন হাসতে হাসতে বলল 'সব সময়ে ভাব কেমন ক'রে এখান থেকে পালাবে তাই না ?'

অমল চমকে উঠল মনে মনে, বাইরে মনের ভাবটি চেপে রাখল। বলল, 'কে বললে ?'

যূথী কফি ঢালছিল। জোজো বলল 'জান যূথী, আমার ওপর অমলের বড্ড রাগ। মনে করে আমি ওকে দিয়ে নানারকম অন্যায় কাজ করাচ্ছি।'

'বিশ্বাস করি না।' যূথী মিষ্টি হাসল।

'এর একটি বন্ধু আছে কাগজে। অমলের মনেমনে ইচ্ছে তাকে সব বলে দেয়।'

'বলে না কেন ?"

'বোধহয় ভাবে সেটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, হজম করতে পারবে না।' অমল চোখতুলল। যূথী খুব শান্ত, স্নিগ্ধ একটি লক্ষ্মী মেয়ের মত কফি করছে, কৌটো থেকে প্লেটে বিস্কিট রাখছে। সাদা তাঁতের শাড়ী, সাদা জামা, মুখের ভাবটি স্নিগ্ধ, তাতে আরও ক্লান্ত ও করুণ দেখাচ্ছে। পরে মনে হয়েছে অমলের কি ছিল যূথীর চোখে যা তাকে আকৃষ্ট করত, চিন্তিত করত ? কেন তা জানতে চায়নি ? হয়ত' সম্ভব ছিল না। শোভন হত না। তার চেয়েও বড় ছিল ভয়। যূথীকে সে বিপন্ন করতে চায়নি। ভেবেছিল দরকার কি তার, কেন পরের ব্যাপারে মাথা গলাতে যাবে।

জোজোর কথা শুনে যূথী চোখ তুলল 'কে বললে অমল তোমার ওপর রাগ পুষে রাখে ? তাহ'লে কখনো এখানে আসে ? তুমি জাননা তোমার কাজ ও কেমন মন দিয়ে করে। আমি মাঝেমাঝে বিরক্ত করি তা একেবারেই পছন্দ করে না।' আবার একটু হেসে বলল 'শুনে রাখ অমল, তোমাকে একটু দেখাশোনা করা ও আমার কাজ, জোজো বলে দাও ত' ?'

'অমল তোমার ওপরও চটে যায় বুঝি ?'

'বিব্রত হয় বই কি, ও ত' জানেনা তোমার এখানে আমারও কাজ থাকে, এটা আমার কাজ' যূথীর গলাটা হঠাৎ থেমে গেল, যেন কেউ চলন্ত রেকর্ড থেকে পিন তুলে নিল। ঘরের কোথাও না বলা কথার একটা না-শোনা রেশ লেগে রইল।

পরে যূথী উঠে গেলে অমল বলল 'তুমি ও ধরণের বাজে ঠাট্টাগুলো কেন কর বলত ?'

'কেন, মিথ্যে বলেছি ?'

জোজো গলাতুলে হাসল। বলল 'জড়ানো সোজা খোলা বড় শক্ত হে, যেতে পারবে না।'

'আমার মত লোক তুমি অনেক পাবে।'

সঙ্গে সঙ্গে যূথীর কথা মনে হ'ল। বলল 'আমার মত নাচার অবস্থায় তোমার কাছে অনেকেই আসবে।'

'কেন তুমি কি অন্য কোথাও যাচ্ছ না কি?'

'না।'

'কি জানি, ভাবলাম সেদিন যেমন ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলে, বন্ধু বোধহয় পথ ধরিয়ে দিল একটা।'

'তুমি আমার পেছনে লোক রাখছ না কি আজকাল?'

'যে মেয়েটা গিয়েছিল সে যে আমারও চেনা।'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি সম্পর্কে অমলের খারাপ ধারণা হ'ল।

'তোমার ও বন্ধুটি অতি ওঁছা ছেলে।'

শয়তানের সঙ্গে সঙ্গ করতে করতে জোজো বোধহয় জ্ঞানী হয়, প্রতিদিন একটু একটু করে জ্ঞান পায়। এখন তাই অমলকে জ্ঞানের কথা বলতে লাগল 'আমরা ত' ভাই মন্দ আছি, মন্দই আছি। ভাল মানুষ সেজে ত' বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি না। আজকালকার ছেলেদের আস্পা কত। সব বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, বাইরে লক্ষ লক্ষ সাজানো কথা, অথচ এদিকে···'

বলতে বলতে থেমে গেল। বলল 'কখনো বোকার মত কারো কাছে গল্প করতে যেওনা।'

'যদি গল্প করি, জোজো, তাহলে কি তুমি আমায়··· ?

অমল কথাটি শেষ করল না।

'নাঃ তোমায় আমি ভয় পাই না, তুমি যে আমার বন্ধু' কথাদিয়ে যতটা আদর করা সম্ভব জোজো তা করল। এমনভাবে কথা বলতে লাগল, গায়ে যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কেন এ সব বাজেকথা ভাব বলত'? টাকাপয়সা পাচ্ছ, বাপ মাকে একটু আরামে রাখ, ভাল একটি মেয়ে দেখে বিয়ে কর।'

তারপর, অমলকে কত ভালবাসে তাই বোঝাবার জন্যে জোজো যেন ব্যাকুল হয়ে উঠল, বলস 'আজ নয় আর থেকনা, বাড়ী চলে যাও।'

এমন কাণ্ড, তার ক'দিন বাদেই জোজোর লালবাজারের অফিসঘরে পুলিশ এল।

সকাল, বেলা দশটা।

রোদ বেশ তেতে উঠেছে, স্নানকরতে যাবার আগে অমল বেশ আয়েস করে বিছানায় গড়াচ্ছে, মা এসে বললেন 'বাইরে কে এসেছেন দেখ দিখি।'

বাইরে এসে অমল অবাক। জোজোর গাড়ীটি চালিয়ে যূথী এসেছে।

'ভেতরে আসুন' অমল তাকে নিয়ে এল। তার ঘর ছাড়া বসাবার ভব্যজায়গা বাড়ীতে নেই। যূথী বলল 'জোজো বলে পাঠাল খবর না পাওয়া অবধি তুমি যেওনা। কাল পুলিশ ওর অফিসে গিয়েছিল।'

আস্তে বলল 'কে দরজা খুলে দিয়েছিল ? মা ?'

'হ্যাঁ'।

যূথী এদিকে ওদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, কি দেখছিল তা সেই জানে। অমল মাকে ডেকে আনল।

'মা, ইনি জগজ্জ্যোতি সিংহের স্ত্রী। এঁদের এখানেই আমি···।'

'তুমি কথাটথা বল, আমি চা ক'রে আনি।'

বাবা বাজার থেকে এলেন, এবং এসেই খাবার আনতে গেলেন।

যূথী বাবার সঙ্গে বেশ সহজ ভাবে গল্প করল। বাবা বেশ আগ্রহান্বিত হয়েছেন। এই মেয়েটির স্বামীই যদি অমলকে ব্যবসায়ে নিয়ে থাকে তবে একে খাতির করা উচিত। জানতে চাইলেন অমল কেমন কাজকর্ম করে, কতবড় প্রেস, উন্নতির সম্ভাবনা কি রকম।

অমল মনে মনে কাঁটা হ'য়েছিল। কে জানে যূথী কি বলবে। যদি বেফাঁস কিছু ব'লে বসে ?

যূথী তাকে আশ্চর্য করল। চা খাবার খেল, বাবার সঙ্গে ভাল ক'রে গল্প করল। তারপর বাবা জানতে চাইলেন কোথায় বাড়ী দেশঘর কোথায়।

'এই কলকাতাতেই।' যূথী মিষ্টি হাসল। তারপর এদিক ওদিক

চেয়ে বলল 'কি সুন্দর বাড়ীটি আপনার। বড় শান্ত।' বাড়ীটি ঘুরে ঘুরে দেখল। মা'কে বলল 'কি পরিষ্কার করেই যে রেখেছেন, দেখতে কি ভাল লাগে।'

যাবার আগে পুকুরঘাটে এল। বলল 'অমল, একদিন এসে বেশ এখানে ব'সে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করব, কেমন ?'

'যেদিন খুশী।'

'তুমি একডালিয়া গিয়েছিলে না কি ?

'না।'

'একদিন হয়ত' শিখবে, আজও তুমি পারনা অমল।'

'কি পারিনা ?'

'মিথ্যেকথা বলতে। তুমি গিয়েছিলে।'

অমল কি বলবে ভেবে পেল না। অপ্রস্তুত হয়েছে, সেই সঙ্গে কৌতূহল।

'গিয়ে হয়ত' দেখেছ, দ্বিজেশরায় তোমায় ঢুকতে দেবেনা, তাই না ?'

'যে বাড়ীর কথা আপনি বলেছিলেন, সে বাড়ী নেই। নতুন বাড়ী উঠেছে।'

'নতুন বাড়ী !' যূথী যেন আশ্বস্ত হয়েছে।

'সে বাড়ী একটি মাড়োয়ারীর।'

'মাড়োয়ারীর !' যূথী ঘাটের হিজল গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

'ঝাউগাছ নেই ?'

'না।'

'এরপর একদিন, ঘুরতে ঘুরতে খবর এনে দিও দ্বিজেশরায় আছেন কি না।'

'দেখব।'

'দ্বিজেশরায় যদি বেঁচে না থাকেন তাহ'লে আমার মত সুখী কে ?'

অমলের মনে হ'ল এতক্ষণ বাদে যূথীর কথা আবার অসংলগ্ন হ'তে সুরু করেছে।

'যাক, এসব কথা ভুলে যেও অমল। আমারই মাথার ঠিক থাকে না, কখন কি বলি।'

তারপর গাড়ীতে উঠে হেসে বলল 'মনে রেখ, খবর না পেলে যাবে না।'

'আবার আসবেন।'

'আসব।'

তারপর সব ভোঁ ভাঁ। কারো দেখানেই, জোজো আসে না, যূথী আসে না। একা একা অমল দুর্ভাবনায় মরে। কি হবে, যদি হুম ক'রে কাগজে বেরোয় কিছু? দরজায় ছায়া পড়লে চমকে ওঠে অমল, সকালে কাগজ খুলতে ভয় পায়। একা একা যন্ত্রণা সওয়া কি কঠিন, কিন্তু কাকে বলবে? বাবা মা-কে বলাই যাবে না, এখন অমল বুঝে দেখল বন্ধুকে অবধি বলতে পারবেনা।

সরিৎ বোধহয় আঁচ করেছিল।

'কিছুই হয়নি, অত ভাবিস কেন?'

'ওই লোকটা, কি যেন সিংহ, তার সঙ্গে কারবার করতে যাবার পর থেকেই তুই বদলে গেছিস।'

'কি রকম বদলে গেছি সরিৎ?'

সরিৎ একটু ভাবল। বলল 'আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চেষ্টা করছিস।'

'বাজে কথা।'

'বাজে কথা যে আমি বলিনা তা তোর চেয়ে কে ভাল জানে?' সরিৎ হাসি ভরা চোখে চাইল। 'জানিস তোর আচরণে এখন আমরা সবাই কি রকম চিন্তিত?'

'কে কে চিন্তা করছে?'

'মাসীমা ত' বটেই, সেদিন দাদা অবধি বলছিল নিতুটা খুব বদলে গেছে, পথে দেখলে চিনতে পারে না।'

'এই দেখ' আমি তড়িৎদাকে পথে দেখলাম কবে?'

'কবে যেন তোকে দেখেছে, বলছিল।'

'যাঃ আমি খেয়ালই করিনি।'

'শোন্, তেমন যদি কোন চিন্তার কারণ থাকে ত' বল্। ভাললোক আছে, হাতটা দেখিয়ে দিই।'

'আবার কাকে ধরেছিস?'

'আছে একজন।'

'আমার ও সবে বিশ্বাস নেই।'

'বিশ্বাস হবে, কথা কইলেই বিশ্বাস হবে।'

'দূর' বরাতে যা আছে তাই হয়, ওসব ক'রে কিছুই হয় না।'

'কি, টাকা পয়সা পাচ্ছিস না বুঝি?'

'না, সে দিকে খুব অসুবিধে নেই।'

'কোনদিকে অসুবিধে নেই, চিন্তার কারণ নেই, তবে তুই আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছিস কেন?'

সরিৎ গম্ভীর এবং বিষণ্ণ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল, 'তোর মনে যদি নীতা সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকে তা-ও বল্।'

'নীতা খুব ভালমেয়ে।'

'আমার মন রেখে কথা বলিসনা। তুই যখন আমার মন রেখে কথা বলিস একমাত্র তখনই আমার মনে হয় সব বাজে, সব মিথ্যে। আমি ভাবতে পারি না এমন দিন আসবে যখন আমি আর তুই পরস্পরের কাছ থেকে মনের কথা গোপন করছি। কত কি যে ভাবি আমি, কি হ'ল তোর, কেন এমন মনমরা হ'য়ে থাকিস, ভেবে পাই না। এমনও মনে হয়েছিল...'

অমল চমকে উঠল।

'মনে হয়েছিল হয়ত' নীতা সম্পর্কে তোর কোন দুর্বলতা ছিল।'

ছিল, দুর্বলতা তাকে বলা যায় না, একটি ছোট এবং সুন্দর আশা মনের একান্তে হয়ত' দেখা যাচ্ছিল, এখন আর সে-সব কিছুই নেই।

'না।' অমলের গলা খুব গম্ভীর 'ওসব অলীক ধারণায় কষ্ট পাসনা। দুশ্চিন্তা হবার কারণ আছে ঠিকই। এ-ও ঠিক, সেকথা এখন বলবার নয়।'

'কেন ?'

'তাতে আমার ত' বটেই, অন্যদের অনিষ্ট হতে পারে।' সবগুলো মুখ মনে পড়ল। বাবা মা, যুথী।

"ও।' সরিতের ছোট্ট কথাটি একটু পরে শোনা গেল।

'সময় হ'লে বলবি ত'? সরিৎ অমলের হাতে হাত রাখল। 'বলব।'

পরদিনই জোজো এল।

যেন কিছুই হয়নি, মুখে পান, কোঁচা লুটিয়ে পড়ছে, ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ ছড়িয়ে ঘরে ঢুকল। বলল 'কাল যেও।'

অমল যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

কিছুই হয়নি তাহ'লে, গুরুতর কিছু নয়। পরদিন অমল একটু তাড়াতাড়িই গেল। জোজো তার জন্যই অপেক্ষা করছিল।

অমল জিজ্ঞেস করল 'কেন পুলিশ এসেছিল জোজো ?'

'কি করে বলি ?'

একটু ভেবে বলল, 'কেউ শত্রুতা করতে চেষ্টা করছে।'

'কে ?'

'এখনো জানিনা।'

তারপর জোজো এ প্রসঙ্গটি চাপা দিয়ে বলল 'ও ঘরে গিয়ে দেখবে কাজ পালটে গেছে। আমরা শুধু ওদের কাজ করছি।' একটি বিখ্যাত অতি পরিচিত প্রচার-অফিসের নাম করল।

একটি হাই তুলে বিকৃত মুখ ভঙ্গী ক'রে বলল 'ওঃ, এই ক'দিনের মধ্যে অর্ডার বের করতে প্রাণটি বেরিয়ে গেছে।'

নিজের ঘরে বসে অমল শুনতে পেল জোজোর গাড়ী বেরিয়ে গেল।

ঘরটা খালি খালি লাগছে। বড় বড় প্যাকিং বাক্স বোঝাই করে সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে বোধহয়। নিশ্চয় সেই ঘরটিতে, কিংবা ওরকম ঘর এ বাড়ীতে হয়ত' আরো আছে। কিন্তু পুলিশে খবর দিল কে ?

চারিদিকে তাকাল। হয়নি, কোন পরিবর্তনই হয়নি বলা চলে।

বড় একটি তেল কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার ছাপা হচ্ছে, নানারকম ডিজাইন সম্বলিত বিলেতী প্রচারবিজ্ঞানের বই অমলের টেবিলে সাজানো। বিজ্ঞাপনের যুগ, বিজ্ঞাপন ছাড়া না কি কিছুই হয় না। রোজ সকাল বেলা কাগজ খুলে যখন পড়া যায় এই বিশেষ চা-টি সবচেয়ে ভাল, ট্রামে বাসে যেতে যেতে যখন যেদিকে চোখ ফেলা যায় সেদিকেই যদি ঐ চা-এর নামটিই দেখা যায়, তাহলে সেখানেই অজান্তে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি পরাস্ত হ'তে থাকে। তারপর মনে হয় সত্যিসত্যিই ঐ বিশেষ চা ছাড়া জিভে কিছুই ভাল লাগছে না। কিন্তু পুলিশে খবর দিল কে ?

এ ঘরে একা একা বসে থাকলেই অমল যেন নতুন ক'রে পুরনো সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে থাকে। বিপন্ন, ভয়ানক বিপন্ন সে। জোজো নিশ্চয় এ ধরণের অবস্থায় অভ্যস্ত। ওর আর কি, সগর্বে বলতে পারবে হ্যাঁ, পুলিশ এসেছিল। টাকা পয়সা খোয়াবার আশঙ্কা করে ও কাবু হতে পারে, মান ইজ্জতের ত' বিশেষ বালাই নেই। কিন্তু অমল যে ভয় পায়। মান সম্মান, বংশমর্যাদা। রক্তের ভেতরে ভয় বসে আছে, অমল আস্ফালন ক'রে কি করবে। পুলিশ দূরের কথা, সামান্য অশান্তি দেখলেই তার বাবা সরে এসেছেন। এ বংশের ছেলে হয়ে নাকি কোন মতে নিজেকে সস্তা করতে নেই। অমল যদি কোনভাবে জড়িয়ে পড়ে তাহ'লে বাবা কি বাঁচবেন ? কিন্তু পুলিশকে কে গিয়ে খবর দিল ?

মনের পেছনে একটি ধারণা। স্পষ্ট নয়, তবু একটু একটু ক'রে দানা বাঁধছে। যেন মসলিনের পর্দার পেছনে একটি ছায়া নড়ছে। এই

মনে হয় ছায়া, এই মনে হয় দেখাযাবে ও কে। কিন্তু পুলিশে খবর কে দিলে?

চোখ তুলল। দরজার বাইরে লম্বা একটি করিডর। তার ও প্রান্ত থেকে একটি মেয়ে হেঁটে আসছে সাদা কাপড় প'রে। যূথী।

অমল তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে। পেয়ে নিজেই অবাক। আবার নতুন ক'রে ভয়পেয়েছে। এ কি হ'ল? যূথীকে আসতে দেখে তার মন যেন গভীর ও গোপন কোন প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল। কেন? ওর সম্পর্কে তার এ আগ্রহ কেন? যূথী-ও বিপন্ন ব'লে? যূথী যে পুলিশে খবর দিয়েছে সে বিষয়ে তার মনে যেন কোন সন্দেহ নেই, কেন?

যূথী তার দিকে চাইল না, পাশের ঘরে চলে গেল। অমলের মনে হ'ল সংকোচ করবার সময় এটা নয়। এখনই যাওয়া দরকার, বলতে হবে।

যূথী বসে আছে। চেআরে হেলান দিয়ে, পা দুটো পেতলের থালা বসানো টেবিলে তুলে দিয়েছে। গলাটা পেছনে হেলানো, গলাটা লম্বা এবং সরু।

'একটা কথা বলব?'

অমল যেন কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। জিগ্যেস করল 'আপনি এ কাজ করলেন কেন? নিশ্চয় আপনিই খবর দিয়েছিলেন, কিন্তু কেন?'

যূথী চেয়ে রইল। ভয় পেয়েছে, না ভয়ের বোধ ওর হারিয়ে গেছে বোঝা যায় না?

'এতে যে আপনারও বিপদ। আপনি বিপদে পড়বেন। কেউ আপনাকে বাঁচতে পারবে না। আপনি বোধহয় জানেন না ঐ তোতামিত্তির লোকটি আসলে অতি ভয়ানক।'

'বোস অমল, বসে কথা বল।'

'ওরা যদি জানতে পেরে আপনাকে বিপদে ফেলে? আমিই কি বাঁচব? আমার বাবা, মা, না না, এর মধ্যে আপনি যাবেন না।'

'বসে কথা বলনা, আচ্ছা পাগল ত?' যূথী ওর হাত ধরে বসিয়ে দিল।

বসে পড়ল অমল। চারিদিকে তাকিয়ে নিজের বোকামিটা যেন ভাল করে টের পেল। মুখটা মুছে নিল রুমালে। শুকনো গলায় বলল 'আমি হয়ত' খানিকটা বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছি, মাপ করবেন।'

'কেমন ক'রে মনে হ'ল আমি খবর দিয়েছি?

'জানিনা, এমনি মনে হ'ল।'

'খুব ভুল তুমি করনি। খবর আমিই দিতে চেয়েছিলাম। শেষ অবধি যেন গোলমাল হয়ে গেল সব।'

'কেন করতে গেলেন এ কাজ?'

'আচ্ছা অমল, আমি যদি না দিই খবর, তাহ'লেই কি সব এমনি গোপন থাকবে? যেমন যা চলছে তাই চলবে?'

'জানিনা ভেবে দেখিনি।'

'তুমি ভাব, এই যেমন আসছ যাচ্ছ, সব এমনিই থাকবে? তা কখনো থাকে? এতবড় পাপ, এ যে প্রকাশ পাবেই একদিন।'

'আপনি কেন নিজেকে বিপদে ফেলবেন?'

'আমার যে নতুন ক'রে খোয়াবার কিছু নেই ভাই। আমি মরে গেলে ছ'ফোঁটা চোখের জলফেলে এমন কেউ নেই পৃথিবীতে।'

'কেউ নেই?'

'কেউ নেই।'

একটু থেমে যূথী বলল 'জিগ্যেস করতে পার এতদিন যে নীরবে থেকেছে সে আজ এমন ব্যবহার করছে কেন।'

অমল নীরব।

'তোমার বয়স কত ঠিক জানিনা। আমি একজনকে জানতাম তার নামও ছিল অমল। আশ্চর্য স্বভাব ছিল তার। বাবাকে বড় ভক্তি করত। তার বাবা ছিলেন মস্তবড় ব্যাঙ্কের মালিকদের মধ্যে একজন। ব্যাঙ্ক

যেদিন ফেল করল, ও যখন দেখল যে বাবাকে যে এত শ্রদ্ধা করত তিনিও এর সঙ্গে জড়িত, তখন মনে বড়ই আঘাত পায়।

'অনেকদিনের পরিচয় আমাদের। নিজের বাড়ী ছাড়া বাইরের লোক বলতে শুধু ওদের জানতাম। ও জগৎ সংসারে সব কিছুই ভাল বলে জানত। আমিও বিশ্বাস করতাম সবটুকুই ভাল। মন্দ বলে কিছু নেই। জানব কি করে? যেভাবে বড় হয়েছিলাম, একটুকু আঁচ লাগেনি গায়ে। শুধু অমলকে জানতাম, অন্যায় সইতে পারত না, সাহসের যেন শেষ ছিল না ওর। অথচ, সে একদিন...'

একটু থেমে বলল 'ওরা বলে সে আত্মহত্যা করেছে। বাবার অপমান সইতে পারেনি। আমার যেন বিশ্বাস হয় না। অপমানের লজ্জায় ও কাজ করবে সে ছেলে ত' নয়। শেষ দেখেছিলাম আমার কাছে বিদায় নিয়ে পথের ভিড়ে মিশে গেল। এখনো পথে পথে তাকে খুঁজে বেড়াই। কারো সঙ্গে তার হাটাটা মেলে, কারো মধ্যে তার চাহনি দেখতে পাই, তবে তাকে কখনই দেখিনা।'

ধীরে পা গুটিয়ে নিজের চেয়ারে বসল। বলল 'তোমার সঙ্গে তার কোথাও মিল নেই, আবার কোথায় যেন মিল আছে। তোমাকে এতদিন ধরে দেখছি, সেদিন তোমার বাবা মা-কেও দেখলাম। ইচ্ছে করে না তুমি এখানে থাক। সেদিন থেকে মনে হচ্ছে আবার যেন অমল ফিরে এসেছে, আবার যেন জোজো তাকে বিপদে ফেলতে চলেছে।'

অমল জিভ দিয়ে চেটে শুকনো ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল। 'আমাকে কি করতে বলেন?'

'আমার খুব ইচ্ছে তুমি জোজোর সঙ্গ ছেড়ে দাও।'

'আপনি কোথাও যেতে পারেন না?'

'বললাম যে, যাবার জায়গা নেই আমার?'

'আমি এমন বিপদে আপনাকে ফেলে যাই কি করে?'

'আমার কোন বিপদ হবে না।'

'তা কি জোর ক'রে বলতে পারেন আপনি?'

'পারি বই কি, তোতা রয়েছে না ?'

'তোতামিত্তির ?'

'হ্যাঁ। ও থাকতে আমার কোন ভয় নেই।'

'ভয় নেই ?'

'না। ও যে অমলপ্রতিমের নিজের দাদা।'

'কি বললেন ?'

অমলের তীক্ষ্ণ চীৎকারটি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল চাবুকের শিসের মত।

'অমলের দাদা। অমল একা ওদের বংশের সৃষ্টিছাড়া ছেলে ছিল, তাই ত' বাড়ী ছেড়ে কোথায় চলে গেল। তোতা মানুষ হয়েছিল মামাবাড়ীতে। ওর মামা ওকে দত্তক নিয়েছিলেন। মানুষ হয়নি, কিন্তু ভাইকে খুবই ভালবাসত।'

মাথার চুলগুলো একটু টানল যূথী। বলল 'জান এক এক সময়ে মনে হয় পাগল হয়ে যাব। মাঝেমাঝে এমন গোলমাল হয়ে যায় সব! যাক, তোমাকে কিছু কিছু কথা বলে রাখলাম। দরকার হ'লে সব বলে দিও।'

কথা বলতে বলতে যেন ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়ল যূথী, মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে চুপ ক'রে রইল। অমল আস্তে বেরিয়ে এল।

এতদিন যেন যূথীর চাহনিটা কেন তাকে আকর্ষণ করত তা বোঝা যাচ্ছে। কোন সময়েই একলা তাকে দেখেনি যূথী তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকজনকে দেখেছে। বহু জীবিত মানুষের মধ্যে একটি মৃতকে খুঁজে বেড়ায় বলে ওর চাহনি ঐ রকম, গভীর, কৌতূহলী সপ্রশ্ন।

তাকে যে আর পাওয়া যাবে না তা তোতামিত্তিরের মত আর কে জানে? যূথীর প্রতি তোতার মনোভাবটা কি? ভাই যাকে ভালবাসত সেই দুর্ভাগা মেয়েটির প্রতি মমতা?

না স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা?

অমল এসব জিনিষ খুব বোঝেনা তবে এটুকু বোঝে একজনের

সম্পর্কে আরেকহৃদয়ের অনুভবটুকু কখনোই সরলরেখা ধ'রে চলে না। স্নেহ নয়, মমতা নয়, ভালবাসা নয়, অথচ সব, সব একসঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে। একে কোন একটি নাম দিয়ে চিহ্নিত করে দেওয়া বোধহয় চলে না।

অনেকদিন পরে অবশ্য অমল জেনেছিল ভাইয়ের মৃত্যুর সময়ে তোতামিত্তির এদেশে ছিল না। ফিরে এসে সব জানতে পারে। কেমন করে যেন তার ধারণা হয় জোজোর সঙ্গে অমলপ্রতিমের নিরুদ্দেশ হওয়ার কোন যোগাযোগ আছে। ভাই মারা গেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার পরও সন্দেহ ঘোচেনি তার।

তাই সে আসত, বারবার, যখন তখন। পুরনোদিনে যা ছিল পরিচয়মাত্র, তার ওপরেই গড়ে ওঠে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।

আসত যেত তোতামিত্তির, জোজোর সঙ্গে কথা ব'লে নানাভাবে বের করতে চেষ্টা করত কিছু জানা যায় কি না।

শুধু যূথীর রক্ষণাবেক্ষণ নয়, নিজের স্বার্থও কিছুটা ছিল বই কি। তাই থাকে। একেবারে বিনাস্বার্থে ক'জন কাজ করে এ সংসারে? বরং এই-ই ভাল। কিছুটা স্বার্থ থাক, কিছুটা শুভবুদ্ধি-ও কাজ করুক, সহাবস্থান পাশাপাশি।

ছ'মাস বাদে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

তারও কিছুদিন পরে অমল যশোর রোডের বাড়ীতে আসা ছেড়ে দিল।

॥ তেরো ॥

এবার অসুখটা যে আস্তে আস্তে গুরুতর হবে তা যেন প্রথমটা বোঝা যায়নি।

মাঝেমাঝেই বাড়ীর দিকে চেয়ে বলতেন 'নাঃ, এ আর চোখে দেখা যায় না। পূজোর আগে মিস্তিরী লাগাতেই হবে।'

সত্যি সত্যিই বাড়ীটার অবস্থা ঝুরঝুরে হয়েছিল।

রান্নাঘরের ছাতে ফাটল, জল পড়ে। উঠোনের মাঝে মাঝে সিমেণ্ট উঠে গিয়ে গর্ত হয়েছে, তা হোকগে, সব চেয়ে চোখে লাগে ঘর দোর দেওয়াল দালানের আস্তর খসা ইঁট বেরকরা চেহারা। এখন সব সেরেসুরে বাড়ী রঙ করতে গেলেও অনেক খরচ।

তবু প্রতিবছরই বর্ষাকালে একবার করে কথাটা তোলেন বাবা। জাঁকিয়ে বর্ষা নামলে তবেই বোঝা যায় বাড়ীতে আসল গলদ কোথায়। রান্নাঘরের ছাত থেকে জল পড়ে, বালতি বসানো হয়, বাতাসের জোর থাকলে দালান ও পূবের ঘরের দরজা নড়তে থাকে। কবজা এবং ঝনকাঠ দুটিই আলগা হয়ে গেছে। সব চেয়ে মুস্কিল হয় দালানের ছাত নিয়ে। দেওয়াল বেয়ে দর বিগলিত ধারে জল নামে, ঠিক ইলেকট্রিক তারের পাশ দিয়ে।

বর্ষা পড়লেই মা বকবক করতে স্বুরু করেন। আসল দুর্ভোগটা তাঁরই ঘাড়ের ওপর দিয়ে যায়। এই বিষ্টিতে ভিজে ভিজে রান্নাঘরে যাওয়া আসা, যাবতীয় কাজ। তাছাড়া পুরনো কয়েকটি বাতিকও আছে তাঁর। ঝমঝম ক'রে বিষ্টি নামলে ঝাঁটা বগলে ছাত ধুতে যাবেন, উঠোন ধোবেন। কয়লা রাখবার ঝুড়িটা অবধি বিষ্টির জলে ধুয়ে সাদা চকচকে করে রেখে দেবেন। পশ্চিমের টানা দালানটির একপাশে মা'র

কর্মকুশলতার নিদর্শন স্বরূপ অনেক আধভাঙা ঝুড়ি আছে, ধুয়ে সাজিয়ে রাখা, কোথাও কোন ময়লা নেই।

বাড়ীর চট ছেঁড়া সতরঞ্চি সব বিষ্টিতে উঠোনে ফেলে ধোবেন, দালানের আড়বাঁশে টানিয়ে শুকিয়ে রাখবেন। অযথা এবং পণ্ডশ্রম করে শরীরপাত করছেন বললেই চটে যাবেন।

সবচেয়ে বড় বাতিক ঐ রান্নাঘরে যাওয়া। বহুবার বলা হয়েছে, কিছুতে ছোট তোলা উঠান ধরিয়ে দালানে রান্না করবেন না। যত জলঝড় হোক ঐ রান্নাঘরে গিয়ে নিজস্ব জায়গাটিতে বসা চাই।

এবার বর্ষার আগেই বাবা ঘুরে ঘুরে সব সংগ্রহ করছিলেন, বাড়ী মেরামতে হাতদিতে গেলে একদিন দরকার হবে ব'লে সব কিছুই রাখা হয়েছিল। কর্ণিক, কড়াই, বালতি, বাঁশ, দড়ি, সাবল, কোদাল। কবে চূণকাম হবে তার ঠিক নেই, পাটের ফেঁসো নিয়ে এলেন, নীলের কৌটো, মা-কে বললেন 'সব কিছুই দরকার হয়, কাজের সময়ে যেন ঠেকে যেতে না হয়।' মা বকবক করলেন 'অবাক করলে, বাড়ী চূণকাম করাবার ব্যবস্থা যদি হয় তাহ'লে সময়কালে কি নীল আর পাটের ফেঁসো পাওয়া যাবে না?

'আহা তা কেন, তা কেন, তবে একেই বলে দূরদর্শিতা, তুমি কি বুঝবে?'

বাবা মাঝেমাঝেই এ ধরণের সাংসারিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন তাই মা আর কথা বাড়ালেন না।

রং, চূণ, সিমেণ্ট, বালি সবই জোগাড় করছিলেন বাবা। বললেন 'অনেক ভেবে দেখলাম বসবাসের ঘর দু'খানা, দালান, রান্নাঘর আস্তে আস্তে সেরে নিই। কি বলিস?'

'আমি আবার কি বলব। ও সবের আমি জানি কি!'

বর্ষার ভাবগতিক দেখে বললেন 'ভাল মনে হচ্ছে না। আষাঢ় শ্রাবণে যদি চেপে বিষ্টি বাদল না হয় তবে শেষের দিকে জল নামবে, পুজো অবধি চলবে।'

বর্ষা এল বর্ষা গেল। পুকুরে কানায় কানায় জল, ছেলেরা চাঁদার খাতা হাতে বেরিয়েছে, পাড়ার দুর্গোৎসবে দেখা যাচ্ছে বলাই এবার পাণ্ডা। ছেলেরা তাকে 'বলাইদা' বলছে, পুজো কমিটির চেআরম্যান, তার বাড়ীতেই থিয়েটারের মহলা চলছে। একদিন একদল ছেলেকে নিয়ে বলাই এল। বলল 'আমি বললাম নিতু হচ্ছে লিটারারি ম্যান, কি বই হবে তা বলে দেবে, নেমন্তন্ন চিঠির বয়ান লিখে দেবে, ভাবনা কি ? এ সবে ও এক্সপার্ট।'

সে এক সময়ে। এখন ওসব ছেলেমানুষির কথা ভাবলে হাসি পায়। সে এক সময় ছিল। এ তল্লাটে একটি পূজো হ'ত বারোয়ারী। অমল, সরিৎ, বলাই চাঁদা তুলত, থিয়েটার করত, মহলা দিয়ে গলা ভেঙে যেত, শেষ পর্যন্ত ট্রাকে চড়িয়ে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে আসত। শূন্য মণ্ডপ রাখতে নেই, সেখানে তারা ঘুমোত, তিনজনই থাকত। শরতের হিমহিম জ্যোছনায় মশার কামড় খেতে খেতে অমলের লেখা প্রথম কবিতা বলাই আর সরিৎকে শুনিয়েছিল। বলাইটা ছিল মহা গোঁয়ার মোটামাথা, অমলরা সবসময়ে ওকে সঙ্গে না রাখলে ভয়ানক রেগে যেত। একবার ম্যারাপের খুঁটি ধ'রে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল।

সে অল্প বয়সে। তারপর তিনজন তিনজনের পথে গেছে, কাছাকাছি থাকলে কি হবে, কতটুকু দেখা হয় ? এখনত বলাই মস্তবড় মাতব্বর, সব কিছুতে এগিয়ে আছে।

দুর্গোৎসব সম্পর্কে বলাইয়ের উৎসাহ দেখে অমল আশ্চর্য হ'ল। তবে জীবনে কি সত্যিই কোন জটিলতা, যন্ত্রণা, সমস্যা নেই ? অমল যে কষ্ট পায় তা কি মনগড়া ? না যন্ত্রণা পাওয়া তার স্বভাব ? হয়ত তার স্বভাবের মধ্যে এমন কিছু আছে যা তাকে স্বস্তি পেতে দেয় না ? কে বলবে ? এরমধ্যেই মানুষ কেমন পূজো, থিয়েটার, নেমন্তন্ন পত্র নিয়ে মেতে আছে। হয়ত দুটোই সত্যি। জটিলতা আছে বলেই একটু হাঁফ ছাড়তে চায় মানুষ, আমাদের দরকার হয়।

সব বুঝেও পুজো নিয়ে মেতে ওঠা সম্ভব নয়। সব কিছুরই বয়েস

আছে। কিন্তু সে বোঝাবে কাকে? বলাইকে বুঝিয়ে বলা বড় কঠিন অমল সে চেষ্টাও করল না। হেসে বলল 'আমার, তোর ছজনারই ত বয়স হয়েচে রে! ভেবে দেখ, ওদের বয়সে আমরা মাতব্বরী ক'রে কি আনন্দ পেয়েছি, এখন ওদের ওপরেই ছেড়ে দে না! তবে হ্যাঁ কার্ডটা যেন জবড়জং না হয়...'

কেমনটি হ'লে শোভন হবে যে তা নিয়ে একটু আলোচনা করল। বলল 'বলাইকে পার্ট দিতেই হবে, সে তোমরা যে থিয়েটারই কর। বলাই অ্যাকটিং-এ বড় ওস্তাদ। আলমগীর যা করত না!'

বলাই খুব খুশী হ'ল।

ওঠবার সময়ে বলল 'মেসোমশাই-এর সঙ্গে বাজারের রাস্তায় দেখা হয়েছিল। বলছিলেন মিস্তিরী লাগাবেন। বলিস আমার হাতে ভাল মিস্তিরী আছে। নীলকণ্ঠকে পাঠিয়ে দেব।'

একটু অভিযোগ জানাল বলাই। বলল 'তোমরা ত' ভাই লেখাপড়া শিখে সব কিছু থেকে দূরে সরে গেছ। আমি সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। নীলকণ্ঠের বাবা আমাদের ইস্কুলের কম্পাউণ্ডে থাকত মনে পড়ে? সে ত মরে ভূত হয়েছে, এখন একে কাজ কর্ম জোগাড় ক'রে দিই। সেদিন কর্পোরেশন ইস্কুলে কাজ ক'রে দিলাম আমাদের সংস্কৃত স্যারের ছেলেকে।'

বলাই চলে গেল। অমল বাবাকে বলল 'আর কি, এবার জোগাড় যন্ত্র করতে থাক সব। বলাই মিস্ত্রী দেখে রেখেছে।'

মা বললেন 'বলাই খুব কাজের ছেলে হয়েছে।'

বলাই আগে কেমন ছিল, এখন পাড়ার মাতব্বর হয়ে কি কি পরিবর্তন হয়েছে এ নিয়ে ক'টা কথা হল। অমল বেরিয়ে যাবার সময়ে বলল 'বাবার চেহারাটা শুকনো দেখলাম।' ফিরে এসে শুনল জ্বর হয়েছে, আজ স্নান করেননি।

জ্বর মানে সর্দিজ্বর মনে হ'ল।

সেই অনুযায়ী চলতে লাগল সব, কিন্তু দেখতে দেখতে অসুখ কো

ঘোরানো হ'ল। পেটে যেন কিসের সংক্রমণ ঘটেছে, ঘিনঘিনে জ্বরও ছাড়ে না, পেটটাও ভাল থাকে না।

এখন বোঝা গেল অনেকদিন আগে থেকেই শরীরটি ভেঙেছিল। নিজেই নিজের চিকিৎসা করতেন। এই চিরতা বা ত্রিফলা ভিজিয়ে খাচ্ছেন, এই কলাপাতায় জড়িয়ে থানকুনি শাক কিনে আনছেন, কখনো শরীর ঠাণ্ডা করা দরকার ব'লে মিশ্রীর শরবৎ ভিজিয়ে খাচ্ছেন আবার ঠাণ্ডা লেগে গেল ব'লে ক'ঘণ্টা বাদেই গলার কম্ফর্টার জড়াচ্ছেন। হোমিওপ্যাথি ওষুধ, খলনুড়ি, সব তাঁর হাতের কাছে। শরীরে বিশেষ কিছু নেই, তাই অসুখ এমন জেঁকে বসল। ভেতর ফোঁপরা হ'লে যা হয়।

ডাক্তার বললে 'হাঁসপাতালে দিন। এখানে ওঁর সবদা দেখাশুনা করবার লোক নেই। হাঁসপাতালে সহজে সীট পাওয়া যায় না। যদি আপনাদের লোক না থাকে আমি চেষ্টা করতে পারি।'

হাঁসপাতাল! সবাই যায়, সবাই চিকিৎসা করায়, তবু অমলের কানে যেন কথাটা কোন্ অশুভ ইঙ্গিতের মত শোনাল। অভ্যেস, সবই অভ্যেস। তাদের বাড়ীতে এসব দেখেশুনে অভ্যেস নেই। যাদের বাড়ীতে অনেক লোকজন থাকে, বাইরে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকে, তারা হয়ত' এসব পরিস্থিতি বেশ সহজভাবে নিতে পারে। তাদের বাড়ীতে মেয়েবউ, ছেলেপিলে থাকে, বৎসরান্তে টিকে দেবার সময়েও হাঁসপাতালে যাবার দরকার হয় বাড়ী বিশেষে। তা ছাড়া চোখ দেখাতে, দাঁততোলাতে, হাত পা তেমন কাটলে সেলাই করাতে লোকে হামেহাল হাঁসপাতালে যায়।

অমলদের বাড়ীতে সবই বিচিত্র। রোগীকে হাঁসপাতালে দেওয়া মানেই যেন অবহেলা করা, এই ওঁদের মনোভাব।

অমল উদ্বিগ্ন হ'য়ে ডাক্তারকে বলল 'হাঁসপাতালে কেন? আপনি কি ভরসা পাচ্ছেন না?'

ডাক্তার বললেন 'দেখুন, সেখানে যে চিকিৎসার খুব রকমফের হয় তা হয়ত নয়, কিন্তু রোগীর সেবা! সেটা হবে ত। রক্ত ইত্যাদি যা যা পরীক্ষা করাবার সেগুলো-ও চটপট হবে।'

হাঁসপাতালের নাম শুনে হঠাৎ বাবার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। দেখে অমলের ভারী কষ্ট হ'ল। বাবার অবস্থাটা যেন সম্যক বুঝল ও। বলল, 'তুমি ভাবছ কেন, আমি আছি, আমি দেখব। বাড়ীতেই থাকবে তুমি।'

বাড়ী সারাবেন ব'লে ছেলের দে'ওয়া টাকা থেকে যা সঞ্চয় করেছিলেন এখন সবই খরচ হ'তে থাকল। আর যায় না অমল যশোর রোড, একদিন শুধু ব'লে আসতে গেল।

বাড়ীতে ছিল না জোজোরা, যূথী অবাক হয়ে বলল, 'কি হয়েছে? এমন চেহারা ক'রে এসেছ কেন?'

'বাবার বড় অসুখ।'

যূথী মন দিয়ে সব শুনল। অমল বলল 'আমি আর আসব না। জোজোকে আপনি ব'লে দেবেন।'

আর যে আসবেনা এখানে, সে সিদ্ধান্তটি নিতে বেশীক্ষণ লাগল না। এখন তার এই এক ভাবনা, বাবা যেন সব কথা জানতে না পারেন। কেন বারবার মনে হয়, যে সে এখানে কাজ নিল বলেই বাবার শরীর ভেঙে পড়ল? কেন নিজেকে পাপী মনে হয়?

যূথী আস্তে, কোমল স্বরে জিগ্যেস করে 'বাড়ীতে এত অসুখ, তোমার টাকার দরকার নেই অমল?'

'টাকার দরকার নেই?' অমল একটু হাসল।

'আমার যে নিজের বলতে কিছু নেই,' যূথীকে খুব অসহায় দেখাল 'দশ পনেরো টাকায় হবে তোমার?'

'থাক।' অমল বিষণ্ণ হেসে বলল 'একপক্ষে জোজোর সঙ্গে দেখা না হয় ভালই হয়েছে। দেখা হ'লেই হয়ত ও টাকা দিতে চাইত,

আমিও নিতে বাধ্য হতাম। এখন ভেবে দেখছি আমি আর ওর কাছে কোন বাধ্যবাধকতায় নিজেকে জড়াব না।'

'তুমি যদি আমার টাকা ক'টা নিতে আমি খুব নিশ্চিন্ত হতাম অমল।'

অমল একটু ভাবল। এই শেষ দেখা। আর যখন আসছে না তখন ওকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? কি করুণ চোখ যূথীর। এমন ভাবে চেয়ে আছে যে ওকে প্রত্যাখ্যান করতে মন চায় না। আজ চলে যাবার আগে ওকে অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কি বা বলতে পারে অমল?

'দিন।'

টাকাটা ভেতরের পকেটে রাখতে রাখতে অমল একটু হেসে বলল 'আমি কিন্তু আর আসব না।'

'জানি।' যূথীও হাসল।

'আপনি সাবধানে থাকবেন। কাউকেই বিশ্বাস করবেন না।'

'তুমি ত আর আসবে না।'

'না।'

উঠতে উঠতে অমল বলল 'এখনো বলছি বটে আসব না। জানি না পরে কি হবে। জোজোর কাছে আমি এসেছিলাম খুব একটা দুঃসময়ে। লোভ ছিল, টাকার লোভ ছিল, অস্বীকার করব না। দেখলাম আমি খুব শক্ত গাছ নই, ঝড় ঝাপটা সইল না। নিজেকে নামিয়েছি নিশ্চয়ই, কিন্তু এমন ক'রে বেশীদিন চলছিল না। সব সময়ে ভেবেছি সরে যাওয়া উচিত। সরে হয়ত যেতামই, বাবার অসুখটা হ'য়ে একপক্ষে ভাল হ'ল। তবে জোজো, সে কি আমায় অত সহজে ছেড়ে দেবে?'

'তুমি যদি বেরিয়ে গিয়ে ওর কোন অনিষ্ট না কর, তাহ'লে কিছু বলবে না।'

'অনিষ্ট?'

'ওকে ধরিয়ে দাও যদি····? অবশ্য তোমার অবস্থাটাও স্বাবধের নয়। যা সমর্থন কর নি, তার মধ্যে ত' তুমিও ছিলে। ওকে ধরিয়ে দিতে গেলে নিজেও জড়িয়ে পড়বে।'

'ধরিয়ে দিতে চাই, প্রকাশ ক'রে দিতে চাই সব।'

'কেন দাও না?'

'বিশ্বাস করুন, আমার কি হবে তা ভাবি না। বরঞ্চ, যেটুকু অন্যায় করেছি সেজন্যে শাস্তি নিতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু, আমি ভাবি আমার বাবা মা'র কথা। তাঁরা হয়ত' মনস্তাপে মারা যাবেন, আর আপনার হয়ত' কোন অনিষ্ট হবে যে জন্যে আমার এতটুকু দায় থাকলে জ্বলেপুড়ে মরব মনে মনে। যদি একলা হতাম তাহলে ভাবনা করতামনা'।

'আমার জন্য ভাবনা কেন?'

'কি জানি! একলা মেয়েছেলে, দেখার লোক নেই, তাই হয়ত ভাবনা হয়।'

'আমার জন্য ভেব না।'

'ভাববনা, যদি আপনি একটা কথা দেন।'

'কি কথা অমল?'

'আপনি কোন দুঃসাহসের কাজ করবেন না? নিশ্চয় বুঝেছেন আমি, আমি কি বলতে চাইছি। সেই কথাটুকু পেলেই নিশ্চিন্ত হয়ে আমি চলে যাই।'

যূথী একটু হাসতে চেষ্টা করল 'কেন, আমার জন্যে তোমার এত ভাবনা কেন?'

'বলুন।'

'অমল, বাড়ী যাও।'

'বলুন না, জবাব দিন আমার কথার।'

'অমল, তুমি এখনো অনেক কিছু বোঝনা।

মৃদু সকাতর নিশ্বাসের মত যূথীর কথাগুলো গন্ধফিকে হয়ে যাওয়া গোলাপের পাপড়ির মত ছড়িয়ে পড়তে থাকল।

'শুধু দুঃখযন্ত্রণা পেলেই মানুষ মনে মনে বড় হয় না। সংসারের কাছে আরো আরো পাঠ নিতে হয়। তুমি জাননা, জোর করে প্রতিশ্রুতি আদায় করতে নেই। আমি তোমায় মিছে কথা বলব না, একটিমাত্র ইচ্ছে নিয়ে বেঁচে আছি। ওকে শাস্তি দেব।'

'আপনি ?'

'হ্যাঁ, আমি। দিনে রাতে এককথা ভাবি, ওর জোরেই চলে ফিরে বেড়াই।'

'ও জানে ?

'জানে না ? খুব জানে। কত ঠাট্টা করে তোতার সামনে। ভাবে যূথী ত' আসলে ভিতু, সত্যি ক্ষতি করার সাহস যূথীর নেই। আমি আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করি। ওদের সামনে।'

'নিজেকে বিপন্ন করবেন না এটুকু কথা দিন।'

যূথী চুপ করে রইল। জবাব দিল না। কিছুক্ষণ উত্তরের প্রত্যাশায় উৎসুক চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে অমল যেন বুঝল যূথী কিছু বলবে না। একটি নিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এল সে।

একটু একটু করে বাবার অসুখ কি জটিলই হ'ল।

সরিৎ এল, তড়িৎ এল, যতীনকুণ্ডু এসে বাইরের ঘরে বসে থাকলেন। ডাক্তারের কাছ থেকে রোজ আসল খবরটি জানা চাই, অমলের মুখে শুনে তৃপ্তি হয় না। এখান থেকে বেরিয়েই নিজের নাড়ী দেখাতে পেট টেপাতে ডাক্তারখানা যান। বোধ হয় একটি সমবয়সী মানুষের আয়ু ফুরিয়ে এলে জেনে নিতে সাধ হয় নিজের মেয়াদ আরো কত দিন, ভয়ের কারণ আছে কি না!

আস্তে আস্তে প্রকাশ পেল পেটের অন্ত্রে ঘা হয়েছে, তলপেটে জল জমেছে।

এই সময়ে, বিশেষ প্রয়োজনে পুলকের কথা মনে হ'ল।

এখন ত' তার কোন অভাব নেই। ধারকরা টাকা, সে ফেরৎ দেবার কথা সহজে ওর মনে পড়বে না। অথচ অমলের খুবই দরকার।

এখন যেন বুঝতে পারছে, কেন ডাক্তার হাঁসপাতালের কথা বলেছিলেন। শুধু টাকাপয়সা খরচের কথা নয়, সেখানে দরকার হ'লেই আরো কত ডাক্তার পাওয়া যায়, সেবা শুশ্রূষা হয়।

পুলকের কাছেই গেল অমল।

পুলকের গায়ে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী, কাঁধে মাদ্রাজী চাদর। মোটা শেলের ফ্রেম, পুরু কাচের চশমা। মাথার ওপর ঘুরছে ফ্যান, কাচ ঢাকা টেবিলে টেলিফোন। অস্বাভাবিক সাদাটে নীল আলোয় ঘরটা উদ্ভাসিত।

অমলের দাদার অসুখ, টাকাটার দরকার।

'অ!'

শব্দটি উচ্চারণ ক'রে পুলক কিছুক্ষণ কাগজে কি লিখল, বেয়ারাকে ডেকে কাগজটি নিয়ে যেতে বলল। টেলিফোনটা তুলে কার সঙ্গে যেন বিকেলে কোথাও দেখা করবার সময় ঠিক করল। বোঝা গেল খুবই গোপন ব্যাপার এবং পরিণামে কিছু মধুর প্রতিশ্রুতি আছে। ফোন যতক্ষণ ধরে রইল ততক্ষণ তার মুখে কান এঁটো করা হাসি লেগে রইল। একতরফা পুলকের কথাগুলোই শোনা যাচ্ছিল, প্রত্যেকটি কথা চিনির রসে ডোবানো 'হ্যাঁ হ্যাঁ' নিশ্চয়···কে বললে?···আসুন না, একবারটি সুযোগ দিন অভাগাকে···!' ফোনটি নামিয়ে রেখেই মুখের ভাব ও ভাষা বদলে ফেলে বললে 'হুঁ' চলল কোথায় দালালী করতে!'

তারপর অমলকে মুখ খোলবার সুযোগ না দিয়েই কথা কইতে সুরু করল।

'ও, তোমার দাদার অসুখ হয়েছে?' এই গোছের কতকগুলো আন্তরিকতাহীন ভদ্রতার কথা বলল। তারপর হঠাৎ উপদেশ দিতে লাগল, মনে হ'ল পুলক একটি সুউচ্চ জায়গায় বসে আছে, পায়ের কাছে অমল।

'টাকার কথা বলছ? আমার মনে হয় ভাই, তোমার বাবার সাংসারিক বুদ্ধি-সুদ্ধি খুব কম।'

কথাবার্তা শুনে অমল প্রায় বাক্‌রহিত হ'য়ে ব'সে রইল।

'বুদ্ধি থাকলে জমিটমি বেচে দিতেন। শুনেছি ওঁর ভয়ানক আপত্তি। আমি ভেবে পাইনা যখন জমির দাম কম ছিল তখন আগ বাড়িয়ে বেচতে গিয়েছিলেন জমি, যখন দাম বেড়েছে তখন কেন এত আপত্তি। বাবার আপত্তি থাকে তুমি বেচে দাও। আরে বাবা, নিজে ছাড়া সকলেই পর এ ছুনিয়াতে। কাঁধে লটবহর নিয়ে কি রাস্তায় আরাম ক'রে চলা যায় রে ভাই? আমি তোমায় ওল্‌ড ফাদারকে অমান্য করতে বলছিনা। কিন্তু তাঁর কথাবার্তাকে একটা প্রয়োজনের সময়ে এত মূল্য দেবার কি আছে? যদি বল, আমার হাতে পার্টি আছে।'

সেই পুলক।

যে তার কৃপাপ্রার্থী হয়ে বসে থাকত। যাকে সাহায্য করবার জন্যে সেই একশো কুড়ি টাকা চাইতে অমল জোজোর কাছে গিয়েছিল সেই পুলক! বদলে গেছে একেবারে বদলে গেছে। এক সময়ে মিনমিন ক'রে কথা কইত, অমলের মতামত শুনত দু'কান পেতে টাকা, সচ্ছলতা, প্রতিপত্তি জানবার সঙ্গে সঙ্গে স্ফীত হতে সুরু করেছে। তাই এত ঔদ্ধত্য, অবিনয়, অসভ্যতা। হয়ত একদিনে পালটায়নি। এইরকম পরিণতির একটি সম্ভাবনা হয়ত ওর মধ্যে সেদিনও লুকিয়েছিল, অমল বুঝতে পারেনি।

অমল টেবিলের কাচে এবং চকচকে মেঝেতে নিজের ছায়া দেখতে পাচ্ছে। মুখটা দাড়িগোঁফে ঢেকে গেছে, যেন অশৌচের চেহারা। কিন্তু 'অশৌচ' কথাটা মনে এল কেন? বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে কি অশৌচ হতে পারে? এতে বাবার কোন অমঙ্গল হবে না ত? এখনো বেঁচে আছেন, এখনো আশা আছে, হঠাৎ বাবার প্রতি গভীর মমতা যেন ঘন ও ঠাণ্ডা কোন তরল পদার্থের মত গড়িয়ে গড়িয়ে অমলের মনটি ঢেকে ফেলল।

'কি বলছ ?' অমল চড়া গলায় জিগ্যেস করল।

এখন দেখা যাচ্ছে ও পাশেও কাচ ঢাকা টেবিল। দু'জন ভদ্রলোক মাথা নিচু করে কাজ করছেন। একজন রীতিমত ছোকরা। ওদের মুখে কি চাপা কৌতুকের হাসি ? ওরা নিশ্চয় ধরে নিয়েছে অমল প্রার্থী হয়ে এসেছে, ভিখিরীর মত।

'কি বলছ ভাল ক'রে বল।' অমল ধমক দিল।

'জমি বেচে দিতে বলছিলাম, আমার চেনাজানা ভাল পার্টি আছে……'

পুলক অবাক হয়ে তাকাল। অমল, যে কোন পরিস্থিতিতেই যে ভদ্রতা ভোলেনা, অভদ্র হতে জানেনা, তার গলায় এ কি নতুন সুর ?

'জমি বেচে দিতে বলছিলে ? জমি বেচবার তুমি জান কি ?

জন্মে জমি জমা বিক্রী করেছ ?'

পুলকের চোখ থেকে চশমা পড়ে যাবার জোগাড়।

'আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। জমি বেচা বা কেনাটা কিছু একঘণ্টার ব্যাপার নয়. জমি বেচে টাকা নিয়ে মুমূর্ষু রুগী বাঁচানো যায় না। যাক্, সে কথা-ও নয়। আমার জমি আমি বেচব কি না সে উপদেশ তোমার কাছে কে চেয়েছে ? আমার বাবার সাংসারিক জ্ঞান আছে কি নেই সে কথা তুমি বলবার কে হে ?

'তুমি যে বললে টাকা…'

এই প্রথম ভালমত রেগেছে অমল। এত রাগ করলে নিজেকে থামানো কত কঠিন তা টের পাচ্ছে।

'তুমি হক-না-হক যে টাকা ধার নিয়েছ তাই ফেরৎ চেয়েছি। ভিক্ষে চাইনি, ধার চাইনি। সেই অলকা যখন ভয় দেখিয়েছিল একশোকুড়ি টাকা নিয়েছিলে সেট চাচ্ছি। দাও।'

'অমল, কি করছ ?'

'বেশ করছি, যে শুনবে শুনুক। আমার বাবা মারা যাচ্ছেন, ধার

নিয়েছ আজিকালে নিজে থেকে শোধ দেবার নামটি নেই, চাইলে পরে বড়বড় কথা শোনাচ্ছ। তোমার উপদেশ কে শোনে হে?'

সন্ত্রস্ত পুলক কাঁদো কাঁদো হ'য়ে ছুটে গেল বাইরে। মিনিট দশেক বাদেই ছুটতে ছুটতে এল, অমলের পকেটে গুঁজে দিল। বলল, গোণা আছে গোণা আছে, বললেই ত হত মেসোমশায়ের অসুখ...'

টাকাটা পকেটে রাখতে রাখতে অমল বলল 'আর কখন কি নিয়েছ হিসেব ক'রে ফেরৎ দিতে চেষ্টা ক'র। এখন তোমার ক্ষমতা হয়েছে, দিতে পার যখন...... ।'

'নিশ্চয়।'

'অপ্রীতিকর কথাগুলো বলতে হয়েছে ব'লে মনে কর না কিছু কথাগুলো ভাই তুমিই আমাকে বাধ্য করলে বলতে।'

পুলক চুপ।

রাগ নেমে যাচ্ছে, অবসন্ন লাগছে শরীর। ঘিনঘিন করছে গা। যেন সকলের সামনে অমল একটা অসভ্যতা করছে।

'চলি।'

'হ্যা, হ্যা।' পুলক অমলকে এগিয়ে দিতে সঙ্গে সঙ্গে এল, অমল বুঝতে পারছিল ছুপাশের কাঠের পার্টিশন দেওয়া ঘর থেকে তার দিকে কেউ কেউ তাকাচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছিল পুলকের কপাল থেকে দরদর করে ঘাম পড়ছে। চোখের চাউনি নোংরা ও ঘোলাটে। সুযোগ থাকলে এখনই অমলকে গলা টিপে ধরত।

পরে, চৌরংগীর দোকানে ওষুধ কিনতে কিনতে পুলকের মুখ মনে পড়ে অমলের অবসন্ন বোধ হ'ল। লোকটা তাকে বারবার নিচে নামাচ্ছে। আজই একটা বিশ্রী ঘটনা হয়ে গেল। সঙ্গদোষ হয়ত একেই বলে। সকলের সামনে দাঁড়িয়ে পাওনাটাকার কথা বলেছে এ-ও এক ধরণের নিচে নামা বই কি!

বাড়ী ফিরতে বেলা গড়িয়ে গেল।

বাবার কাছে গিয়ে বসল অমল। ওষুধ গুলো সামনের টুলে রাখল। বলল 'বেদানা এনেছি, বেদানা খাবে বাবা?'

বাবা সম্মতি জানালেন এবং বেদনা খেতে লাগলেন। তাঁর বিছানার পাশে বসে বাবার মুখে বেদানা দিতে দিতে অমলের মনে কষ্ট হ'তে লাগল। গভীর মমতা। যে লোক জল নিজে গড়িয়ে নিতেন, জুতো বুরুশ করতেন নিজে, সার্ট ধুয়ে নিয়ে দোকানে ইস্ত্রী করাতে যেতেন, ছেলেকে কখনো বলেননি, সেই লোকই কি অসহায় ভাবে পরনির্ভরশীল হ'য়ে পড়ে আছেন, জলটি অবধি খাইয়ে দিতে হয়।

'আজ একটু ভাল লাগছে বাবা?'

বাবা চুপ করে রইলেন। একটু বাদে বললেন 'খোকা'।

খোকা! অমল চমকে উঠল। হাত থেকে বেদানার প্লেট পড়ে যায় আর কি। খোকা ব'লে ত' তাকে ডাকেন না বাবা। ছোট বেলায় বোধ হয় খোকা বলতেন। তুটো পুরনো চিঠি দেখেছিল তাঁর, কি কাজে যেন কোডারমা গিয়েছিলেন। তখন অমল তু'তিন বছরের হবে। সেই প্রথম এবং শেষ স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে দূরদেশে যাওয়া। তখনকার লেখা তু'খানা পোষ্টকার্ডেই 'খোকার জ্বর কেমন আছে, খোকাকে একলা রেখে নাইতে যেওনা,' উদ্বেগ জানিয়েছিলেন দূর থেকে।

'খোকা, এত খরচ করে তুই ফলটল আনিস না।'

অমলের দিকে না চেয়েই আস্তে আস্তে বললেন 'মুখে ত' রুচি নেই আমার, অল্প অল্প খাই, এত বেদানা আপেলের দরকার কি? একে ত কত খরচ করে 'ওষুধ বিষুধ......।' শ্রান্ত হ'য়ে চুপ করলেন।

শুনে যতীন কুণ্ডু বললেন 'ভাল না, এসব কথা ভাল না। দাদা যেন ভেতর থেকে জোর পাচ্ছেন না। হ্যাঁ নিতু, আমার মনে হয়। যেন ইচ্ছে চলে যাচ্ছে। রুগীর বাঁচবার ইচ্ছেটাও দরকার বইকি।'

সেদিন অমল ভয় পেয়ে গেল। সন্ধেয় যখন সরিৎ এসে বাবার কাছে বসল, সে উঠোনে গিয়ে চুপ ক'রে বসে রইল। রান্নাঘরে উনোনের আভা ও কুপীর আলোয় মা'র লালচে, শীর্ণ মুখ দেখা যাচ্ছে।

আশ্চর্য মনের জোর। যা যা দরকার মুখবুজে ক'রে যাচ্ছেন, বার্লি জ্বাল দিচ্ছেন, ইঞ্জেকশানের সূঁচ ও সিরিঞ্জ ফোটাচ্ছেন। ঐ এক বাতিক সুধীরডাক্তারের, সব কিছু দু'বেলা জলে সেদ্ধ ক'রে নেওয়া চাই। একটু এদিক ওদিক হ'লে বলবেন 'ওই জন্যে আমি হাঁসপাতালে দিতে চাই, বাড়ীতে রোগীর শুশ্রূষা হয় না।

মার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হ'ল মা ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করছেন ত? ছি ছি, সেটা ত' দেখা হয়নি। উদ্বিগ্ন হ'য়ে 'মা!' ব'লে ডেকে রান্নাঘরের ঝনকাঠ ধরে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জা পেল।

মা চোখ তুলে তাকিয়েছেন, কি বলবে অমল? এদিকে ওদিকে চেয়ে দেখল মা আলুপটল কেটে রাখছেন, আটা ঢেলেছেন থালায়। বলল 'এত রান্না কর কেন? এ বেলা আর নতুন করে রেঁধনা কিছু, ও বেলায় যা হয় রেখে দিও না হয়।'

'আজ মঙ্গলবার' মা অস্ফুটে বললেন। তখন অমলের মনে পড়ল মঙ্গলবার দিনের বেলা ফলমিষ্টি খান মা, রাতে রুটি তরকারি। বাবা বেলার দিকে গিয়ে দুটি মিষ্টি কিনে আনতেন।

'সব আনিয়ে নিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, সরিৎ এনে দিলে।'

'আমায় বলনি কেন?' বলতে বলতেই মনে প'ড়ল সে আজ সকাল দশটায় বেরিয়ে গিয়েছিল, তখন বাড়ীতে সরিৎ ছিল।

সবই হ'ল কিন্তু বাবা বাঁচলেন না।

শেষ সময় যত কাছে এল ছেলেকে ডেকে অনেক আশীর্বাদ করলেন। বললেন 'তোর জন্যে কিছু রেখে যেতে পারলামনা নিতু, বাড়ীটা সারিয়ে নেব ভেবেছিলাম, ভগবান হ'তে দিলেন না। তোকে বলা রইল বাবা, বাগানটা বেচে দিস, দরকার হলে কারবারে টাকা লাগাস। নিজের টাকা খাটালে একটা জোর থাকে।'

অমল কিছু বলল না। এ সময়ে বলবার কি মানে হয় যে টাকা

দরকার আর হবে না অমলের। যে ক'দিন আছেন শান্তিতে থাকুন। 'তোর মা......'

'মা-কে ডাকব বাবা?'

'কিছুই করতে পারলাম না।' হতাশ হয়ে চুপ করলেন।

বাবা মারা গেলেন সকাল দশটায়। চারিদিকে আশ্বিনের রোদে মাখামাখি। কসবায় খবর দেওয়া হ'ল। তার আগেই অবশ্য নতুন পাড়ার লোকজন উঠোনে ভেঙে পড়ল। এ বাড়ীতে কান্নাকাটির রোল ওঠেনি তাতে কি, তবু সবাই জানতে পারল। মৃত্যু সংবাদ নিজে থেকেই দশখানা হয়ে ছড়িয়ে পড়বার ক্ষমতা রাখে দেখা গেল।

অনেক লোক এল, তারাই খাট আনল, ফুল আনল। যে যা বলে অমল যন্ত্রের মত তামিল ক'রে যাচ্ছে। মানুষের আন্তরিকতা দেখে তার আশ্চর্য লাগছে, মনটা যেন অসাড়। আলাপ পরিচয় নেই তবু সবাই এসেছে। তবে কেন তার মনে হত, খালি খালি মনে হত, মানুষের মধ্যে আর কোন দয়ামায়া বেঁচে নেই? সব শুকিয়ে গেছে?

'হ্যাঁ হ্যাঁ নাকতলায় যাও না ঝপ করে যাবে নিয়ে চলে আসবে, বলাই-এর গলা।

'এই নাও খাটের টাকা' সরিতের দাদা তড়িৎ বলছে। বলাইএর গলাটি ভারী ও রাশভারী, সবার ওপরে শোনা যায় 'এ তল্লাটে ফুলের দোকান কোথায় পাচ্ছ বাবা? সরিৎদের বাড়ী যাও।' সরিৎ কোথাথেকে সাইকেল ক'রে ফুল নিয়ে এল।

কে একজন বৃদ্ধলোক, মাথাটি নড়ছে, কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন 'বাড়ীতে তুলসী।বরিক্ষ নাই?'

'আছে। অমলের গলা বেশ স্বাভাবিক।

'আইনা চক্ষুপল্লব ঢাইকা দাও' তিনি অন্য কা'কে বললেন। আরো কিছু কিছু নির্দেশ দিলেন। অমলের হাত ধরে বললেন 'ছেলে'?

অমল সম্মতি জানাল। গলাটা ধরে আসছে, চোখ বুজে নিজেকে সামলে নিল।

'কাইন্দ, পরে শোক করবা। এখন সামনে কর্তব্য।' এটুকু কথা বলতেই যেন হাঁপিয়ে পড়লেন। আস্তে আস্তে মাথানেড়ে বললেন 'কর্তব্য একদিনের, কাইন্দবার সময় জনম ভইরা রইল। যে সম্পদ হারাইলা আজ ......' গলাটি ক্ষীণ হ'য়ে মিলিয়ে গেল। তড়িৎ তার মা-কে নিয়ে এসেছে। তড়িতের মা, যতীন কুণ্ডুর স্ত্রী এবং আরো কে কে মহিলারা মা-কে ভেতরে নিয়ে গেলেন। সরিৎ অমলের কাঁধে হাত রাখল, 'নিতু!'

ভেতরে নিয়ে গেল, হাত থেকে ঘড়ি খুলে নিল, অমল আড়ষ্ট পুতুলের মত হাত বাড়িয়ে দিল। কাঁধে গামছা দিল। বলল 'চল্ এরপর সময় খারাপ পড়ে যাচ্ছে।'

সরিতের গলাটা ভাঙা ভাঙা, বেরিয়ে এসে ঘড়িটা তড়িতের হাতে দিল। তড়িৎ কি বলল। সরিৎ ভ্রূকুটি করে বলল 'তুমি থাক। সবাই মিলে গিয়ে কি লাভ আছে?'

হাজামজা গঙ্গা, কিন্তু আশ্বিন মাসে এখনো যেন জল আছে।

শ্মশান থেকে আসতে সন্ধে পেরিয়ে গেল। বাড়ী ঢুকতেই মা চোখ তুলে চাইলেন। দরজার চৌকাঠে হাত রেখে বসে ছিলেন, সাদা কাপড় পরণে মাথার চুল দিয়ে জল পড়ছে, বোধ হয় জানতে চাইলেন সব ঠিকমত হয়েছে কি না। অমলের দিকে চেয়ে তিনি নির্বাক হ'য়ে রইলেন। অমল দেখতে পেল তাঁর দু'চোখে ভয়ঙ্কর এবং দুঃসহ শোক। সর্বগ্রাসী শূন্যতায় যেন তাঁর অন্তর দাউদাউ ক'রে জ্বলছে। তাঁর পরণে থান দেখে অমলের বুকে যেন ধাক্কা লাগল ভারী কোন লোহার জিনিষের। সরিৎ হো হো ক'রে কেঁদে উঠল। মা'র কাছে অবসন্ন হ'য়ে বসে পড়তে পড়তে অমল তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে ঘরের কোণে পাটের ফেঁসো, নীলের কৌটো, চূণকাম করবার পোঁচড়া ইত্যাদি দেখতে পেল। যেন এতক্ষণে সম্যক বোঝা গেল বাবা নেই।

॥ চৌদ্দ ॥

আজ, শেষ দিন, একলা বসে বসে সব কথা মনে পড়ছে। একটি কথাও ভোলেনি সে, কোন তুচ্ছ, কোন ছোট্ট ঘটনাই ভোলে নি।

আসলে কিছুই হারিয়ে যায় না। যতদিন যাকনা কেন, কোথায় যেন জমা হয়ে থাকে। মনে করতে করতে যেন মরে যাওয়া লোকদের আবার কাছে পাওয়া যায়; পুরনো স্মৃতির সম্পদকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে যায়।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পর একটা গাঢ় ও সর্বব্যাপী বৈরাগ্য তার মনকে অধিকার করে। বাবার মৃত্যুতে যেন জন্মান্তর ঘটে গেল, আগেকার সব কিছুই অলীক মনে হয়। যেন বাবা কোনদিনই ছিলেন না, এইরকমই ছিল সে আর মা। দু'জনে দিনান্তে যেন কোন দিনই দুটির বেশী কথা বলেনি। মা যেন অমনি ছায়ার মত নিঃশব্দে নীরবে নিজের কাজ ক'রে যেতেন আর অমল এই নিচ্ছিদ্র প্রগাঢ় প্রশান্তিতে ডুবে থাকত। দেখত দিনগুলো ভেসে চলে যাচ্ছে অবহেলে, নীল আকাশের বুকে সাঁতার কাটা সাদামেঘের মত। যেন নিজের অবস্থা ভুলে অমল কোন দিনই বড়লোক হ'তে চায়নি, ছুটে যায়নি জোজোর কাছে। সেই যশোর রোডের বাড়ী সত্যি নয়, পুলক, জোজো এমন কি যুথীও সত্যি নয়, যদিও এক সময়ে তার প্রতি করুণা অনুভব করত অমল। না যুথীও সত্যি নয়। সত্যি শুধু এই বাড়ীর জীর্ণ, ঠাণ্ডা, দেওয়াল, সন্ধেবেলা সরিতের সঙ্গে উঠোনে মোড়া পেতে বসা, তুলসী গাছের গন্ধভারী বাতাসে নিশ্বাসে নেওয়া। যদিও অমল যুক্তি দিয়ে বোঝে এ অবস্থাটা বেশীদিন চলতে পারে না। তবু এর পরে কি হবে তা যেন ভাবতে ইচ্ছে করে না।

এই সময়ে গঙ্গার ধারের স্নানঘাটে প্রতিবছর হরিসভায় কীর্তন হয়।

আগে আগে ত, খুবই হ'ত' মাঝখানে যেন ভাঁটা পড়েছিল, তারপর এদিকে জনবসতি ঘন হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন হরিসভাটির পুনরুজ্জীবন হয়েছে।

কীর্ত্তনের দলকে বাবা কিছু কিছু দিতেন, অমলও দিল। একদিন গিয়ে ব'সে ভাল লাগল। মাঝে মাঝেই যেতে লাগল। মনকে বোঝাল শ্রাদ্ধের পর একটা মাস যাক। এবার নতুন ক'রে কাজকর্মের কথা ভাবতে হবে।

আশ্চর্য, বাবা মারা গেলে তার মন থেকেও বড় বড় কাজ করবার সব আশাই চলে গেল। মনের অতলে, বুদ্ধির অগম্যে বাবার সঙ্গে কি কোন প্রতিযোগিতার ভাব ছিল তার! তিনি ছিলেন তাই কি সে আস্ফালন করত হ্যানো করব ত্যানো করব? তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়বার, ছুটবার, ভাগ্যকে করায়ত্ত করবার সব ইচ্ছে চলে গেল মন থেকে?

এমনি সময়ে একদিন, সন্ধ্যের পর বাড়ী ফিরে অমল মৃদু একটি এসেন্সের গন্ধ পেল, বাতাসে ভেসে স্থির হ'য়ে আছে। মা-র সঙ্গে কে কথা বলছে।

হঠাৎ মনে হল জোজো আসেনি ত। মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠল। যদি এসে থাকে, তবে কি মা'র সঙ্গে জোজো কথা বলছে। জানিয়ে দিচ্ছে অমলকে মা যত সৎ ভাবেন, তা সত্যি নয়? ছেলেকে মা চেনেন না, এই কথাই কি বলতে এসেছে জোজো।

না নীতা এসেছে। সরিতের সঙ্গে। ভাল শাড়ী পরেছে, খোঁপায় ফুলের মালা। অভ্যেসমত কথা বলতে বলতে খোঁপায় হাত দিয়ে দেখে নিল। কপালটা বেশী চওড়া বলেই বোধ হয় টিপ পরেছে একটা। খুব খুশী খুশী চেহারা। নীতা মা-র হাত থেকে মশলা নিচ্ছে।

'মাসীমা এই যে আপনার সন্নেসী ছেলে এসেছেন। বাব্বা আমরা ত' ভাবলাম আপনি হরিসভাতেই রয়ে গেলেন।'

হাসিটা একটু প্রগল্‌ভ। ছ'দিন বাদে সরিতের বউ হ'বে, আজ যেন এতটুকু প্রগল্‌ভতা দেখাতে বাধা নেই। মা-র কাছে নিয়ে এসেছে সরিৎ তারমধ্যেও ওই কথাটুকু প্রচ্ছন্ন আছে। বোধ হয় বিয়ের দিন এগিয়ে এসেছে।

নীতা বলল 'একদিন যাবেন মাসীমাকে নিয়ে, বেশ প্রদর্শনী হচ্ছে।' আবার হাসল। বাঁদিকের দাঁতটি একটু উঁচু, রঙ যেমন ফর্সা স্বাস্থ্য তেমন পরিপুষ্ট নয়, চোখের দৃষ্টি সব সময়েই যেন ছায়া ঢাকা। চোখের নিচে কালি, ঘন চুল ফাঁপিয়ে একটা মস্ত খোঁপা বেঁধেছে, টোপরের মত উঁচু হ'য়ে আছে। চোখে মুখে বাসি গন্ধরাজ ফুলের মত বাসি লাবণ্য, নীতাকে দেখে অমলের ভাল লাগল।

'অনেকদিন আসনি।' অমল স্মিত হাসল।

'ক'দিন ধরে বলছি নিয়ে আসতে তা বেরুতে চায়না আমাকে নিয়ে। একবারটি আসব, তা আজকাল ক'রে দেরী হ'ল কত।'

গলার স্বরটি একটু চাপা এবং খসখসে। মনে হয় গলাটা কেশে সাফ ক'রে নিলে পরিষ্কার শোনাবে। মা-র দিকে চেয়ে বলল 'আজকাল আর একা একা বেরুই না ত! তাই আসতে পারি না। চলি মাসীমা!'

'এস মা!' মা সরিতের দিকে চেয়ে বললেন 'এখন না বেরুনই ভাল।'

নীতা প্রণাম করল। নীতার মাথায় হাত ছোঁয়ালেন মাত্র। সরিৎ বলল 'চল্‌ নিতু, ওকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'চল্‌!'

ছ'জনে গেল, নীতাকে পৌঁছে দিল বাড়ীতে। হাসি লণ্ঠন হাতে বোনকে দোর খুলে দিতে এল। মুচকি হেসে সরিৎকে বলল 'বেশ ছেলে, ব'লে গেলে এই যাচ্ছি আর আসছি প্রসাদ নিয়ে বসে আছি আমি, এস ভেতরে এস।'

অমলকে দেখে যেন লজ্জা পেল। গলা নামিয়ে বলল 'উনি কে?'

'অমল। অমলের নাম শোননি?'

নাম শুনেছে কি, চোখেও ত দেখেছে, কিন্তু এখন বোধ হয় সে কথা মনে নেই ওর।

'অনেক শুনেছি। ওঁকে ভেতরে ডাক। আসুন আপনি,' হাসি মিষ্টি হাসল। অমল আশ্চর্য হয়ে তার রূপ দেখছিল। দেখবার মত রূপই বটে। বয়স, স্বাস্থ্য, লাবণ্য' একমাথা চুল, চোখের চাহনি দেখলে বোঝা যায় না এই মেয়ে মুহূর্তে কি রকম বদলে যেতে পারে, ভয়ংকর হ'য়ে উঠতে পারে আনন্দে, আক্রোশে, প্রতিহিংসায়।

সরিৎ উঠোনে এসে দাঁড়াল। বলল 'যা আনবে লক্ষ্মী মেয়ের মত নিয়ে এস ত' বড়দি, আমরা এখানে দাঁড়াচ্ছি।'

অমল লক্ষ্য করল সবাই তাদের বিশেষ ক'রে খাতির করছে। পটল নেমে এল শশব্যস্ত হ'য়ে, মোড়া আন, চা আন, বেশ সাড়া প'ড়ে গেল। পটলের চেহারাটি বেশ বদলিয়েছে। বড়দা এখন 'পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট্' সরিৎ বলল 'চাকরী করছে, তা ছাড়া টালিগঞ্জে দোকান করেছে একটা।'

'আপনার মা একটু সামলেছেন?' পটলের কথায় অমল একটু আশ্চর্য হ'ল। সরিৎ বলল 'বড়দা ত' গেছলেন, তুই লক্ষ্য করিসনি।'

অমল আবার আশ্চর্য হ'ল। সে কি দিনান্তে এদের কথা একবারও ভাবে? অথচ এরা তার কত খবরই না রাখে। এখন জানাগেল বাবা মাঝে মাঝে বাজার যাবার পথে একবার, আসবার সময়ে একবার, মোড়ে 'কালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এর সামনে বেঞ্চে বসে বিশ্রাম করতেন। তখন পটল, বলাই, এবং অন্যান্য চেনাপরিচিত সকলের সঙ্গে আলাপ করতেন।

'আপনার প্রেস কেমন চলছে?'

'এই একরকম।'

'বেরুচ্ছেন?'

'না।'

হাসি প্রসাদ নিয়ে এল।'

ফিরবার পথে অনেকদিন পর অমল যেন নিশ্চিন্ত একটা আরাম অনুভব করল। পুকুর পাড়ে বসল তারা, হিজল গাছের ছায়ায়। এ ঘাট অন্ধকার। রাস্তার দিকের ঘাটে নিঃশব্দে স্নান সেরে যাচ্ছে কাঠগোলা, কয়লার দোকানের হিন্দুস্থানীরা। জলে সাইকেল নামিয়ে ধুয়ে নিচ্ছে।

অমল বলল 'এবার বিয়েটা সেরে ফেল্ তোরা। আর দেরী করা ভাল দেখায় না।'

শরতকালের প্রথম প্রহরের রাত। বাতাসে হিম জমে ভিজে ভারী বাতাস, জলের গন্ধ পাওয়া যায়, একটু আঁশটে আঁশটে।

'হাসি ত ভালই আছে।'

'হ্যাঁ। চিকিৎসায় উপকার হয়েছে।'

'তোরা বিয়ে কর।'

'এবার করছি ত। অঘ্রাণে বিয়ে।' সরিৎ হাসিভরা চোখে চাইল 'বাড়ীর সবাই এখন খুব খুশী জানিস ত?'

'মাসীমা?'

'সবাই। মা ও দাদা দিনক্ষণ ঠিক করলেন।'

অমলের মন এখন মহৎ ভাবনায় স্ফীত। নতুন ক'রে জীবন সুরু করব, নতুন কাজ করব, আজ নীতার মাথায় হাত রাখবার সময়ে মা-কে বড় ক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল। ওঁকে একটু আরাম দিতে হবে। ছেলে হয়ে ত' কোন কর্তব্যই করা গেল না। সরিৎ বিয়ে করছে তাতে তারও যেন একটা নতুন দায়িত্ব বাড়ল।

পরের সুখে সুখী হতে ইচ্ছে করা না কি ভাল। কিন্তু সরিৎ ত' পর নয় হঠাৎ মনে হল সরিৎ নেই, সে আছে এমনটি যেন হতে পারে না।

'বিয়ে কর সরিৎ, নীতাকে আমি একটা গয়না দেব।'

'কোত্থেকে দিবি? হ্যাঁঃ, গয়না দেবে!'

'কেন, ইচ্ছে করলে তোর বউকে গয়না একটা দিতে পারিনা আমি ?'

'তা পারবে না কেন, হাজার হলেও তুমি ভাসুর হবে। তিন মাসের বড় যখন, ভাসুরই ত ?'

ভাসুর !

কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে অমলের মন নতুন উৎসাহে দীপ্ত হ'ল। সে ভাসুর ! সংসারে কোন গোলমাল হলে, বুদ্ধি পরামর্শের দরকার হলে নীতা ঘোমটা মাথায় তার কাছেও ছুটে আসে। সরিৎ আর নীতাকে সে দুঃখকষ্টের আঁচ থেকে বাঁচায়। নতুন একটি পরিচয় তার, সরিৎদের বাড়ীতে সবাই সম্মান করে।

'তোমাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে হবে।'

'তার মানে ?'

'মাসীমার শরীর দেখেছ ? কি চেহারা ছিল কি হ'য়ে গেল। তুমি কাজকর্ম নিয়ে অষ্টপ্রহর বাইরে বাইরে থাকবে ওঁকে কে দেখবে ?'

'বিয়ে করব, খাওয়াব কি ?'

'এ কথার মানে ?'

'তুই জানিস না এখন আমার হাতে কোনকাজ নেই।'

'আমি আঁচ করেছিলুম।'

'এখন সব বলতে ভাল লাগছে না, পরে বলব।'

'একটা কিছু ত' করবি ?'

'হ্যাঁ।'

আজ আর অমল বন্ধুকে ঈর্ষা করলনা। আগে এত ভালবাসা সত্বেও কোথায় একটা ঈর্ষা ছিল। সরিতের জীবনে শৃঙ্খলা আছে, ওর চাকরী আছে, ওকে ভালবাসার মানুষ আছে ! অমলের কিছুই নেই। আবার সে কর্মহীন, অবলম্বন হীন, মা'র দায়িত্ব সামনে তাকাবার কিছু নেই, নিঃসঙ্গ জীবন, তবু যেন মনের নিচে কত শান্তি, কত আশ্বাস।

এই সব কিছুর সঙ্গে আর একটি নতুন অনুভূতি। যূথী। নতুন বেদনা, অপরিচয়ের বিস্ময়। সরিৎকে কি যূথীর কথা বলবে? বুঝবে না, হয়তো বুঝবে। কিন্তু বলে কি লাভ? সব কথা হয়তো সরিৎকেও বলা যায় না। আর, অমল জানে না সে গোপন ও কোমল অনুভূতির নাম। ভালবাসা? মমতা? না অন্য কিছু?

না ভালবাসা নয়। এর নাম যন্ত্রণা। গোপন এক বেদনার উৎস থেকে বিন্দু বিন্দু যন্ত্রণা উৎসারিত হয়ে যেন ভরে চলেছে হৃদয়ের পাত্র। নিশ্বাস ফেলল অমল। তার দিকে চেয়ে আছে সরিৎ। ঠোঁটে একটু হাসি। 'কিছু বললি সরিৎ?'

'তোকে বিয়ে করতে হবে।'

'করব।' হিজল গাছের ছায়া তার শরীরে পড়ছে। ছায়ার সঞ্চরণ লক্ষ্য করতে করতে অমল বলল 'চল্ উঠি।'

হাঁটতে হাঁটতে সরিৎ বলল 'এগুলো আর কিছুই নয়, কর্তব্য, কর্তব্য করতে হয়।'

অমল তা জানে। আসলে মানুষ এইসব কর্তব্যের নাড়ীতে বাঁধা। অতিক্রম করা বড় কঠিন।

বন্ধুর পাশে হাঁটতে হাঁটতে মনে হ'ল কি সুন্দর রাত। যেন বাড়ীতে মা থাকলেন, পাশে সরিৎ থাকল, এতেই সে শান্তি পাবে, নতুন শান্তি চাইবেনা।

যেন নতুন করে চোখে পড়তে লাগল পুকুরের জলে আলোকিত ছায়া ফেলে স্টেটবাসগুলো চলে যাচ্ছে ডিপোর দিকে, সিনেমাহাউসের বাইরের আলো নিভে যাচ্ছে, রাতের যাত্রীদের নেবে বলে হাউসের সামনে বাস এসে দাঁড়াল, সাইকেল রিক্শা জমতে লাগল।

অনেক দেরী হল বাড়ী ফিরতে।

রান্নাঘরে ওকে খেতে দিয়ে মা চৌকাঠের কাছে বসলেন। মুখ নিচু ক'রে সুপুরি কুচোতে বসলেন। পেতলের কানা তোলা কটকের থালা, ছোট কটকি জাঁতি। ঝুরঝুর করে সুপুরি পড়তে থাকল থালায়।

কানের পাশের সবগুলো চুল পেকে গেছে, সাদা থান, শীর্ণ গড়ন, কালো ও উজ্জ্বল চোখ, মা'র চেহারাটা যেন পালটে গেছে।

'বিয়ের আগে নীতাকে নিয়ে বেরুনো ঠিক নয় সরিতের, ওতে নিন্দে হয়।'

'আজকাল আর ওসব কেউ ভাবে না মা!'

'তুই কি সব বুঝিস? নিন্দে সেকালেও হ'ত, এখনো হয়। মেয়েটাকে বেহায়া বলবে সবাই, ছেলের দোষ দেখবে না।'

কুচো সুপুরি অমলের হাতে দিলেন। কৌটায় তুললেন বাকিটা। তারপর রান্নাঘরের কুপী নিবিয়ে তালা দিলেন শেকলে। দালানে এসে জানালা গুলো আটকাতে আটকাতে বললেন 'বিয়ের আগে বেরুনো নানাকারণে উচিত নয়, হোঁচট লেগে পা কাটতে পারে, অন্য কিছু হ'তে পারে, এগুলো ভাল নয়।'

অমলের সঙ্গে সঙ্গে অমলের ঘরে এলেন।

এখন এ-ঘরে অমল শোয়, মাঝের দরজা খোলা থাকে, দরজার মুখেই মা শোন বড়খাটে। বাবা যা যা করতেন এখন সে কাজগুলো মা ও ছেলে ভাগ ক'রে নিয়েছেন। অমল দেখে নিল দরজায় হুড়কো, তালা সব ঠিকঠিক বন্ধ হয়েছে কি না। মা গেলাসে জল রাখলেন, জানালার নাগাল থেকে কাপড়চোপড় সরালেন। তারপর সরু ও লম্বা ঝাঁটা দিয়ে অমলের বিছানা পরিষ্কার করতে করতে বললেন' 'খাচ্ছিলি, তাই আগে বলিনি। সেই মেয়েটি এসেছিল।'

'কে?'

'সেই যে, একদিন গাড়ী নিয়ে যে এসেছিল।'

ধ্বক করে বুকের ভিতরে কি লাফিয়ে উঠল। ভয়।

'খুব হন্তদন্ত হয়ে এল, তুই নেই শুনে একমিনিটও বসলে না। বললে কাল সকালে আসবে। খুব জরুরী দরকার।'

কি হয়েছে, কি হতে পারে, সম্ভব অসম্ভব সব কারণ মনে মনে

তোলপাড় করতে লাগল অমল। নিশ্চয় গুরুতর কিছু। কি দুশ্চিন্তা, যূথী হয়ত সব জানিয়ে দিয়েছে।

জানিয়ে দিয়েছে!

চিন্তা করার সঙ্গে শরীরের ভেতরে কোথায় পাগলাঘণ্টা বেজে উঠল। ভেতরেও কোলাহল পড়ে গেল, হৃদপিণ্ড, ধমনী, নাড়ী, কেউ যেন কারো বশে নেই, সবাই ছুটোছুটি করছে। যূথী খবর দিয়েছে, কাগজে সব বেরিয়ে গেল, দলেদলে পুলিশ এল, রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেল তাকে।

'দেখলেই মনে হয় ওদের সঙ্গে কাজ করে তোর মনে সুখ নেই। হ্যাঁ রে ওর কাজ তুই ছেড়ে দে না!'

'মা, তুমি কিছু বোঝ না।'

'এই মেয়েটির স্বামী, তারপর সেই পুলক না কি নাম, কালোমত মত ছেলেটা, ওদের আমার কোনদিন ভাল লাগেনি। আমার কথা তোর বাবা শোনেননি, তুই ও শুনবি না।'

ভিজে গামছা দিয়ে পা মুছতে মুছতে বললেন 'তোর বাবা যে নেই আজ। তিনি যদি সক্ষম হতেন তাহ'লে কিআর ওইসব বাজে লোকের সঙ্গে মাখামাখি করতে দেন? একটা কথা বলি নিতু, নতুন কোন জ্বালা যন্ত্রনা বাধাসনে, আমি আর সইতে পারি না।'

পাশের ঘরে গেলেন। মশারী গুঁজলেন, পালঙ্কে পাতা চাটাইয়ের -এর খচমচ শব্দ। বালিশের ওপর পাড়ের ঢাকনি, মাথা পেতে অনেকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করলেন,। শরীরে বোধহয় আরাম আসে না, মৃদুকণ্ঠে উঃ, আঃ রোজই করেন আজও করলেন। শ্রান্ত স্বরে কাতরভাবে ভগবানকে রোজকার মতই দু'তিনবার ডাকলেন। তারপর চুপ ক'রে রইলেন।

পরদিন খুব সকালে যূথী এল।

হাতে একটি পেটমোটা পোর্টফোলিও, চুল উসকো-খুসকো, চোখের নীচে গাঢ় কালি।

চাহনি দেখে মনে হ'ল যে সীমানায় পৌঁছে মানুষ থমকে দাঁড়ায়, যার ওপারে যাওয়াকে বলে উন্মত্ততা, যূথী সেই সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে। একবার অতলস্পর্শী খাদের দিকে তাকাচ্ছে আবার যেন পিছিয়ে আসছে। 'আশ্চর্য, তুমি এখানে বসে, অথচ তোমায় আমি ক'দিন ধরে পথে পথে খুঁজছি। কোথা গেলে বলত সন্ধ্যেবেলা?'

অমল বুঝল এ প্রশ্ন তাকে নয়, অমলপ্রতিমকে, যদিও যূথী হয়ত নিজেই তা জানে না।

নিজেকে কষ্টে সামলাল। লোভ হচ্ছে, ভীষণ লোভ। বলতে ইচ্ছে হচ্ছে আমি অমল। ইচ্ছে হলে আমায় তোমার অমলপ্রতিম করে নাও। তাতে শান্তি পাও, স্বস্তি পাও, আমি অমলপ্রতিম হব। হারিয়ে যাইনি আমি এক সন্ধ্যায়, কলকাতার পথে।

কিন্তু কেমন করে বলবে? এমন কথা বলতে হলে ভেসে যেতে জানতে হয়। নিজেকে ভুলতে জানতে হয়। তা যে জানে না অমল। সে যে ভুলতে পারে না এ বাড়ীর প্রতিটি জীর্ণ ইঁটের প্রতি তার অগাধ মমতা, ভুলতে পারে না শান্ত, ভদ্র, সহিষ্ণু হবার শিক্ষা তার রক্তে। না না, সে অমলপ্রতিম নয়। অমলপ্রতিম হবার ইচ্ছাটা হয়ত বিদেহী, অবাস্তব একটা কল্পনা মাত্র। শুধু ভালবাসার শক্তি বড় কম। অতীতকে অবলুপ্ত করে দেওয়া যায় না। অতীতজীবনটার জন্যে যূথীর যে হাহাকার তারই নাম হয়ত অমলপ্রতিম। অমল কেমন করে সেইসব কিছুর চেয়ে অনেক বড় হবে? সেই ক্ষতির ক্ষত জুড়োবার অমৃত? না না, এ শুধু কল্পনা, বাস্তবে এ হয় না।

কপাল ঘামছে। হাত দিয়ে শরীর দিয়ে যেন কি এক উত্তেজনা নেমে যাচ্ছে। যূথীর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে নিজেকে তৈরী করতে করতে অমালর মনে হল অবাস্তব হলেও কল্পনার শক্তি কম নয়। তাকে অবসন্ন করে দিয়েছে যেন।

'কি ব্যাপার বলুন ত? কি হয়েছে?'

যূথা এদিকে ওদিকে চেয়ে বলল 'তোমার বাবা মারা গেছেন অমল?'

'হ্যাঁ।'

'আমার বাবাও মারা গেছেন। অনেক অনেকদিন আগে। আমায় জানায়নি।'

যূথীর চোখ ঝকঝক করছে। কাচের চোখের মত। শুকনো এবং ঝকঝকে।

'তাই বলি, একডালিয়ার বাড়ী নেই. কে না কে বাড়ী তুলছে, প্রথমটা যেন বুঝতে পারিনি। পানঅলাটা বলল দ্বিজেশরায় মারা গেছেন, শুনে আমার খুব ভাল লাগল, বুঝলে?'

ব্যাগটা খুলতে খুলতে বলল 'তিনি আমার মুখ দেখতেন না ঠিকই, তবু অতটা নিচে নামলে সইতে পারবেন না ভেবেই আমি কিছু করিনি। নইলে কবেই ওকে পিঁপড়ের মত দু'নখে টিপে পিষে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলতে পারতাম।'

'কাকে?'

'জোজোকে।' যূথী তার উজ্জ্বল ও অস্বাভাবিক চোখদুটি অমলের মুখের ওপর রাখাল 'কাগজপত্তর হাঁটকে তাড়াতাড়ি বেছে নাও। তোমার হাতের লেখা অথবা তোমার সই করা যা কিছু পেয়েছি নিয়ে এসেছি। নষ্ট করে ফেল।'

কাগজগুলো দু'হাতে টেনে নিল অমল। বলল 'আপনি কোথায় যাবেন?'

'আমার কাজ আছে।'

'কাজ?'

'হ্যাঁ।' অপ্রকৃতিস্থের মত হাসল যূথী। বলল 'কাগজ গুলো ঠিক আছে?'

যতখানি আশা পেয়েছিল অমল, ঠিক ততটাই নিরাশ হ'ল। বলল 'না। আমার সঙ্গে কথাবার্তা হয় যখন তখন যে কাগজে লেখাপড়া হয়েছিল সেটাই ত' নেই।'

যূথীর মুখটি বিবর্ণ হ'ল। বলল 'কি হবে অমল?'

'আপনি…আপনি কি….'

'জানিনা আমি জানিনা কি করেছি।' যূথী মুখ ঢাকল দু'হাতে।

'কিন্তু ..আমি বুঝতে পারছিনা….'

যূথী হাত নামাল। অনেক চেষ্টায় একটু হাসল। বলল 'তোমার ভাল করতে যেয়ে হয়ত মন্দই করলাম।'

'যদি কোন বিপদ হয়…'

'আর ভাবতে পারব না। এখন সব আমার হাতের বাইরে।' ব্যাগটা নিয়ে উঠতে উঠতে বলল 'আমার অন্যউপায় ছিল না অমল।'

'কিন্তু এ কাজ আপনি কেন করলেন ?'

'কেন ?'

যূথী তার দিকে চাইল 'তোমাকে একডালিয়ায় একটা বাড়ীর খোঁজ করতে বলেছিলাম, মনে পড়ে ?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়ীটা আমাদের ছিল। দ্বিজেশরায় আমার বাবা। বাড়ীটা ও নিয়ে নেয়, বাবা মনোকষ্টে মারা গেলেন…আমাকে দিয়ে ও অনেক অন্যায় কাজ করিয়েছে। আমি আর ওকে ক্ষমা করব না।'

'কিন্তু…হাজার হলেও ও আপনার স্বামী ত ?'

'স্বামী ?'

হেসে উঠেই গম্ভীর হয়ে গেল যূথী 'ঐ লোকটা আমার স্বামী ? ভুলিয়ে এনেছিল….বিয়ের অনুষ্ঠান করেছিল একটা…পরে শুনেছি সব ভুয়ো, মিথ্যে। যে সই করিয়েছিল সে রেজিষ্ট্রার অবধি নয়। ও বিয়ে করেছিল আমার দিদিকে। বাবার খুব একটা সাংসারিক জ্ঞান ছিল না। বিয়ে দেবার সময়ে বিশেষ খুঁটিয়ে খোঁজ নেন নি। অথচ ও সবই জানত। দিদি আর আমি বাড়ী এবং সম্পত্তির মালিক, ঠাকুরদার উইল, বাবার কোন হাত নেই, সব খবরই নিয়েছিল। নিজের সম্পর্কে অনেক কথাই গোপন করেছিল, তা বাবা জানতে পেরেছিলেন পরে। যা হোক দিদিকে খুব ভালবাসতাম। দিদির মৃত্যুর সময়ে

আমায় নিয়ে যায়.... দিদিও আমায় খুব...আমি আর কোনদিন ওর হাত ছেড়ে বেরুতে পারলাম না অমল! সব তুমি জানতে চেওনা....জানলে আমায় ঘেন্না করবে...কিন্তু আমি যাই, দেরী হয়ে যাবে।'

'আমি কি করব?'

'জোজোর কাছে যাও।'

'জোজোর কাছে?'

'দলিলটা বের করে নাও।'

'কেমন করে?'

'যেমন ক'রে পার। টাকা দিয়ে, লোভ দেখিয়ে...ভয় দেখিয়ে... নইলে তুমি বাঁচবে না, তোমাকে ধরবে।' ব্যাগ হাতড়াল। দোমড়ানো মোচড়ানো কয়েকটা দশটাকার নোট বিছানায় ফেলল 'আমার কাছে আর নেই। থাকলে নিশ্চয় তোমায় দিতাম...'

যুথী বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বাদেই সরিতের দরজায় গিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘা দিল অমল 'সরিৎ, সরিৎ, সরিৎ!'

দুপুরবেলা।

অমল শুয়ে আছে। অসম্ভব ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীর, চোখে ঘুম নেই।

টুকরো টুকরো ছবি। খাপছাড়া চিন্তা। যেন দুর্ঘটনার পর তাকে ফেলে রেখেছে কেউ অজানা, অচেনা জায়গায়। চেষ্টা করলেও মনে করা যায়না কেমন করে কি ঘটল। যূথী কি আজই এসেছিল? সবে কি কয়েকঘণ্টা কেটেছে? কেন মনে হচ্ছে অনাদি অনন্ত সময় ইতিমধ্যে বয়ে গেছে?

সরিৎকে সে সব কথা বলেছে। মনে হতেই রোগমুক্তির অবসাদ যেন শরীরকে দুর্বল করে ফেলে। আগে কেন বলেনি? সে জানত

না, কিন্তু সরিৎ ত' কোনদিন তাকে ত্যাগ করেনি, সর্বদাই যে ছিল অমল কি তবে বন্ধুকে বিশ্বাস করে নি ?

সরিৎ বলেছে সব ঠিক ক'রে দেবে। কিছু টাকা আছে তার নীতার কাছে রেখেছে একটি একটি ক'রে, অনেকদিনের সঞ্চয়। বিকেলে সে আসবে। অমলকে নিয়ে যাবে জোজোর কাছে।

'তুই নিজে পুলিশকে জানাবি সব।'

'কি ক'রে ?'

'তোর বিবেককে নিষ্কলুষ রাখতে হবে নিতু। বুঝতে পারছিস কিছুতেই? এমনক'রে পাপকে চাপা দিতে পারিস না তুই, কোন অধিকা নেই তোর।'

'তারপর কি হবে ?'

যেন অমল নতজানু অনুতাপী, আর সরিৎ তার বিবেক, তার শক্তি অমলের সব গ্লানি মুছে দেবে সত্যিকারের পথ দেখিয়ে দিয়ে।

'যতটুকু অপরাধ করেছিস তার শাস্তি নিবি। তোর আর কতটু দোষ আছে, আসল শয়তান সে। তুই অভাবে, অর্থকষ্টে অস্থির হ ছুটে গিয়েছিলি কাজ করতে। সেটা কোন অপরাধ নয়।'

'এতদিন চুপকরে ছিলাম যে !'

'এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করবি।'

'তুই বলছিস এ কথা ?'

'আমি বলছি। মাসীমাকে আমি দেখব, আমি বুক দিয়ে আগলে রাখব। সব যখন চুকেবুকে যাবে তুই অনেক শুদ্ধ, অনেক পরিষ্কা বোধ করবি। এই হয় নিতু, প্রলোভনে পড়ে আমরা নিজেদের বিক্রি করি, কিন্তু একটি মানুষের শুদ্ধ, মুক্ত বিবেক হাজারটা প্রলোভনের চে অনেক অনেক দামী। ভেবে দেখ।'

অমল কথা বলেনি। চুপ ক'রে বসে থেকেছে মুখ ঢেকে।

'তোকে বোঝাতে পারিনি, মা দাদা সবাই ভুল বুঝত আমায় আমার উচ্চাশা নেই, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই আমি। চু

করে থেকেছি। আমি ত' জানি আমার প্রত্যেকটি কাজের পেছনে আছে বিবেকের সমর্থন। আসলে তোকে অবধি বোঝাতে পারিনি আজকের দিনে সাধারণ, সৎ এবং বিবেকী হওয়া সবচেয়ে কঠিন কাজ, সবচেয়ে সাহস দরকার হয় এতে। হাতে হাতে ফল পাওয়া যায় না ত, কি পাচ্ছ সেটা চোখে দেখা যায় না। তবে জেগে ফেলেছি যে এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই। অন্য কাকে আর বোঝাব বল্, তুই অবধি আমায় ফেলে হাওয়া হয়ে গিয়েছিলি। ভেবে দেখ্ আমার কথা সত্যি না মিথ্যে ?'

'ভাবতে পারছিনা আমি, আমি আর সহ্য করতে পারিনা, তুই আমাকে যা বলবি তাই করব, শুধু কথা দে তুই······ ··· ?'

'কথা দিলাম।'

'ঘেন্না করবি না ?'

'ছেলেমানুষী করিস না।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে ?'

'নিশ্চয়, তুই আর আমি কাছে কাছে থাকলে একদিন দেখবি আবার সব ঠিক হয়ে গেছে। জীবনটা যে অনেক বড়। সব কিছুর জায়গা হয় সেখানে, পাপ করবার, প্রায়শ্চিত্ত করবার, নতুন করে সুরু করবার।'

সরিতের কথায় আশ্বস্ত হয়ে ফিরে এসেছিল অমল।

ঘুম ভাঙল সন্ধ্যেয়।

আশ্চর্য, এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে ? কিন্তু সরিৎ কেন এলনা ?

'শুনুন !'

অমল উঠে বসল। নীতা এসেছে। ব্যস্ত চেহারা উদ্বিগ্ন চাহনি।

'কি হয়েছে নীতা ?'

'ও কোথায় গেল ?'

'কে, সরিৎ ?'

'হ্যাঁ। আমার কাছে এল। অনেক টাকা নিল। বলল অমলের খুব বিপদ। আপনি জানেন না কিছু?'

'কখন গিয়েছিল?'

'পাঁচটার সময়। কোথায় গেল বলুন না? সেই থেকে যে আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে, কিছুতে স্থির থাকতে পারছি না, আপনার কাছে ছুটে এলাম।'

'কি হয়েছে নিতু? কি হয়েছে আমায় বল্ দেখি?' মা এসে দাঁড়ালেন। চোখ মুখ যেন ভয়ে থমথম করছে 'সকালে মেয়েটি এসে কি বলল? তুই বা সরিতের কাছে ছুটে গেলি কেন? নীতা কি বলছে?'

'পরে বলব মা, বিশ্বাসকর, সব বলব তোমায়। একটি কথাও লুকোব না।

অমল জামা পরতে লাগল। আশ্চর্য, এই সময় চটিটা গেল কোথায়?

'তোকে আমি যেতে দেবনা নিতু, তুই ছাড়া আমার কেউ নেই, এমন ক'রে যেতে আমি দেব না।'

এই প্রথম এবং শেষ বাইরে নিজেকে আলগা করা। কোনদিন স্নেহে, উদ্বেগে, ভয়ে বা শোকে নিজের ওপর শাসন হারাননি। কিন্তু মা'র এ-হেন কথা শুনে আশ্চর্য হবার সময় নেই আজ। নীতাকে বুঝিয়ে বলবে, আশ্বাস দেবে তারও সময় নেই। আজ আর কোন কিছুর জন্যে সময় মিলবেনা, প্রতিটি মুহূর্ত যে সত্যিই দামী তা অমলকে বোঝাবার জন্যেই কি ভগবান একটা কিছু ঘটাতে চলেছেন?

'মা!'

অমল অনেক চেষ্টায় গলাটা সংযত করল। এদের সামনে দুর্বল হ'লে চলবে না।

'মা, নীতা, আমি সরিতের কাছে যাচ্ছি। আমাদের....আমাদের একসঙ্গে যাবার কথা ছিল...এই ফিরে আসব মা, যাব আর আসব...।'

বেরিয়ে গেল অমল।

দু'নম্বর বাস।

কি ভিড়, কি ভিড়। কলকাতায় মানুষ কত আর বাড়বে? পথে ভিড়, বাসে ভিড়, মানুষের গায়ে ঘামের গন্ধ, কি গরম! কাচ আঁটা জানলা দিয়ে একটু বাতাস আসে না।

পাঁচমাথার স্টপ। একটা ট্যাক্সি, ট্যাক্সি চাই একটা। উদ্ভ্রান্ত অমল লালবাতির শাসন উপেক্ষা ক'রে ট্রাফিকের জঙ্গলে পা রাখল। বাসটা ছেড়ে দিচ্ছিল, কোনমতে পা রেখে উঠে পড়ল।

যশোর রোডের বাড়ী।

প্রথমদিনের মত আজও বাড়ীটা দেখেই মনে হ'ল পোড়ো। আলো দেখা যায় না, শুকনো মাঠ, খোয়াওঠা পথ। নাকভাঙ্গা দেবদূতেরা পাথরের হাত বাড়িয়ে কি চাইছে, ফোয়ারার শুকনো বুকে দাঁড়িয়ে জলপরী পাথরের রাজহাঁসকে আদর করছে। সব কিছু যেন চন্দ্র গ্রহণের লালচে আলোয় ভয়ঙ্কর। দুঃস্বপ্নের মত। এমন কেন মনে হচ্ছে? কোথায় গ্রহণ! কোথায় আলো! কি অর্থহীন ভাবনা।

বাইরের ঘরে কেউ নেই. পেছনের ঘর বন্ধ। প্যাসেজে একটা লালআলো, এক চক্ষু বৃদ্ধের ভয়াল চাহনি যেন। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে অমল দেওয়াল ধ'রে ধ'রে বাইরের ঘরের আলোটা জ্বালল। ঘর খালি। এ ঘর খালি থাকবে সে জানা কথা। সব কিছু লুকোন আছে পেছনের ঘরে। ছবিটা কোথায়? ছবিটা ঠেলল।

অদ্ভুত দৃশ্য। সরিৎ টেবিলের ওপর উপুড় হ'য়ে পড়ে আছে, হাত দুটি পাশে ঝুলছে। আলোর নিচে দাঁড়িয়ে যূথী এবং জোজো। মুখোমুখি। সরিতের ঘাড়ের ওপর, টেবিলের কাচে রক্ত। শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য।

'সরিৎ!' অমলের ঘরফাটানো বিকৃত অসহায় চীৎকারে যূথীর চমক ভাঙল এবং অমলকে ঠেলে সে বেরিয়ে গেল।

তারপর যা যা হয়ে থাকে সবই হতে থাকল।

লোক জমল, পুলিশ এল, মানুষে মানুষে ঘর দোর প্যাসেজ বাইরের বাগান, সব ভরে গেল। ডাক্তারটির চেহারা তারই মধ্যে কেমন করে যেন অমলের মনে আছে। চোখ বুজলেই দেখতে পায়। ছিপছিপে চেহারা, আধাবুড়ো মানুষ। নিচু হয়ে তিনি সরিতের হাতটা ধরলেন, ছেড়ে দিলেন। ঠক ক'রে কাঠের হাতের মত হাতটা পড়ে গেল। বুকে হাত রাখলেন, চোখের পাতা উলটে দিলেন। ঘৃণা, বিস্ময়। সে চোখে আর কিছু ছিল না।

এই ত' ঘটনা।

ভয় জোজোকে বিবশ এবং বুদ্ধিহীন ক'রেছিল। সব সাক্ষ্য প্রমাণ পুড়িয়ে ফেলেছিল সে, যূথীর সঙ্গে বোঝাপড়ায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সরিতের কথা শুনে কেমন ক'রে তার মনে হ'ল যূথীর পেছনে অমল আছে, সরিৎ আছে, নইলে যূথী সাহস পেত না? কেন এমন অসম্ভব কথা মনে হল?

সরিৎ যখন বলে পুলিশে খবর দেব তখনই বা জোজো ভয় পেল কেন? সে যদি জানত তাকে ধরিয়ে দেবার মত অথবা জড়িয়ে ফেলবার মত কোন সাক্ষ্যপ্রমাণই নেই তবু সে এমন ক'রে বুদ্ধি হারাল কেন? মুহূর্তের প্ররোচনা? মুহূর্তের প্ররোচনায় তবে এমনি করে সর্বনাশ হয়? জোজো, যে নিজেকে এত ভালবাসে, যে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে সকলকে গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে চলে যেতে পারে, যূথীকে নিঃস্ব করতে যার একটু বাধেনি, অমল-কে যে শুধু নিজের প্রয়োজনে অমন করে ব্যবহার করেছিল সে কি বোঝেনি এই একমুহূর্তের প্ররোচনায় নিজের কতবড় সর্বনাশ করতে চলেছে?

নিয়তি সবচেয়ে ওপরে এবং সবচেয়ে বড়। মানুষ চোখে দেখতে

ায় না তাই অবিশ্বাস করে, পরিমাপ করতে পারেনা কি অসীম নিয়তির
মতা।

কিন্তু সরিৎকে হঠাৎ খবর কে দিল বিকেলে? কি বলেছিল সে,
র জন্যে সরিৎ একটু অপেক্ষা করেনি, দেরী করেনি, যেমন ছিল তেমনিই
বরিয়ে যায়? কেন সরিৎ অমলের জন্যে অপেক্ষা করেনি?

সব প্রশ্নের জবাব মেলেনি।

॥ পনেরো ॥

পরে দেখা গেল জোজোর প্রতি ভাগ্য কত অনুকূল।

বড় জটিল আইনের পথ। বড় কঠিন তার গতিবিধি বোঝা।

যূথীর এত চেষ্টা কোন কাজেই লাগল না। প্রমাণ করা গেল না জোজোর ছাপাখানায় সত্যি ও সব কাজ হয়েছে। প্রমাণের অভাবে সে ব্যাপারটিকে আর সরিতের খুনের সঙ্গে জড়ানো গেল না।

সরিতকে জোজো বিনাপ্ররোচনায় খুন করেছে তার একমাত্র সাক্ষী যূথী।

কিন্তু কে সাক্ষী দেবে? যূথী তখন উন্মাদ হয়ে গেছে। মানসিক যন্ত্রণায় ভুগে সহ্যের শেষসীমায় চলে গিয়েছিল সে। সুস্থ জীবন, স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে শেষ গ্রন্থিটি ছিঁড়ে যেতে বেশী সময় লাগেনি।

সে কোন সাহায্যই করতে পারেনি। একা অমলের সাক্ষ্য। কিন্তু অমল ত সে সময়ে সামনে ছিল না। কে বলবে জোজো যা বলছে সেটাই সত্যি নয়। সে বলেছে সরিৎ তাকে শাসায়, মারতে যায়, আত্মরক্ষার জন্যে আঘাত না ক'রে উপায় ছিল না তার। কি দিয়ে আঘাত করেছে তা অত লক্ষ্য করেনি জোজো। পেতলের রডের আঘাত অত মারাত্মক হ'তে পারে তা-ও ভাবতে পারেনি জোজো।

অমল যে বারবার বলল 'আমার দোষ সবচেয়ে বেশী, আমায় শাস্তি দিন,' তাতে কোনো সাহায্যই হ'ল না। শেষ দিন সরিৎ যে টাকা নিয়ে গিয়েছিল সেই পাঁচশো পঞ্চাশ টাকার কথাই বারবার শোনা যেতে লাগল। জোজোকে সাহায্য করবার জন্যে বড়বড় উকিল ব্যারিস্টার এলেন, কেস কোর্টে উঠল।

অমল রাজসাক্ষী হয়।

নীতা দাঁড়িয়ে বলেছিল 'অমলবাবু ওকে খুব ভালবাসতেন। ওরা

দুজনে দুজনের জন্যে মরতে পারত। আমি কিছুতে বিশ্বাস করিনা উনি এমন বিপদ হবে শুনে ওকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন।'

অমলের সে কি মর্মদাহ।

হাতে ক'রে খুন না করুক, সবাই ত বুঝতে পারছে অমলই সরিতের মৃত্যু ঘটাল। তবু কেউ তাকে দোষ দিচ্ছে না। নীতা কেমন ক'রে তাকে বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে এল? সরিতের কথা কি সত্যি হ'ল এমন ক'রে? অমল নিজেকে বিক্রী ক'রেছিল, ক্ষমা দিয়ে নীতা, তড়িৎ, সবাই তাকে একটু একটু ক'রে কিনে নিচ্ছে?

তড়িৎও ত কিছুতেই অমলের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলল না? বলল তার ভাই আর ফিরে আসবে না। কিন্তু অমলকে সে কেমন ক'রে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের একজন ব'লে মনে করবে? তা হয় না।

শেষ অবধি জোজোর একবছর জেল হয়। হ'লে বা সশ্রম কারাদণ্ড, মাত্র একবছর।

জোজো না কি বলেছিল 'ফিরে এসে অমলের সঙ্গে আবার দেখা করব।'

সব চুকেবুকে গেল, রায় বেরিয়ে গেল, সরিতের মা অজ্ঞান, অমল নিজের বাড়ীতে, তখন তোতা মিত্তির এল।

বলল যূথী না কি একেবারে পাগল হয়েগেছে। বলল 'একপক্ষে এ ভালই হয়েছে অমলবাবু একেবারে ভুলে গেছে সব, এখন ও মনে করে মাঝখানের এ বছরগুলো সত্যি নয়, সব বোধই হারিয়ে ফেলেছে।'

অমলের অনেক দুঃখের ওপর আরেকটু দুঃখ বাড়ল।

'জোজোর কেসটা আমি আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করেছি।'

অমল নিরুত্তর।

'সহজে বেরিয়ে গেল।'

'আপনি যদি আগে আসতেন তা হ'লে কি সাহায্য করতে পারতেন না? যূথীর দিকে চেয়েও আপনি এটুকু করতে পারতেন।'

'যূথীকে ফেলে তখন আসা চলে না। আর…'

অমলের দিকে চেয়ে সে বলল 'জেনে সুখী হবেন, আপনার কথা, যূথীর অভিযোগ, এগুলোর আপাতত কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া না গেলেও পুলিশ চেষ্টা করছে, খুব চেষ্টা করছে।'

'কিসের ?'

'প্রোব, এন্‌কোয়ারী, তদন্ত। এখানে, বম্বেতে, দিল্লী, মাদ্রাজ, সব জায়গায় পুলিশ খোঁজ চালাচ্ছে। ওরা ঠিক বের ক'রে ফেলবে জোজোর সঙ্গে কারা কারা ছিল, কতজন আছে এ ব্যবসার মধ্যে… দেখবেন বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই জোজোকে আবার ঢুকতে হবে।'

'পুলিশ যদি জানে তবে ছেড়ে দিল কেন ?'

'দেখুন পুলিশের এবং প্রেসের দায়িত্বটা মস্ত বড়। হাতে হাতে নিখুঁত সাক্ষ্য প্রমাণ চাই। সর্বদিকে তৈরী হয়ে তবে তারা কাজে নামে। বিশেষত এতবড় ব্যাপারে, যেখানে অপরাধটা এতবড়। যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রশ্ন জড়িত।' তা ছাড়া বহু লোকের মান সম্মান।'

'তবু…।'

'দেখুন পুলিশ মানে জাস্টিস। পুলিশের পক্ষে ভুল করা সম্ভব নয় ক্যান নট অ্যাফোর্ড টু। একটি বড় অন্যায়ের প্রতিকার করতে গেলে অনেক কিছুর বিরুদ্ধে লড়তে হয়। সেখানে ভুল ধরবার ছিদ্র রেখে কাজ করলে সঙ্গে সঙ্গে আপনারাই গলাটিপে ধরবেন সরকারের। ডেমোক্র্যাটিক গভর্ণমেন্ট মানে সকলের মতামতের দাস। অন্যায় হচ্ছে হুজুক তুলে দিলেই নড়তে থাকে মোশন। বন্ধ হয়ে যায় কাজ।'

অমলের দিকে না চেয়ে সযত্নে কাগজে তামাক মুড়ে ধরাল তোতামিত্তির। অতি সুদর্শন প্রৌঢ়. একটু পাতলা চুল, আজ যেন ওকে অন্যরকম মনে হল। ওর কথাবার্তার মধ্যে অসীম, অশেষ দায়িত্ব বোধ। গলার স্বরে বনেদীয়ানা।

'অনেক অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয় পুলিশকে। বিশেষত

যেখানে বড় বড় লোক জড়িত। মজা কি জানেন, সব জিনিষের মত এখানে, নাগরিক অধিকারেরও চূড়ান্ত অপব্যবহার। ছিদ্র বের করে কাজ বন্ধ করে দিলে কি যে ক্ষতি হয়······বুঝবে কে?···শিক্ষার অভাব। দায়িত্ববান মানুষ হবার শিক্ষাটা ত' কলেজে হয় না!'

'কিন্তু·· লাভ হবে কিছু?'

'হবে। নিশ্চয় হবে। আমরা কোন সময়ে চুপ করে থাকি না। লোকের অজান্তে কাজ করে চলি। সব সময়ে···ধৈর্য না থাকলে চলে না। মাঝখান থেকে এই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল এটা ত' প্রক্ষিপ্ত। এরজন্যে আমরা তৈরী ছিলাম না। বিরাট একটি ফ্রড ধরবার চেষ্টা চলছিল....···সেজন্য ওদের মনে যাতে সন্দেহ না ঢোকে তা-ও দেখছিলাম।···মাঝ থেকে আপনারা···, অবশ্য যূথীর জন্যেই এমনটা হ'ল। একপক্ষে ভালই হল। এবার বেরিয়ে আসুক জোজো। আমার একটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ঠিক করতে হবে।'

'আপনি······আপনি কি তবে? মানে আমরা আমাদের···এ সব কথা বলছেন....বুঝতে পারছিনা আমি।'

'কেন', তোতামিত্তির একটু হাসল। বলল 'মানুষের পরিবর্তন হয় এ কথা বিশ্বাস করতে পারেন না?'

'তা নয়···'

'জীবনে অনেক অন্যায় করেছি। প্রভাব প্রতিপত্তি আমার কম ছিল না। অন্যদিকেও যেতে পারতাম। একজন লোক, নমস্য ব্যক্তি, নাম বলব না, হাসতে হাসতে বলেছিলেন ছি ছি ভেবেছিলাম মন্দ কাজ যেমন পার, তেমনি ভাল কাজও করতে পার, অ্যাসেট হতে পার আমার।'

'তারপর?'

'তাই হলাম।' ধোঁয়া ছাড়ল তোতামিত্তির। অলসকণ্ঠে বলল 'সাধ্যমত সাহায্য করতে চেষ্টা করি। তা ছাড়া অমলপ্রতিম আমার ভাই। বললাম যে একটা ভেরী ভেরী পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট আছে আমার। জোজোর সঙ্গে।'

'ও।'

'আমাকে ভাললোক ভাবতে সুরু করবেন না যেন। ভাল নই, সাধারণ, খুব সাধারণ।' আপনাকে দেখলেই মনে হয় মানুষকে ভাল মনে করবার জন্যে মুখিয়ে আছেন।'

উঠে দাঁড়াল। বলল 'আপনি হয়ত' ভাবছিলেন কিছুই হল না। অনেক কষ্টের মধ্যে আরো একটা যন্ত্রণা আপনার বেড়েই চলত। ন্যায় নেই, সুবিচার নেই, এ কথা জানা যে বড় কষ্টের। নিজেকে যেন তুচ্ছ মনে হয়। তাই ব'লে গেলাম। অবশ্য যূথীর কথাটা জানানো আসল উদ্দেশ্য ছিল।'

'ও কি সারবেনা?'

'মনে ত হয় না। দরকার হয় বাইরে নিয়ে যাব। আমারও একবার যাবার ইচ্ছে আছে। তবে মনে হয় না কিছু হবে।'

'বাড়ীতেই থাকে?'

'হ্যাঁ আমার বাড়ীতে।'

একটু হাসল। মাথার চুলে হাত চালিয়ে বলল 'প্রথমটা আপনাকে দেখে ভারী নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম যূথীর ভাল লাগবে। দু'দিন বাদে এতরকম ট্রাবল হবে কে জানে মশায়!'

কি যেন ভাবল। তারপর আস্তে বলল 'যূথীর জন্যে আপনি ভাববেন না। আপনার কথা ও আবার ভুলে গেছে।'

ভুলে গেছে! যূথী!

'খুব খারাপ লাগল ত, দুঃখ পেলেন? দুঃখ করবেন না, আমার কথা ওর একেবারেই মনে নেই। বরঞ্চ, মনের কোথায় যেন আপনি ইমপ্রেশান রেখেছেন, মাঝেমাঝে মনে করতে চেষ্টা করে।'

'আপনার ত' ভারী কষ্ট তা হ'লে!'

তোতামিত্তির হাসল। সুন্দর উদার হাসি। বলল 'আরে কষ্ট আবার কি, সব কিছু সেন্টিমেণ্টালি দেখেন কেন মশায়? যূথীর ভাল থাকাটাই আসল কথা।'

'ওঁর আর কেউ নেই ?'

'আর কে থাকবে ? দ্বিজেশরায় লোকটা কি কম জেদী ছিল মশায়, কারো সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। আর ছিল গোঁ। নইলে বীথির সঙ্গে জোজোর বিয়ে দেয় ? ওকে বিয়ে করার ছেলের কি অভাব ছিল ?'

অমলের দিকে চেয়ে বলল 'এত কথা আপনি বুঝবেন না। আমার বয়স অনেক হল। এখন আর নতুন করে নতুন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে ইচ্ছে হয় না।'

যূথী পুরনো, তাই কি তার দায়িত্ব নিতে তোতামাস্তরের ভাল লাগে ? অমল জিগ্যেস করল না।

যাবার সময়ে বলল 'যা হ'ল, তা হ'ল. এখন চেষ্টা করুন নতুন ভাবে বাঁচতে।'

বেরিয়ে এল, হাওয়া আড়াল ক'রে আরেকটি সিগারেট ধরাল, বলল 'হতাশ হবেন না, মনের এ অবস্থায় আজেবাজে চিন্তা অনেক আসবে, প্রশ্রয় দেবেন না।'

'না।' অমল যান্ত্রিক ভাবে বলল, ক্ষীণ স্বরে।

'আপনাকে বাঁচতে ত হবেই, অন্তত সেই হতভাগা মেয়েটির কথা ভাবুন, আপনার বন্ধুর দাদার কথা ভাবুন, তারা নিজেদের ক্ষতিটতি ভুলে আপনাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে। ওদের প্রতিও আপনার কর্তব্য আছে।'

জীর্ণ বাড়ীটি, অমলের দীন, শীর্ণ চেহারার দিকে চেয়ে বলল 'বুঝি আমি, বুঝি দারিদ্র বড় অভিশাপ, কিন্তু কি করবেন বলুন ?'

কাঁধ দুটি একটু ঝাঁকিয়ে তোতা মিত্তির গাড়ীতে গিয়ে বসল। বলল 'যূথীকে নিয়ে একটা সমস্যা, বড় বেরিয়ে যেতে চায়। বেশীক্ষণ ছেড়ে থাকা চলে না।'

সাদা সুন্দর গাড়ীটি ধোঁয়া ছেড়ে চলে গেল। কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে অমল দাঁড়িয়ে রইল। জীবনে অনেক অভিজ্ঞতাই হ'ল।

তোতামিত্তির যে রকম লোকই হোক না কেন যূথীর জন্যে তার উদ্বেগ টুকু আন্তরিক। যূথী! একটি জীবনের কি শোচনীয় অপচয়। অবশ্য যূথীকে অমল যেদিন জেনেছে তার অনেক আগে থেকেই হয়ত তিলে তিলে ধ্বংস হতে থাকছিল ও, একদিনে হয়না। মানুষকে একেবারে নিঃশেষ করে দিতে অনেক সময় দরকার হয়। কতটা যন্ত্রণা কতটা কষ্ট ভোগকরে তবে যূথী এমন হ'ল ভাবতে গেলে ভয় করল অমলের। কত রকম ক্ষতি, শোক, পীড়ন, অত্যাচার সহ্য ক'রে, তবু ত মানুষ বাঁচে। যূথীর সামনে আঁকড়ে ধরবার মত হয়ত আর একটি কুটোও ছিল না।

সমস্ত জীবনটি পরিক্রমা ক'রে অমল নিজের কাছে ফিরে এল। কে জানে কত রাত হয়েছে, অথবা রাতের আর কতটুকু বাকি আছে।

রাতশেষ হলেই একবছর পূর্ণ হবে, তারপর সে আসবে। বড়, ভয়ঙ্কর তার প্রতিহিংসা। অমলের ওপর তার অনেক দিনের রাগ সে ক্ষমা করবে না।

ঈশ্বর জানেন অমলের কোন দোষ নেই। একদিন সে জগজ্জ্যোতি হতে চেয়েছিল, সে কথা হয়ত' সত্যি। যেমন করে হোক অর্থচাই, ভোগকরতে হবে, সুখের কোন বাসনাই যে চরিতার্থ হয়নি। সাধারণ মানুষের মধ্যেই যে এইসব বাসনা কামনা লুকিয়ে থাকে, সকলের মধ্যেই যেন কোথাও না কোথাও বাস করে জগজ্জ্যোতি।

কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত ক'রে সে ত' সরিৎ হ'তে চেয়েছে। পরের কারণে অবহেলে নিজের স্বার্থত্যাগ করা, সামান্যের চেয়েও সামান্য হ'য়ে নীরবে কর্তব্য ক'রে যাবার নামই যে সরিৎ।

চাইলে পথ পাওয়া যায় না। সরিতের মত হওয়া বড় কঠিন।

অনেকদিন অবধি মানুষজন তার সঙ্গে কথা কইতনা! দূর থেকে দেখত পরম কৌতূহলে। আত্মীয়স্বজন পথেঘাটে দেখা হ'লে পালাতে

পথ পাননি, যেন অমলের সংস্পর্শে পাপ আছে। অনেকদিন অবধি বেরুতে লজ্জা এবং ভয় পেত সে। এমন কি জনারণ্যে মুখ ফিরিয়ে পেছনে চাইত, এপাশে ওপাশে অসহায় ভাবে মাথা ঘোরাত। কারো পায়ে পা লাগলে ভীরু ও লজ্জিত হাসি হেসে মুখ সরিয়ে একপাশে চলে যেত। এমন দীনহীন কাতর ভাবে চাইত যেন সে বিশ্বজনের কাছে অপরাধী। যেন সবাই জানে তারজন্যে, তাকে বাঁচাবে ব'লে একদিন বিকেলে জামা ও চটি পরে সরিৎ বেরিয়ে গিয়েছিল।

ঐ টুকু ভাবা যায়, তার পর আর কিছুই ভাবতে পারেনা অমল। কেন সরিৎ তাকে সঙ্গে নিলনা, কেমন ক'রে গেল ওখানে, কি কথা থেকে কি কথা উঠল, শেষ সময়ে সরিতের কার কথা মনে হয়েছিল? জানবার ইচ্ছেয় রাত জেগে জেগে শরীর পাত করেছে অমল, মনে মনে ভেবেছে যারা এমন অতর্কিতে অপঘাতে মরে তাদের আত্মা না কি শান্তি পায় না। শান্তি যদি না পায় তবে আসুক সরিৎ। আর ত' কেউ নেই, একা অমল। অমলের কাছেই আসুক।

কেউ আসেনি। চোখ বুজলে এবং চোখ তাকালে যেন দেখতে পায় সেই ঝুলে পড়া হাত, ঘাড়ে গভীর ক্ষত, ধ'রে তোলবার সময়ে বোঝাগেল হাত দুটি কত লম্বা। সেই চোখ, সেই মুখ, এত চেনা, তবু কি অচেনাই হ'য়ে গেল। কি বিকৃত মুখ, নাকের ডগা এবং ঠোঁট নীল, মনে হ'ল এক অপরিচিতের মৃতদেহ তুলে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। হাত দুটো ঠকাস ঠকাস ক'রে ঘা খাচ্ছিল চেআরে, টেবিলের কাচে, দেওয়ালে। যারা নিয়ে যায় তাদের কোন মায়া হয় না, অথচ অমল ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

অনেকদিন মানুষের মধ্যে যায়নি অমল। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে থাকত। মা আর সে, বাড়ীতে কেউ নেই। কিন্তু সব যেন চোখে পড়ত একটা অস্বচ্ছ আলোর ভেতর দিয়ে। সবটা যেন বিকেলের দ্রুত নিভে আসা মলিন আলো। চোখে পড়ে, তবু পড়ে না। কোথা থেকে আহার যোগাতেন মা, কেমন করে যোগাচ্ছেন, কিছুই জানতে

ইচ্ছে হ'তনা। ভেতর থেকে চেষ্টাই আসত না। মা হাত ছুঁয়ে বলতেন 'স্নান কর্', তখন নাইত। খেতে নিয়ে যেতেন হাত ধরে, পাতে বসত। রাতে চুপ ক'রে চেআরে বসে থাকত। 'ঘুমোতে যা, শুয়ে পড়্', বলে বলে মা একসময়ে শ্রান্ত হ'য়ে শুয়ে পড়তেন। 'ভগবান, হে ঠাকুর!' তাঁর কাতর কণ্ঠ ঘরের বাতাসে কান্নার মত বাজত, অমল কান দিয়ে শুনত, মন দিয়ে বুঝত না!

তারপর, একদিন ব'সে ব'সে যখন রাত কেটে গেল, তখন তার মনে ভয় ঢোকে। এ কি? সে কি পাগল হয়ে যাবে? নিদারুণ এ মনের যন্ত্রণা থেকে কিছুতে উদ্ধার পাবে না? মনে হ'ল সহজ উপায় সামনেই রয়েছে। ডুবে মরলেই সব আপদ চোকে।

ভাববার সঙ্গে সঙ্গে সে ভয় পেল। যারা ও-ভাবে শর্টকাট খোঁজে, অমল জানে হঠাৎ তারা এক অসাবধান মুহূর্তে মরবার প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার করে। কোনো সময়ে হঠাৎ ঘটিয়ে বসে ভয়ঙ্কর সেই সর্বনাশ। একজন মরে আর দশজনকে মেরে রেখে যায়। কলঙ্ক, হ্যাপা, ঝামেলা, পুলিশের শাস্তি সইতে সইতে যারা বেঁচে থাকে তারা মৃত মানুষটিকে অভিশম্পাত দেয়।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল অমল। মা উঠে এলেন বিছানা ছেড়ে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বিছানায় নিয়ে এলেন। বললেন 'আমার কাছে শুয়ে থাক্।' অনেকক্ষণ অবধি অমলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন মা। অজ্ঞান শৈশবের পর আর এমন ক'রে মা-কে কাছে পায়নি, সেদিন যেন মা-কেই পরমনির্ভর জেনে মাথাটি ওঁর বুকে রেখে চুপ ক'রে শুয়েছিল।

যেন অমলের ওপর ভালবাসা মা'র দৃষ্টিকে স্বচ্ছ ক'রেছিল। মা যেন সব বুঝেছিলেন। ভাঙা ভাঙা গলায় বলেছিলেন 'পাপ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই খোকা। আর পাপ বাড়াসনে।'

'খোকা'! কে ডেকেছিল একবার এই নামে? শুনে যে বেদনা হয়েছিল আজও তা মনে পড়ে, কে ডেকেছিল? অমল মনে করতে চেষ্টা

করে। তারপর মনে হয় রোগশয্যায় বাবা। শীর্ণ মুখ, অসুস্থ চেহারা, খোকা ব'লে ডেকেছিলেন। অমল জানে ছোটবেলার পর আর ও নামে ডাকেননি বাবা। শেষ সময় কি মনে হয়েছিল ছেলেকে শিশুর মত অসহায় ক'রে রেখে যাচ্ছেন? কিন্তু মা কেন 'খোকা' বলে ডাকছেন? মা'র বুকে মুখ গুঁজে অমল মনে মনে ভগবানকে ডেকেছিল 'দয়াময়, দয়াময়, দয়াময়।' মনে হয়েছিল ঈশ্বরের কাছ থেকে সে দয়াভিক্ষে চায়, মা-কে যেন কেড়ে না নেন তিনি। মা ছাড়া তার যে কেউ নেই।

আবার মনে হয়েছিল সেদিন তোতামিত্তির যা বলে গেছে সে কথাও সত্যি। তড়িৎ ত' ভাইয়ের শোকে অমলের প্রতি কর্তব্য করতে ভোলেনি। নীতা ত' সব হারিয়েও অমলকে দায়ী করেনি। ওরা সত্যি কথা বলে অমলকে প্রাণ দিয়েছে। ওদের ঋণ শোধ করতে হবে। জানাতেই হবে যে অমল অকৃতজ্ঞ নয়। মরে যাওয়া মানে ত' কর্তব্য অস্বীকার করা, শর্টকাট খোঁজা। মনে হ'ল সরিৎ থাকলে বলত 'একবার সহজ রাস্তা খুঁজতে গিয়েছিলি, আবার ভাবছিস কেমন ক'রে দায়িত্ব ফাঁকি দেওয়া যায়? তুই এমন অমানুষ হ'য়ে গেছিস?'

কি করি, কোথায় যাই, ভেবে ভেবে কতদিন অমল পাগলের মত হেঁটেছে। সব পথই শেষে হারিয়ে গেছে জনারণ্যে। কখনো গড়িয়াহাটা, কখনো টালীগঞ্জের বাজার। মানুষ দেখে সম্বিৎ পেয়ে চমকে উঠেছে অমল, পালিয়ে যাবার পথ খুঁজেছে।

মাঝে মাঝে মনে হয়েছে তড়িতের কাছে একবার যায়। সাহস পায়নি। শুধু যে সাহস পায়নি তা নয়, ভয়ে গলার তালু শুকিয়ে গিয়েছে। যাবে, কেন যাবে? কি বলবে তড়িৎকে? এমনি করে অনেকদিন কাটে।

তারপর, অনেক চেষ্টায় মনে জোর এনে অমল তড়িতের কাছে গিয়েছিল।

তড়িৎ ওকে দেখে অবাক হ'য়ে যায়। অমল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়েছিল। সরিতের ছবি, গলায় ফুলের মালা দুলছে।

বাইরের ঘরে ওকে বসিয়ে তড়িৎ কিছুক্ষণ পায়চারী করে। তারপর বিব্রত হ'য়ে এগিয়ে আসে। বলে 'নিতু, এখন তোমার এ বাড়ীতে না আসাই ভাল।'

অমল বলে 'আমি একবারটি মাসীমার কাছে যাব।'

'মা'র কাছে?' তড়িৎ যেন ভয়ে আঁতকে ওঠে। বলে 'না না। মা সইতে পারবেন না নিতু। তোমাকে দেখলেই....তোমাকে দেখলে···।'

'মাসীমা কি আজও আমাকেই দোষী ভাবেন বড়দা?'

এ কথার জবাব দিতে পারেনি তড়িৎ। বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছিল।

'এ সব কথা···বুঝলে কি না নিতু···' তার কথা আটকে যায়। অমল বলতে যাচ্ছিল 'বল কি করলে তোমরা আমায় ক্ষমা করবে? আমি কি শাস্তি নিলে তোমরা খুশী হতে পার?'

বলতে পারেনি। উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বল কণ্ঠে বলেছিল 'ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছি আমি বড় দা···আমার কথা কাউকে বলবার নয়···কিন্তু আমি কি করতে পারতাম বল? আমি কি জানতাম আমাকে এখানে রেখে ও একা— !'

'নিতু!'

তড়িৎ ধমক দিয়ে ওঠে। তার হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ গভীর অনুভূতিতে ব্যাকুল হয়ে অমলের হাতটা চেপে ধরে। বলে 'কাজ কর্, কাজ কর্ নিতু, যা হয় একটা কিছু কর্। এমন ক'রে ক'দিন বাঁচতে পারবি?'

'কিন্তু তোমরা যদি আমাকে···'

'নিতু! অবুঝের মত করিস না। তোকে কেউ দায়ী করতে যাচ্ছে না। কিন্তু তোর সঙ্গে তার যে সম্পর্ক ছিল, তোকে দেখলেই মনে একটা শক্ লাগে। মা'র কথাটা একবার ভেবে দেখ।'

অমলের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে হাত মুঠো ক'রে বলেছিল 'বুঝলি কিছু?'

তারপর রুমাল বের ক'রে ঘাড় গলা মুছতে মুছতে স্বগতোক্তি ক'রেছিল 'কি কেচ্ছা! কি কেলেঙ্কারী! ভাবলে পাগল হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।'

ধমক দিয়ে বলেছিল 'যা, বাড়ী যা! অমন চেহারা ক'রে ঘুরিস না।'

বলেছিল 'সব সময়ে নিজের দিক থেকে দেখিস না। তোকে শাস্তি দেবার জন্যেই যেন আমরা বসে আছি! কে কাকে শাস্তি দেয় বল, তুই নিজেই কি আরামে আছিস?

অমল বুঝতে পারে বুকের নিচে নতুন একটা ভার চেপে বসছে। উপায় নেই, ওরা ক্ষমা করবে, সব একেবারে আগেকার মত হবে, তা হয় না। তার কারণেই সরিৎ সেদিন ওখানে গিয়েছিল এ কথা তড়িৎরা কোনদিন ভুলতে পারবে না।

অমনি করেই ঘুরতে ঘুরতে একদিন নীতাদের বাড়ীও গিয়েছিল। পটল প্রথমটা খুব রেগে ওঠে। বলে 'বাড়ীতে ঢুকতে দেব না! যথেষ্ট হয়েছে, কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত ক'রে তবে ছাড়লে।' তারপরই গলার স্বরটা অসহায় দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। অমলের মনে পড়ে যখন ওকে প্রথম দেখেছিল তখনই মনে হয়েছিল যত রাগ এবং উষ্মা দেখায় ও আসলে তত বেশী রাগে না। রাগের চেয়েও দুঃখ আর আক্ষেপটাই ওর গলায় হাহাকার তোলে বেশী। সেদিনও করুণা হয়েছিল, আজও দুঃখ হয় অমলের।

পটল আস্তে আস্তে বলে 'আমার অবস্থাটা কি দাঁড়াল বলুন দেখি? লোকের কথাবার্তা মন্তব্য, টিটকিরি এককান দিয়ে শুনব আর এক কান দিয়ে বের করে দেব কার ভরসায়? আজ ত' আর পাশে সরিৎবাবু নেই। সে থাকলে আমি জোর পেতাম কত!'

নীতা এসে দরজার কাছে দাঁড়াল।

তার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইল অমল। রংটা আরো ফর্সা হয়েছে, চোখের নিচে যেন আরো গাঢ় কালি। মুখে কথা নেই, বেদনায় নির্বাক চাহনি।

নিরীহ শান্ত মেয়েটি যেন আরো মূক হয়ে গেছে, ছায়ার মতো নিঃশব্দ। একেবারে ঘরের কোণে থাকত, কেউ ওর অস্তিত্ব-ও জানত না। হঠাৎ ঝড়ের এক ঝাপটায় চারটি দেওয়াল উড়ে চলে গেল, ওকে টেনে নিয়ে এল মানুষের হাটের মাঝখানে। আজ বিশ্বসংসারের নির্বোধ এবং নিষ্ঠুর কৌতূহল মেটানো ছাড়া ওর অন্য কাজ নেই।

একটি নিশ্বাস ফেলে নীতা সরে গেল। অমলের চোখে জল। পটল বোধ হয় তা দেখেনি। আস্তে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল 'এখন কে ঐ মেয়েকে বিয়ে করতে যাবে বলুন ত? সবাই বলছে ওর সর্বনেশে কপাল।'

অমল বেরিয়ে এল।

তাকে এগিয়ে দিতে দিতে পটল বলল 'ওঁর মত মানুষকে যে মারলে তার হ'ল একবছরের জেল, তাই মনে হয় ভগবানের রাজ্যে বুঝি বিচার ব'লে কিছু নেই!'

ওঁর মত মানুষ!

কথাটি অমল যে কতবার শুনেছে। এখন যার কাছে দাঁড়িয়ে একদণ্ড এ কথা শুনতে পায় তার কাছেই যায় অমল। ইস্কুলের মাষ্টারমশায় তড়িৎকে বলেছিলেন 'ওর মত ছেলে! জান ত' আমার মেয়ের অসুখের সময়ে কি ক'রে হাঁসপাতালে নিল, কি কাণ্ড করে সীট জোগাড় করে।'

'জানি না মাষ্টারমশায়, সব কথা ও বাড়ীতে বলত না' বলতে গিয়ে তড়িৎ কেঁদে ফেলেছিল।

আর সেই বৃদ্ধটি! প্রাচীন স্নানঘাটের শান বাঁধানো চাঁদোয়ার নিচে বসে যে রথের সময়ে চিনি ও কলা বেচে, শিবরাত্রির দিন ফুল ও বেলপাতা, সে অমলকে বলেছিল 'আহা সে ছেলেটিকেই ভগবান নিলেন! আমার যে বেশ মনে আছে বাবা তুমি আর সে আসছিলে, সে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে রাস্তা পার করে দিলে। তার মত ছেলে কি হয়?'

বৃদ্ধের কথা শুনে অমল রাস্তা দিয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বাড়ী ফেরে।

যেন, যতদিন যাচ্ছিল ততই বুঝতে পারছিল অমল, সরিৎ হওয়া বড় কঠিন। একদিনের চোখ ধাঁধানো বীরত্বের কাজ নয়, প্রত্যহ, প্রতিটি কাজে এবং স্বগত চিন্তায় সৎ ও পরিশ্রমী হওয়া কি কঠিন। নিজের হয়ে বড় গলায় কথা কইতে শেখেনি, অথচ প্রয়োজনের সময়ে সকলকেই হাতটি বাড়িয়ে দিত। যতীন কুণ্ডুর অতি বৃদ্ধ কাকার যক্ষ্মা হওয়াতে দেড়বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে তাঁকে ইঞ্জেকশান দিতে নিয়ে যেত। কে বলবে ছোঁয়াচে রোগ, অমন পাশাপাশি এক রিকশায় যেতে নেই। বললে শুনত না, মৃদু হাসত।

হাত বাড়ালেই সরিৎকে পেত, তাই ত' অমলের আর অন্য নির্ভর খুঁজতে হয়নি।

সেদিন নীতাদের বাড়ী থেকে অমল বাড়ী ফিরে এসে মা'র কাছে বসল।

কতদিন যে সে এমন ক'রে বসেনি, আজ তিন চার মাস চেয়ে দেখেনি কোনদিকে।

সব যেন বড় বেশী জরাজীর্ণ, সর্বত্র যেন দারিদ্র্যের চিহ্ন প্রকট। বাইরে দালানের কোণে বড়বড় টিন, জালা বের করে রাখা।

'চালের টিন বাইরে রেখেছ কেন মা ?'

মা প্রথমটা অবাক হয়ে তার দিকে তাকান। অনেকদিন এমন স্বাভাবিক ভাবে এত সাধারণ কথা বলেনি অমল। একটি নিশ্বাস ফেললেন।

'কই, বললে না ত ?'

'এখন আর ওতে আমাদের চালডাল রাখা হয় না। পাঁচসের দশসের, মুক্তো যা আনে তা কৌটোতেই রাখি। ওগুলো ঘরে রাখলে মিছে আরশোলা হয় তাই বের ক'রে দিয়েছি।'

অমল অবস্থাটা একটু অনুধাবন করতে চেষ্টা করল। অনেকদিন সে

সংসারের খবর রাখেনা, মা'র দিকে ফিরে তাকায় না। এখন যেন দেখতে পেল কি শীর্ণ এবং গম্ভীর হয়ে গেছে তাঁর চেহারা, চোখে সে উজ্জলতা নেই, রুক্ষ চুলের খোঁপার নিচে ঘাড়টি গলাটি কি রোগা দেখায়।

নিশ্বাস ফেলল। এই তার শাস্তি। বাঁচতে হবে তাকে, বাঁচাতে হবে মা-কে। এই একটি কর্তব্য অন্তত যথাযথ পালন করতে হবে।

'একজনের মত আটা মাখছ যে?'

'রাতে আমি খেতে পারিনা নিতু।'

'কিছুই খাওনা? কতদিন খাও না, মা?'

'একটু ফলটল খাই, চিনির পানা খাই, এই ত' মাস খানেক হল...'

মুক্তো পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। যেন অমলের সঙ্গে সে অনেকক্ষণ ধরে ঝগড়া করছিল এই ভাবে বলল 'তুমি কি আর সে মনিষ্যি আছ? কোন খবরই নাও না। মা যে আজ মঙ্গলবার কাল শনিঠাকুরের ব্রত পরশু নারায়ণের সিন্নী এই ক'রে করে শরীরটা পাত কচ্ছে, তা কি চোখ মেলে দেখ একবার? আমিও থাকি না...'

মা অস্ফুটে 'আঃ, মুক্তো!' বললেন।

অমল আশ্চর্য হয়ে বলল 'থাক না? কেন থাকনা?' মা বললেন 'ও আর আমাদের বাড়ী রাতদিন কাজ করে না নিতু। যেমন আসত তেমনি আসে, তবে আরো দু'টো ঠিকে কাজ করে।'

রুটি বেলতে বেলতে বললেন 'কি বা কাজ আমাদের, ওকে সবসময়ে দরকারও হয় না।'

গভীর আক্ষেপে অমল বলল 'আমার যদি জ্ঞান ছিল না।' তুমি আমায় বলনি কেন মা?

মা আস্তে আস্তে বললেন 'কাকে বলব বল্? তুই কি তোর মধ্যে ছিলি? যা হোক, এখন ত সব জানলি!' চা-এর কাপডিশ টানতে টানতে বললেন 'ধীরে সুস্থে ভেবে যা হয় করিস বাবা। ঠাকুরের ওপর বিশ্বাস রাখ।'

'ঠাকুরের ওপর বিশ্বাস রাখ।' সেদিন রাতে শুতে যাবার আগেও বললেন। নিজেই বিছানায় শুয়ে আস্তে আস্তে বললেন 'ভেবে ভেবে শরীর পাত ক'রে কি লাভ হয় বাবা ?'

অমল শুধু ভাবল 'মা'র বিশ্বাস যদি আমি পেতাম !'

॥ ষোল ॥

আজ, শেষ প্রহরে সব কথা মনে পড়ছে।

শুনেছে, তার চরম দুঃখের দিনে পুলক বলেছিল একজনের কাছে 'অমলের জন্য বড় দুঃখ হয়। ছেলেটা এমন হয়ে গেল কেন? কিছুই ত হয়নি ওর। ওকে ধরেনি, জেল হয়নি। তবু এমন ক'রে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায় কেন?'

শুনে অমল প্রথমটা বুঝতে পারে নি 'কে? কার কথা বলছেন? ও, পুলক!'

ব'লে সে চুপ করে যায়।

লোকটি বলে 'এবার চিনেছেন?'

'বুঝেছি কার কথা বলছেন। বলবেন আমি খুব ভাল আছি। আমার জন্যে চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই।'

অমল তখন এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছে, যে আর কারো সাহায্য চায় না সে, করুণায় বিশ্বাস করে না।

চাকরী একটি যেমন তেমন, সামান্য চাকরীর জন্যে সে কোথায় গিয়েছে আর কোথায় যায় নি।

কিছুতেই চাকা নড়ানো যায় নি। সে যেমন তেমন একটি কেরাণীর কাজ চায় শুনে একজন শুনিয়ে দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে কতজন বেকার। আর একজন বলেছিল 'চাকরী পেতে হ'লে কতকগুলো ব্যাপার খুব সাহায্য করে। তোমার সেগুলো নেই।'

'কি নেই?'

'তুমি ডি. পি. নও, এখানেই বাড়ী তোমার, তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় নও, উপজাতির মধ্যেও পড় না। বয়স হয়ে গেছে তোমার, বলতে

কষ্ট হচ্ছে তবু সত্যি কথাটা শোনা ভাল, অতি সাধারণ, গৃহস্থ এবং মধ্যবিত্ত ঘরের একটি ছেলের কাজ পাওয়া বড় মুস্কিল।'

অমলের মনে কোন সংকোচ ছিল না। যে কোন কাজ করতে চেয়েছিল সে, বাসের কণ্ডাকটর হতে-ও আপত্তি ছিল না।

সেই সময়ে একদিন। প্রচণ্ড ঘোরাঘুরির পর বাড়ী ফিরতে ফিরতে সে এসপ্লানেডের গুমটির কাছে নেমে পড়ে। কে. সি. দাসের দোকানের নিচ দিয়ে পশ্চিমদিকে একটি মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে। শাড়ীটি আজও সাদা, চকচকে সাটিনের সাদা পাড় জর্জেট। আঁচল আজও লুটোচ্ছে। তবে ময়লা, কাদার ছিটে লাগা। চুল খোলা, রুক্ষ, জটা বেঁধে মুখের পাশে ঝুলছে। হাতে একটা ব্যাগ. এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে, চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হয় কাকে খুঁজছে।

দেখেই চিনেছে অমল।

কোনমতে ট্রাম থেকে নেমে রাস্তা পেরোতে যাবে, আরো দুটো ট্রাম এল, গড় গড়িয়ে চলে গেল।

যেন খেয়াল নেই যূথীর, এটা রাস্তা কি বাড়ী তা-ও হুঁশ নেই। এমন অবস্থায় ওকে ছেড়ে দিল কে? না সকলকে ফাঁকি দিয়ে ও পালিয়ে এসেছে? অমল দেখতে পেল মানুষ ওর দিকে তাকাচ্ছে, হাসছে, কেউ কেউ চোখ নামিয়ে নিচ্ছে।

'শুনুন।'

অমলের ডাক যূথী শুনতে পেলনা। অমল রাস্তা পেরোতে পেরোতে যূথী হঠাৎ উঠে পড়ল একটা বাসে। অমল যখন ওদিকে পৌঁছল তখন বাসটা চলে যাচ্ছে। যূথীর শূন্য চাহনি, মাঝে মাঝে ভুরু কুঁচকে কোন বেদনা ঢাকবার, ভুলেযাওয়া কোন কথা মনে বার বার করুণ প্রয়াস, মাঝে মাঝে অর্থহীন সামান্য হাসি অনেকদিন অবধি অমলের মনে পড়েছে।

এই শেষ, আর কোনদিন যূথীকে সে দেখেনি।

সেদিনই ফিরে এল অমল। মাকে বলল 'মা, আমি পথ পেয়ে গেছি।'

'কাজ পেলি ?'

'পেয়েছি মা।'

রেডিও, অ্যালার্ম ঘড়ি, কাঁচের আলমারী নিজের হাতঘড়ি সব বেচে দিল অমল একে একে।

নিয়ে এল মস্ত একটা ব্যাগ বোঝাই জিনিসপত্র। তারপর ঘুরতে লাগল এখানে সেখানে। কোর্টে, কাছারীতে, অফিসে, কলেজে, ইস্কুলে।

প্রথমদিন এসে মা'র হাতে খুচরোয় নোটে ছ'টা টাকা তুলে দিল। বলল 'এতেই আমাদের চলবে না মা ? আমি আর তুমি ত ?'

মা মুখে আঁচল দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

অমল বলল 'দুঃখ কর না মা এ অনেক ভাল হ'ল।'

ঘুরতে ঘুরতে সেদিন তড়িৎদের অফিসেও গিয়েছিল। তড়িৎ এখন ওর কাছ থেকেই নেয় সব, পিনকুশন, আলপিন, ক্লিপ, উডপেনসিল, লাল নীল পেনসিল, ব্লটিং কাগজ, সাদা কাগজ, গঁদের আঠা, কালি, টোন সূতো, গালা।

মা বোধহয় কিছুদিন শান্তি পেলেন। অন্তত জেনে গেলেন অমল একেবারে ভেসে যায়নি, আবার ফিরে এসেছে। স্বাভাবিক হয়েছে।

মা'কে ত রাখতে পারেনি অমল।

মা'র অসুখের সময়ে সে কি আতান্তর অবস্থা। ডাক্তার বলে গেল ও রোগের চিকিৎসা নেই। ওর নাম পানিস্যস্ অ্যানিমিআ ; তায় জ্বর, বুকে শ্লেষ্মা প্লুরিসির ভাব।

ঝড়বিষ্টির বিরাম ছিল না। সে সময়ে যেন কদিনের জন্যে আকাশটা ভেঙে পড়েছিল।

আর তেমনি কি ঝড়। নারকেল গাছগুলো শুয়ে পড়ছে, উঠোন ভরে গেল পাতায়, ডালপালায়। দরজা জানালা কেবলি খুলে খুলে যায়, দেওয়ালের আস্তর খ'সে পড়ে। কোনদিকে যায় অমল, রুগীর কাছে যায়, না ডাক্তারের কাছে। পথ্য তৈরী করে, না নিজের রান্না করে। একটু কাছ ছাড়া হ'লে মা ভয়পেয়ে চমকে চমকে ওঠেন।

কি যে একটা, কিসের যেন ভয় তাঁকে স্বস্তি পেতে দিত না এমন জ্বর না, যে বিকার হবে। তবু চমকে ওঠেন। একবার চৌকির পাশে তাকান, আবার পায়ের দিকে চেয়ে রূঢ় গলায় বলেন 'যাঃ যাঃ, দূর হ !'

অমলকে ধ'রে শুয়ে থাকেন। বলেন 'পথ্যিতে দরকার নেই, ওষুধ দে আর কাছে থাক।

সেদিন সেই দুর্যোগের মধ্যেই নীতা এল। বলল 'দাদা বললে আপনার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছে। মা'র নাকি খুব অসুখ ?'

'হ্যাঁ নীতা, তুমি এসেছ ?'

'তাই এলাম।'

নীতা শুকনো গলায় বলল 'দাদা আসতে দিতে চায় নি।'

'তুমি কেন এলে ?'

'আমার নিজের একটা ভালমন্দ বিচার থাকতে নেই ?

নীতা রান্নাঘরে উঁকি দিল। অমল বলল ''ওদিকে আর চেয়োনা। জলে থই থই, পাতার ডাঁই জমেছে।' নীতা তোলা উনোন ধরাল। বার্লি জ্বাল দিল, দুধ ফুটিয়ে রাখল। বলল 'দুটি ভাত ফুটিয়ে দিই ?'

'না না, পাঁউরুটি আছে দেখনা, আমার জন্যে ভেব না।'

আরো কিছুক্ষণ থেকে 'কাল আসব' ব'লে নীতা চলে গেল।

পরদিনও এল, সঙ্গে তার দাদাও এসেছিল। মা কিন্তু তেমন চিনতে পারলেন না। নীতা কাছে ব'সে ওঁর মাথাটা ধুইয়ে দেয়। সেদিন আর কোন কথা শুনল না, অমলের জন্যে রান্না করল। বলল 'খেয়ে নিন আপনি, আমি ততক্ষণ বসছি।'

মা অবশ্য থাকলেন না।

শেষের দিকে অমলকেও আর চেনেননি। কোন চৈতন্য ছিল না তাঁর, মৃত্যু এল অতি নিঃশব্দে। অমল তখনও বাতাস করছিল, ডাক্তার বলেন 'ঘুমের মধ্যেই হয়ে গেছে মার্সিফুল ডেথ।'

মা'র কাজ করবার সময় নীতা বলেছিল 'সংসারে যখন কেউই নেই তখন কালীঘাটে গিয়ে কাজটা করলে হত ?'

'এখানেই হোক' অমল মৃদু স্বরে বলেছিল।

মায়ের কাজ হ'ল নমো নমো ক'রে কোন মতে। পুরুত ঠাকুরকে সব যোগাড় ক'রে দিল নীতা। সব শেষ হ'য়ে গেলে গুছিয়ে গাছিয়ে তুলে দিল। এই শেষ। অমলের মনে হল এ সংসারে আর ও তামা-পেতলের পূজোর বাসন কোনদিন ব্যবহারে লাগবে না। যেন সামান্য বাসন নয়, যেন অনেক কিছু, চিরদিনের চেনাজানা কত কি এবার চিরতরে চলে গেল। ঘরে কুলুপ পড়ল যেন। যাবার সময়ে নীতা বলল 'আমি আর আসব না।'

'আর কেন আসবে নীতা ?'

'আসাটা উচিত হবে না।'

'এই যে এলে এতেই আমি খুব কৃতজ্ঞ। অবশ্য তোমার কাছে আর নতুন ক'রে কৃতজ্ঞতা কি জানাব বল !

'আপনি কিন্তু এমন সন্ন্যাসী হয়ে থাকবেন না।'

'না। দেখো খুব গুছিয়ে ঘরকন্না করব।'

'অসুখবিসুখ করলে একটা খবর দেবেন।' বলতে বলতে নীতার গলাটা ধ'রে এসেছিল। কেন কে জানে! হয়ত' অমলের বিদায় নেওয়া মানে নতুন ক'রে সরিতের বিয়োগব্যথা অনুভব করা। চিরদিনই নীতার স্মৃতিতে অমল এবং সরিৎ হয়ত' একসঙ্গে ঠাঁই পাবে।

বিষ্টি থেমে গেছে।

বাতাসের গর্জন স্তিমিত, দাপাদাপির পর গাছের ডালগুলো শান্ত। চারিদিকে এক দুঃসহ প্রশান্তি। অমল জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

যত সময় কমে আসছে ততই ভয় কেটে যাচ্ছে। শক্তি পাচ্ছে সে, শান্তি পাচ্ছে।

পরশু নীতার দাদা এসেছিল। অমলের হাত জড়িয়ে ধরল। বলল 'যা হয়েছে তা হয়েছে। এখন আপনি ওকে বিয়ে করে আমায়

াচান। কারো সামনে বেরোবে না। দেখতে এলে সামনে যাবে না। এদিকে নানা কথায় কান পাতা যায় না; ওকে নিয়ে আমি কি করব?' আশ্চর্য, তড়িতও এই কথাই ঘুরিয়ে বলল।

নীতার দাদা যা বলেছে, সরিতের দাদাও তাই বলে গেল। 'এমন করে লাভ কি নিতু? বাঁচতে যখন হবেই, আর কর্তব্য বলে যদি মানিস টা, তবে তুই একটু ওদের কথা ভাব। ও মেয়েটা কি করবে?'

আজ বিকেলেই একটি খাম পৌঁছে দিয়ে এসেছে অমল নীতার কাছে। জানিয়েছে জেল থেকে বেরিয়েই জোজো দেখা করতে আসবে। অমল এতদিনে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

যদি সময় পেত, বাঁচতে সুযোগ পেত তাহ'লে হয়ত' অমল অন্যভাবে প্রায়শ্চিত্ত করত। সে প্রায়শ্চিত্ত অনেক কঠিন। প্রতিদিনের চেষ্টায় একটু একটু করে শুদ্ধ হওয়া। তবে সে সুযোগ হয়ত ভগবান দেবেন না। তড়িৎ এবং নীতার কাছে অমলের ঋণ রয়েই গেল।

নিচে লিখেছে 'নিত্য আশীর্বাদক অমল।' সরিতের বউকে সে ত আশীর্বাদ করতেই চেয়েছিল।

পূব আকাশ ফর্সা হচ্ছে।

আর কোথাও যাবেনা অমল। এইখানে বসে থাকবে নিশ্চেষ্ট হয়ে, এই তার নিয়তি। নিয়তি ছাড়া আর কি? কত আর ছুটতে পারে সে? যে আসবে আসুক, জোজো কিংবা নীতা। সে প্রতীক্ষায় থাকবে।

সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যে।

ঠিক সন্ধ্যের মুখে, অমল শুনতে পেল সদর দরজাটা কে যেন খুলল। পায়ের শব্দ। একটু হাসল সে, তারপর চোখ বুজল।

দরজার দিকে পেছন ফিরে বসে রইল, বুকের ওপর দু'টি হাত আড়াআড়ি করে রাখা।

অমলের ঘরের দরজা খুলল। ক্যাঁচ ক'রে লম্বা একটা কান্নার মত শব্দ।

কে এসেছে? যেই আসুক, বুকের তলায় কি শান্তি।

দ্রুত পায়ের শব্দ। মৃদুসৌরভে ঘর ভরে গেল। কে এল?
জোজো? নীতা? জোজো? নীতা?

যেই আসুক অমল তাকে আসতে দেবে। বাধা দেবে না, একটুও বাধা দেবে না।

মৃদু পায়ের শব্দ চেয়ারের পেছনে, অমলের খুব কাছে এসে থেমে গেল।

শেষ